স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

জীবন-চরিত।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঙ্কলিত।

কলিকাতা। বঙ্গাব্দ ১৩১৮।

মূল্য দুই টাকা।

বাঙ্গালী

বঙ্কিমচন্দ্রকে

বাঙ্গালীর

হাতে

অর্পণ

করিলাম।

ভূমিকা।

নিদ্রাঘোরে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণ দুর্গোৎসব করিবার বাসনা করিয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গতি নাই; ভিক্ষা তাহার উপজীবিকা। তবু সে নিরস্ত হইল না। নিজে মাটী কাটিয়া আনিয়া প্রতিমা গড়িল—লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিল—বহুক্রোশব্যাপী পথ হাঁটিয়া গঙ্গাজল মাথায় করিয়া বহিয়া গৃহে আনিল। কিন্তু ডাকের গহনা দিয়া প্রতিমা সাজাইতে পারিল না—আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণের সেবার্থ অর্পণ করিতে পারিল না—ঢাক ঢোল বাজাইয়া গ্রাম মাতাইতে পারিল না। ব্রাহ্মণ শুধু প্রাণ ভরিয়া পূজাটি করিল।

ঘুম ভাঙ্গিলে চাহিয়া দেখিলাম, আমারও সেই দশা। আমি কোনও রকমে প্রতিমাখানি গড়িলাম, কিন্তু তাহাকে ত সাজাইতে পারিলাম না। দ্বারে

দ্বারে ঘুরিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিলাম, কিন্তু উপযুক্ত আহার্য্য দিয়া মহদ্‌জনের সেবা করিতে পারিলাম কই? নৈবেদ্য সাজাইতে গিয়া দেখিলাম, ঘরে চাল নাই; হোম করিতে গিয়া দেখিলাম, পাত্রে ঘি নাই; বলি দিতে গিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণে ছাগ নাই। তবে এ ধৃষ্টতা কেন? যে সামর্থ্যহীন, তার মহাপূজা করিতে যাওয়া কেন?

কেন, তা' বলিব! বলিব বলিয়াই এ দীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করিয়াছি। গত ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতিথি উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষদ্‌-মন্দিরে একটি সভা আহূত হয়। সেই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে আমি অনুরুদ্ধ হই। পাঠ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু লোকের ভাল লাগিয়াছিল কি না জানি না। অবশেষে আমার দুই চারিজন বন্ধু সেই প্রবন্ধটি মুদ্রিত করিতে আমায় অনুরোধ করেন। আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলাম। কিন্তু ছাপিতে দিবার পূর্ব্বে প্রবন্ধটিকে অনেক বাড়াইলাম। প্রবন্ধের নাম দিলাম—"বঙ্কিম-কাহিনী"। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে

"কাহিনী" যখন ছাপা শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন কয়েক জন উদারচিত্ত ভদ্র ব্যক্তির গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ আমায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলেন, কেহ বা প্রতিবাদ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। আমি একটু ভীত হইলাম, কেন না, এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেহ 'ক' 'খ' শেষ করিয়া রামায়ণ ধরিয়াছেন—কেহ বা 'ক''খ' আরম্ভ করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা জানাইয়াছেন। সুতরাং আমার ভয় পাইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। যাহা হউক আমি পিছাইলাম না। ভাবিলাম, তবে কাহিনীতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া জীবনী লিখিব। ভাবিলাম, যে চরণে একটি ক্ষুদ্র বনফুল অর্পণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলাম, সে চরণে আরও দুইটা ফুল, চন্দনের সহিত মিশাইয়া দিই না কেন?

আমার বন্ধুরাও সেই পরামর্শ দিলেন। আমি তখন বুকের ভিতর এক অভূতপূর্ব্ব দৈবশক্তি অনুভব করিলাম। তিন মাসের মধ্যে এই জীবনী লিখিয়া শেষ করিলাম। সমস্ত দিন উপকরণ-সংগ্রহার্থ ঘুরিয়া

রাত্রে বসিয়া দুই চারিখানি কাগজ লিখিতাম। পরদিন প্রাতে তাহা ছাপাইতে দিয়া আবার উপাদান সংগ্রহকরণাভিলাষে বহির্গত হইতাম। এইরূপে পুস্তকখানি তিন মাসের মধ্যে লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং অনেক ত্রুটী রহিয়া গেল। যে জিনিসটা শেষে দেওয়া উচিত, তাহা আমি মধ্যে দিয়াছি; যে গল্পটা গোড়ায় দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা আমায় বাধ্য হইয়া শেষে দিতে হইয়াছে। আমি যথাস্থানে সকল জিনিস সাজাইতে পারিলাম না।

তা' ছাড়া "কাহিনী" স্বতন্ত্রভাবে একাকী দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু উপায় নাই। "জীবনী" জন্মগ্রহণ করিবার বহু পূর্ব্বে "কাহিনী" মুদ্রাযন্ত্রের গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে "কাহিনী"কে কিছু কাল এই ভাবে থাকিতে হইবে। "জীবনী" যদি কখনও পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে "কাহিনী"কে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা যাইবে।

ত্রুটী পদে পদে; ছাপাইতে দিয়াও নিস্তার নাই। আমি লিখিয়া দিলাম 'nothing', ছাপা হইল

'noth'—('কাহিনী' ১৬ পৃষ্ঠা)। লিখিলাম 'জন্য দিগ্‌ দিগন্ত', ছাপা হইল 'জন্যগ্‌ দিদিগন্ত'—('কাহিনী' ৫১ পৃষ্ঠা)। লিখিয়া দিলাম 'ত্বমগমঃ', ছাপা হইল 'ত্ব সগমঃ'—('জীবনী' ৯২ পৃষ্ঠা)। এইরূপ কয়েকটা ভুল রহিয়া গেল।

আরও এক গুরুতর ত্রুটী রহিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র বেদ সম্বন্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন—সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন—হিন্দু উৎসবাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সে সকল ইংরাজি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলাম না। "Adventures of a young Hindu" নামে একটি গল্প, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যৌবনে ইংরাজি ভাষায় লিখিয়াছিলেন, তাহাও আমি অনুবাদ করিয়া দিতে পারিলাম না। তা' ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ছিল; কিন্তু এ যাত্রা তাহা বলা হইল না। নানা কারণ বশতঃ অনেক ত্রুটী রহিয়া গেল—সংগ্রহ সম্পূর্ণ করিতে পারিলাম না।

"Rajmohan's wife" নামক একটি গল্প বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন। ইহা ইংরাজি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, এবং Indian Field নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পটি সম্পূর্ণ হয় নাই; সুতরাং তাহার মূল্য বেশী আছে বলিয়া বোধ হয় না। তবু আমি উক্ত পত্রের জন্য নানা দিকে সন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে কোথাও তাহা পাই নাই। অবশেষে বিলাতে পত্র লিখিয়াছিলাম। British museumর কর্ত্তা Fortescue সাহেব উত্তরে জানাইয়াছেন, Indian Field কয়েক সংখ্যা মাত্র তথায় আছে, কিন্তু উক্ত গল্প যে সংখ্যায় থাকা সম্ভব, সে সংখ্যা পাওয়া যায় নাই।

আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী লিখিবার সময় এখনও সমাগত হয় নাই। কতকগুলি ঘটনা এমনই ভাবে অপরের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট যে, সে সকল ঘটনার আমি উল্লেখ করিতে পারিলাম না। কাহারও মনঃপীড়া দেওয়া আমার অভিপ্রেত নয়। যদি অজ্ঞাতসারে কাহারও মনঃকষ্টের কারণ হইয়া

থাকি, তবে তিনি যেন আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া আমায় ক্ষমা করেন।

আর একটি কথা না বলিয়া উপসংহার করিতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে সকল গল্পে আমি আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই, অথবা কোনও ঘটনা উল্লেখ-যোগ্য মনে করি নাই, সে সকল গল্প বা ঘটনা এ পুস্তকে স্থান পায় নাই। যাহা আমি বিশ্বস্ত লোক মুখে শুনিয়াছি, অথবা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই এ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। তবে সকল ঘটনাগুলি যে খাঁটী সত্য, অথবা অতিরঞ্জিত নয়, সে কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

কয়েক জন ভদ্র মহোদয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তাঁহারা সাহায্য না করিলে এ গ্রন্থ লিখিয়া উঠিতে পারিতাম কি না সন্দেহস্থল। নিম্নে তাঁহাদের নাম দিলাম:—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রুদ্র, এম, এ (বেঙ্গল-লাইব্রেরী), শ্রীযুক্ত কিরণনাথ ধর, এম, এ (ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী), ও Mr. E. W. Madge

(Imperial Library);—এতদ্ব্যতীত গভর্মেণ্ট বা তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতেও কিছু কিছু সাহায্য পাইয়াছি।

১৮নং নবীন সরকারের লেন,
নেবুবাগান, কলিকাতা। } শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বার্দ্ধক্যে)

বঙ্কিম-জীবনী।

প্রথম খণ্ড।
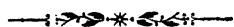
বঙ্কিম-জীবনী।
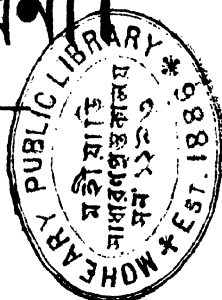
কাঁটালপাড়া

জেলা চব্বিশ পরগণার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এই জেলার অন্তর্গত বারাসাত। পূর্ব্বে বারাসাত একটি জেলা ছিল, এক্ষণে একটি মহকুমা মাত্র। বারাসাত হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে কাঁটাল-পাড়া অবস্থিত।

কাঁটালপাড়া একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম। কলিকাতা হইতে বেশী দূর নয়,-বার ক্রোশ মাত্র। রেলে এক ঘণ্টার পথ। কাঁটালপাড়ার পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গা, উত্তরে নৈহাটী, দক্ষিণে ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী, পূর্ব্বে দেল-পাড়া। ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল-ষ্টেট রেলওয়ে, কাঁটালপাড়াকে

দ্বিখণ্ড করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাংশে চট্টোপাধ্যায় বংশের বাস—পশ্চিমাংশে, গঙ্গার দিকে অন্যান্য ভদ্র লোকের বাস। এক্ষণে নৈহাটী ষ্টেশন যে স্থানে অবস্থিত, সে স্থান কাঁটালপাড়ারই অন্তর্গত।

গঙ্গার একপারে কাঁটালপাড়া—অপর পারে চুঁচুড়া। চুঁচুড়ায় স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বাসস্থান। কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান। আর একদিন, প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, গঙ্গার এক পারে ভারতচন্দ্র রায়, অপর পারে রামপ্রসাদ সেন। তার আগে, চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, গঙ্গার এক কূলে কাশীরাম দাস, অপর কূলে কৃত্তিবাস। আরও একটু দূরে—অজয়ের কূলে, একদিকে জয়দেব, অপর দিকে চণ্ডীদাসকে দেখিয়াছিলাম। চুঁচুড়া কাঁটালপাড়া, পাণ্ডুয়া হালিসহর, সিঙ্গি ফুলিয়া, কেন্দুবিল্ব নান্নুর ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে সকল মহাপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি তথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম কোন কালে বিলুপ্ত হইবে না।

কাঁটালপাড়া কতদিনের তা' জানি না। কেমন করিয়া নামের সৃষ্টি হইল, তাহাও বলিতে পারি না। কতকগুলি কাঁটাল গাছ আছে বটে, কিন্তু নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামে যা' আছে, তদপেক্ষা কোন মতে বেশী হইবে না। তবে পুরাকালে কি ছিল, তাহা বলিতে পারি না।

কাঁটালপাড়ায় দ্রষ্টব্য বড় একটা কিছুই নাই। অর্জ্জুনা দীঘী সম্বন্ধে একটা কিম্বদন্তী আছে। আমরা পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছি, নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা জয় করিতে যাইবার সময় অর্জ্জুনার সন্নিকটে সসৈন্যে ছাউনি করিয়াছিলেন। রঘুদেব ঘোষাল, নবাবসৈন্যের রসদ সংগ্রহ করিয়া নবাবের আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

আর দেখিবার আছে,—রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ। তাঁহার সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। সে আজ বহুদিনের কথা। আমি দেড়শত বর্ষের আগেকার কথা বলিতেছি। তখন বাঙ্গালার সিংহাসনে আলিবর্দ্দি খাঁ অধিষ্ঠান করিতেছেন। ইংরাজ কলিকাতায় কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া

ভারতব্যাপী রাজ্যের সূচনা করিতেছেন। মির্জাফর তখন সামান্য সেনানী। সিরাজউদ্দৌলা বালক মাত্র।

সে সময় রঘুদেব ঘোষাল কাঁটালপাড়ার মধ্যে জনৈক সঙ্গতিপন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার গৃহ তখন ক্ষুদ্র, আড়ম্বরশূন্য,—বর্ত্তমান চট্টোপাধ্যায়-গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। তাঁহার ঠাকুরমন্দির বা অতিথিশালা ছিল বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু বাগান ও পুষ্করিণী যথেষ্ট ছিল। বহুকালের অর্জ্জুনা দীঘী তখন ঘোষাল মহাশয়ের সম্পত্তি।

এমনই দিনে—১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে—একদা অপরাহ্নে জনৈক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী সশিষ্য কাঁটালপাড়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অতিথিশালা নাই, সন্ন্যাসী বাধ্য হইয়া অর্জ্জুনার তটে বটচ্ছায়া তলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। তাঁহার কাঁধের উপর একটী দীর্ঘবিলম্বিত ঝুলি। ঝুলির ভিতর রাধাবল্লভজীউ ছিলেন। সন্ন্যাসী ঝুলিটি নামাইয়া তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন।

বিশ্রামান্তে সন্ন্যাসী যখন ঝুলিটি তুলিতে গেলেন, তখন তাহা আর তুলিতে পারিলেন না; ক্ষুদ্র বিগ্রহ তুলিতে সন্ন্যাসীর সামর্থ্যে কুলাইল না। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, ঠাকুরের সে স্থানে থাকিতে ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি তখন রঘুদেব ঘোষালকে ঠাকুরের সেবার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রঘুদেব তন্মুহূর্ত্তে স্বীকার পাইলেন। সন্ন্যাসী অর্জ্জুনার সন্নিকটে একস্থানে একখানি ক্ষুদ্র চালা তুলিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

কয়েক মাস পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া এক দানপত্র রঘুদেবকে প্রদান করিলেন। দানপত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক রাধাবল্লভজীউ বরাবর লিখিত। দানের সম্পত্তি সামান্য,—কয়েক বিঘা ভূমি মাত্র। বর্ত্তমান চট্টোপাধ্যায়-বাটী, রাধাবল্লভ-মন্দির প্রভৃতি এই দান-প্রাপ্ত ভূমির উপর দণ্ডায়মান। আমরা সকলে রাধা-বল্লভের প্রজা। কিন্তু এক্ষণে খাজনা দিই না; কেন না, তিনি বাকী খাজানার নালিশ করিতে অসমর্থ।

তা'র কয়েক বৎসর পরে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দির-গাত্রে প্রস্তরফলকে দুই ছত্র লিখিত ছিল।—

বাণ সপ্ত কলা শকে
রঘুদেবেন মন্দিরম্।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ১৬৭৫ শকে রঘুদেব কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে আজ ১৫৮ বৎসরের কথা।

এই রাধাবল্লভ কতদিনের তাহা কেহ বলিতে পারে না—কত সন্ন্যাসীর হাত ঘুরিয়া অবশেষে চট্টোপাধ্যায় বংশের হাতে পড়িয়াছেন, তাহা নির্ণয় করিয়া বলা অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র মধ্য জীবন হইতে রাধাবল্লভের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্রীশ্রী৺ রাধাবল্লভ জীউ ও বলরামচন্দ্র।

Mohiia Press, Calcutta.

বংশপরিচয়।

বংশ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধে আমি দক্ষ হইতে পরিচয় দিলাম।

দক্ষ
|
সুলোচন
|
বাসুদেব
|
নায়ি
|
নারো (মতান্তরে কৃষ্ণদেব)
|
বরাহ
|
শ্রীকর অধ্বর্য্যু (মতান্তরে শ্রীধর)
|
বহুরূপ
|
গাহী
|
অবসথী সর্ব্বেশ্বর

অবসথী সর্ব্বেশ্বর
|
তেকড়ি
|
সিদ্ধেশ্বর
|
লক্ষ্মীধর
|
দিগম্বর
|
জগন্নাথ
|
শ্রীগর্ভ (চৈতন্যদেবের সমকালীন)
|
ভগবান
|
অবসথী গঙ্গানন্দ
|
কৃষ্ণবল্লভ
|
নন্দগোপাল বা নন্দকিশোর
|
রামকান্ত
|
রামজীবন
|
রামহরি
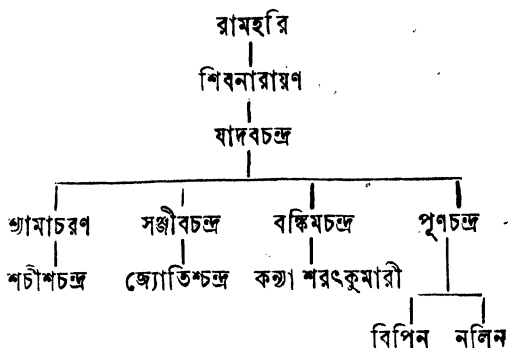
দক্ষ ৯৯৯ সম্বত—৮৪২ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ হইতে মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ষাট বৎসর।

তার পর বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বংশ পরিচয় দিব। —“অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো *। তাঁহার বংশীয় রাম-জীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া

* কোন্নগরের সন্নিকট।

গ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় পাইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন, সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটাল-পাড়ায় বাস করিতেছেন।"

মাতাপিতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের মাতা পিতা সম্বন্ধে একটু পরিচয় দিব। যাঁহার অস্থি হইতে দম্ভোলি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহার একটু পরিচয় প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মাতা সাতিশয় স্থূলাঙ্গী ও কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। কিন্তু এমন মাধুর্য্যময়ী, এমন করুণাময়ী শান্ত মূর্ত্তি জগতে অল্পই দৃষ্ট হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা তপ্তকাঞ্চনগৌরবর্ণ—দীর্ঘকায়—তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন — মহিমা-মণ্ডিত — তেজঃপুঞ্জ পুরুষ ছিলেন। পূজনীয় শ্রীযুত জ্যোতিশ্চন্দ্র অতি সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্রের জনক জননীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আমায় বলিয়াছেন, "যাদবচন্দ্রের মুখমণ্ডলে কিছু মাত্র অপবিত্র ভাব দেখি নাই; কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর বদনে যা' কিছু দেখিয়াছি, সমস্তই পবিত্র।"

যাদবচন্দ্র ১১৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার

দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হইয়াছিলেন।

যাদবচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে যাজপুরে গমন করেন। সেখানে তাঁহার অগ্রজ সহোদর কাশীনাথ, দারোগাগিরি করিতেন। পুলিসের দারোগা নহে, নিমৃকির দারোগা। যাদবচন্দ্র সেখানে ভাইয়ের কাছে থাকিয়া আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

যখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর, তখন তাঁহার কর্ণমূলে এক স্ফোটক দেখা দেয়। স্ফোটক ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিল—কর্ণমূল পচিতে লাগিল। চিকিৎসকেরা Gangrene বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। অবশেষে যাদবচন্দ্রের আত্মীয় স্বজনেরা দেখিলেন, তাঁহার জীবনের আর কোন আশা নাই। ক্রন্দনের রোলের মধ্যে যাদবচন্দ্রের দেহ বৈতরণীতীরে লইয়া যাওয়া হইল।

বৈতরণীর খেয়া ঘাটের পার্শ্বে যাদবচন্দ্রের দেহ রক্ষিত হইল। চিতা সজ্জিত হইল। যাদবচন্দ্রের

অগ্রজ ভ্রাতা ও বন্ধু বান্ধবেরা কাঁদিয়া আকুল। সেই ক্রন্দন রোলের মধ্যে সহসা গুরুগম্ভীর বাক্য-নির্ঘোষ শ্রুত হইল—"স্থিরো ভব।"

সকলে চমকিত হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, এক দীর্ঘকায় জটাজুটধারী মহাতেজোদীপ্ত প্রশান্তবদন সন্ন্যাসী, মুমূর্ষু যাদবচন্দ্রের নিকটে দণ্ডায়মান। সন্ন্যাসীকে দেখিবা মাত্র সকলের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। বিপদের সময় সন্ন্যাসীকে দেখিলে কে আশান্বিত না হয়?

যাদবচন্দ্রের পানে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "এ ব্যক্তি মরে নাই—এক্ষণে মরিবেও না। কেন ইহাকে আনিলে?"

বলিয়া তিনি মুমূর্ষুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নানাভঙ্গীতে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অচিরে যাদবচন্দ্রের চৈতন্যসঞ্চার হইল। ক্রমে তিনি উঠিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী কমণ্ডলু হইতে একটু জল লইয়া যাদবচন্দ্রের মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে যাদবচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত

হইলেন, এবং সন্ন্যাসীর চরণ দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া সকাতরে বলিলেন, "ঠাকুর, আমায় মন্ত্র দান কর।"

সন্ন্যাসী মন্ত্রপ্রদান করিতে প্রথমে অসম্মত হইলেন; পরে যাদবচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া মন্ত্রদানে সম্মত হইলেন। কিন্তু সে দিন সন্ন্যাসী মন্ত্র দেন নাই, যাদবচন্দ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলে, শুভদিনে শুভক্ষণে জনশূন্য বৈতরণী-তীরে বসিয়া যাদবচন্দ্রকে দীক্ষিত করিলেন।

দীক্ষান্তে সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি দীর্ঘজীবী ও সুখী হইবে; তোমার ঔরসে পুণ্যময় সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। মান সম্ভ্রম ধন ধর্ম্ম কিছুরই তোমার অভাব হইবে না।"

সন্ন্যাসীর পদধূলি মাথায় লইয়া যাদবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে আবার প্রভুর দর্শন পাইব?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "তোমার এ দেহে তুমি আমার তিনবার দর্শন পাইবে। একবার মধ্যজীবনে,—তীর্থক্ষেত্রে; দ্বিতীয়বার তোমার মৃত্যুর অষ্টাহপূর্ব্বে; তৃতীয়বার তোমার মৃত্যুর সময়।"

যাদবচন্দ্র বলিলেন, "আপনার অনুপস্থিতিতে এ দীর্ঘ সময় আমি কি লইয়া থাকিব ঠাকুর?"

সন্ন্যাসী স্বীয় চরণ হইতে খড়ম জোড়াটি লইয়া যাদবচন্দ্রকে প্রদান করিলেন; এবং বলিলেন, "এই খড়ম তুমি আজীবন পূজা করিও —কখন অশান্তি পাইবে না।"

সন্ন্যাসী আর একটি জিনিষ যাদবচন্দ্রকে দিয়াছিলেন,—সেটি পৈতা। এ পৈতা তুলা হইতে প্রস্তুত নহে। আমি বাল্যকালে তাহা দেখিয়াছি। পার্ব্বত্য প্রদেশস্থ বৃক্ষবিশেষের তন্তু হইতে এই পৈতা প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি।

যাদবচন্দ্র এ পৈতা কখন গলায় পরেন নাই; প্রাতঃ সন্ধ্যায় মস্তকে ধারণ করিতেন। খড়ম চিরদিন—প্রায় সত্তর বৎসর ধরিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছেন। অবশেষে ১২৮৭ সালে যখন তাঁহার পবিত্র দেহ গঙ্গাতীরে বহিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাঁহার সঙ্গে পৈতা ও খড়মও গিয়াছিল। তিন জিনিষ এক চিতায় পুড়িয়া ভস্মীভূত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৭৬১ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন খৃষ্টাব্দ ১৮৩৮। সময়,—১৩ই আষাঢ়—ইংরাজি ২৭ এ জুন—রাত্রি ৯টা। আষাঢ় মাসের রজনী হইলেও আকাশ তখন নির্ম্মল ও মেঘশূন্য ছিল। মধ্যাহ্নে আহারাদির পর হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের জননী প্রসব বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা কাহাকেও তিনি বলেন নাই। সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে প্রসব বেদনা বাড়িয়া উঠিল। তখন সূতিকাগার পরিষ্কৃত হইল, এবং ধাত্রী ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক ছুটিল। পাড়াগেঁয়ে ধাই, midwifery পড়ে নাই—শিক্ষাও পায় নাই। মহাঅস্ত্র বাকারির ছাল লইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। এবং পরীক্ষান্তে মহাগম্ভীর বদনে বলিলেন, "আজ রাতে প্রসব হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

তা'র ক্ষণকাল পরেই সূতিকাগার প্রকম্পিত করিয়া সহসা শঙ্খধ্বনি হইল। সে কথা "কাহিনীতে" বলিয়াছি। আমার পিতামহ উপস্থিত ছিলেন। আমার মনে হয়, স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র যেন মহাপুরুষ বঙ্কিম-চন্দ্রের জন্মের জন্য পূর্ব্বাহ্ণ হইতে প্রস্তুত ছিলেন।—পূর্ব্বাহ্ণে কে যেন তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিল, 'জনৈক মহাপুরুষ তোমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিবেন।' তিনি ছুটি লইয়া মেদিনীপুর হইতে গৃহে আসিয়া বসিয়াছিলেন।

(দক্ষ হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ছাব্বিশ পুরুষ। এই ছাব্বিশ পুরুষের মধ্যে—এই এক হাজার সত্তর বৎসরের ভিতর বঙ্কিমচন্দ্রের তুল্য কোন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা আমি অবগত নহি)

এস বঙ্কিম! দক্ষবংশ উজ্জ্বল করিয়া জগতে অবতীর্ণ হও। তুমি একদিন আসিয়াছিলে, আজ আবার এস। তুমিই একদিন তরবারি-হস্তে মহারাষ্ট্র-প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, আজ কপাল দোষে লেখনী-হস্তে বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলে। একদিন

তোমাকে রাজপুতানার দুর্ভেদ্য গিরিমালার মধ্যে ঔরঙ্গজেবের সম্মুখীন হইতে দেখিলাম, আর একদিন বাঙ্গালার নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে অম্বরবিদারী তোপ-মুখে দাঁড়াইয়া 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' গায়িতে শুনিলাম। সে অসি বাঁশী, লবণাম্বুরাশি ভারত সাগরে নিক্ষেপ করিয়া লেখনীহস্তে রোরুদ্যমান বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হও।

শৈশব।

বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশবের কথা বড় একটা কেহ অবগত নহে। যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা একে একে অপসৃত হইয়াছেন। যাহা শুনা যায়, তাহা জনশ্রুতি মাত্র। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কোন কথা বলিতে সাহস হয় না। দুই চারিটা কথা যাহা আমি বাল্যকালে গুরুজনদের নিকট শুনিয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পঞ্চম বৎসর বয়সে মেদিনীপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'হাতে খড়ি' হয়। তা'র কিছুকাল পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে জননীর সঙ্গে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হয়। সেখানে আসিলে পর তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়ের হস্তে অর্পিত হয়। গুরুমহাশয়ের নাম রামপ্রাণ সরকার। বঙ্কিমচন্দ্র এই সরকার মহাশয়ের চিত্র কিয়ৎ পরিমাণে অঙ্কিত করিতে ছাড়েন নাই।—"গ্রাম্য

কথায়" গুরুমহাশয়কে যখন ভোঁদার সুপণ্ডিতা জননীর সঙ্গে 'ভূত' শব্দ লইয়া মহাকলহে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিলাম, তখন রামপ্রাণ সরকারের কথা স্বতঃই আমার মনে পড়িল।

গুরুমহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধি সামান্য; যাদবচন্দ্রের অনুগ্রহের উপর তাঁহার জীবিকা কতকটা নির্ভর করিত। পাঠশালা-গৃহ যাদবচন্দ্রের সম্পত্তি। পাঠশালায় ইতরজাতীয় বালকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে গৃহীত হইলেন।

'ক' 'খ' পড়াইতে গিয়া গুরুমহাশয় সবিস্ময়ে দেখিলেন, পূর্ব্বজন্মান্তরীণ স্মৃতি, অথবা অসামান্য প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহায্য করিতেছে। যে বর্ণমালার পরিচয় করিতে সাধারণ বালকের পনর দিন, একমাস লাগে, সে বর্ণমালা বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে পঞ্চম বৎসর বয়সে শিক্ষা করিলেন। তখন 'বর্ণপরিচয়' ছিল না, 'শিশুবোধক' ছিল। 'অলস' 'অবশ' তুল্য বাক্যাবলী শিক্ষা করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দুই এক দণ্ড মাত্র লাগিয়াছিল। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র নাকি তৎকালে

গুরুমহাশয়কে বলিয়াছিলেন, 'অলস' 'অবশ' পড়িলেই 'যশম' 'পশম' পড়া হইল—পাতা উল্টাইয়া যান।" গুরুমহাশয়, 'গীত' 'কীট' আরম্ভ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তত্তুল্য কথাগুলি মুহূর্ত্ত মধ্যে শিক্ষা করিয়া নূতন কিছু শিখিতে চাহিলেন। গুরুমহাশয় সাতিশয় ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়াছিলেন, "বাবা বঙ্কিম, এরূপ ভাবে পড়িয়া গেলে আর কতদিন তোমায় পড়াইব?"

তা'র আট নয় মাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে পিতার কাছে চলিয়া গেলেন। যাদবচন্দ্র তখন তথায় ডিপুটি কালেক্টার। তিনি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই নভেম্বর তারিখে রিকেটস্ সাহেবের অনুগ্রহে ডিপুটি কালেক্টারের পদ পাইয়াছিলেন। এতৎ পূর্ব্বে তিনি নিম্কির দারোগা ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে আসিয়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। ইংরাজি বর্ণমালা শিক্ষা করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়দিন লাগিয়াছিল তাহা জানি না। তবে তাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দেবরা থানার জনৈক ভদ্রলোক বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, একদা স্কুলের সম্মুখস্থ পথ দিয়া জনৈক খোট্টা, বানর লইয়া ডুগ্‌ডুগি বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া বানর দেখিতে ছুটিলেন। তৎপ্রতি নিমেষশূন্য নয়নে চাহিতে চাহিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "বাঁদরটাকে এনে, আমাদের কেলাসে ভর্ত্তি করে দিলে হয়; দেখি, ইংরাজি শিখ্‌তে পারে কিনা।"

বঙ্কিমচন্দ্র, বাঁদর দেখিয়া যখন ক্লাসে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি শিক্ষক কর্ত্তৃক পাঠে অমনোযোগিতার জন্য বিশেষরূপে ভৎর্সিত হইলেন। তিরস্কৃত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যুদ্দীপ্ত নয়নে শিক্ষকের পানে একবার চাহিলেন, তা'র পর, তাঁহার স্থানে বসিয়া একমাসের পাঠ এক ঘণ্টায় আয়ত্ত করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বালকসুলভ কোন ক্রীড়ার অনুরাগী ছিলেন না। বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া বালকেরা কতরকম ছুটাছুটি খেলা করিত, কত রকম

ব্যায়াম করিত; বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু সে সব খেলায় অভিনেতারূপে, অথবা দর্শকরূপে যোগদান করিতেন না। তিনি তাস খেলিতে ভাল বাসিতেন। বিদ্যালয়ের ছুটির পর দুই তিন জন সমবয়স্ক বালক লইয়া তিনি তাস খেলিতে বসিতেন। এ অভ্যাস মেদিনীপুরে ছিল, এবং হুগলি কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন কালেও ছিল।

যাদবচন্দ্র ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর হইতে চব্বিশ পরগণায় বদলি হইয়া আসেন, এবং পর বৎসর বর্দ্ধমানে বদ্‌লি হ'ন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে আর পিতার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে ঘুরিতে হয় নাই। তিনি ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কাঁটালপাড়ায় থাকিয়া হুগলি কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন।

বিবাহ।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহের কথা 'কাহিনী'তে বলিয়াছি। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স একাদশ বৎসর। কাঁটালপাড়ার নিকট নারায়ণপুর গ্রামে একটি পরম সৌন্দর্য্যময়ী বালিকা ছিল। সেই বালিকার পঞ্চম বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

ইংরাজি শিক্ষা।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজি শিক্ষা মেদিনীপুর স্কুলে আরম্ভ হয়—প্রেসিডেন্সি কালেজে শেষ হয়। মধ্যকাল—দশ এগার বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কালেজে বিদ্যাভ্যাস করেন। সে সময় Entrance বা First Arts বা B. A. পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই। তখন Junior, Senior Scholarship পরীক্ষা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর হইতে আসিয়া নবম বৎসর বয়সে হুগলি কালেজের স্কুল বিভাগে ভর্ত্তি হইলেন।

সেখানে তাঁহার অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও মেধা শক্তি শিক্ষকদের চিত্তাকর্ষণ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র যাহা একবার শুনিতেন তাহা শীঘ্র ভুলিতেন না। যে প্রকৃতির অঙ্ক একটা কষিয়াছেন, সে প্রকৃতির অঙ্ক আর তাঁহাকে কষিতে হইত না। তিনি নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডীর ভিতর থাকিতে পারিতেন না। যখন বিদ্যালয়ে

Keightly, Elphinstoneর ইতিহাস পড়ান হইতেছে, তখন তিনি Hume, Macaulayর ইতিহাস পাঠ করিতেছেন। যখন ক্লাসে Rule of Three শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তখন তিনি Discount কষিতেছেন। এইরূপে তিনি সকল বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন।

শুধু অগ্রণী নয়, তিনি কোন বন্ধনের মধ্যে থাকিতে ভাল বাসিতেন না। বাল্যকালে বা কৈশোরে তিনি দীর্ঘকাল একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। পাঠে তন্ময় হইয়া বেশীক্ষণ একাসনে বসিয়া থাকা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। যৌবনে এ চাঞ্চল্য আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আমার মনে হয়, এটা প্রতিভার চাঞ্চল্য। অনলরাশি পদতলে সঞ্চিত হইলে বসুধা যেমন ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠে, তেমনই সঞ্চিত শক্তি-রাশি যতক্ষণ না নির্গমন পথ খুঁজিয়া পায়, ততক্ষণ মহাশক্তিশালী ব্যক্তিকে অস্থির করিয়া তুলে। প্রৌঢ়েও বঙ্কিমচন্দ্রের চাঞ্চল্য হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই; তবে কতকটা সংযত হইয়াছিল; এমন কি লিখিতে

লিখিতে তিনি বহুবার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেন—বহুবার গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতেন। শয্যায় বসিয়া থাকিলেও ক্ষণে ক্ষণে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেন। কাছারিতে রাজ-কার্য্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার সময়ও তিনি প্রথম প্রথম প্রতিনিয়ত হস্তপদ সঞ্চালন করিতেন। ক্রমে এ ভাব তিরোহিত হইয়াছিল। বার্দ্ধক্যে এ চাঞ্চল্য বড় একটা দেখি নাই; তবে যেন শেষ পর্য্যন্ত কিছু কিছু ছিল বলিয়া মনে হয়।

স্কুলের নির্দ্দিষ্ট পুস্তকাবলীর মধ্যে মন আবদ্ধ রাখিতে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুতেই সমর্থ হইলেন না; তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। হুগলী কালেজের সুবৃহৎ লাইব্রেরি মন্থন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস, জীবনী, সাহিত্য, কাব্য পাঠ করিতে লাগি-লেন। স্কুলের পাঠ্য পুস্তক কোথায় পড়িয়া রহিল, গৃহে বা বিদ্যালয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সে সকল পুস্তকের পানে ক্ষণেকের জন্যও চাহিয়া দেখিতেন না। তবে যখন বাৎসরিক পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিত, তখন বঙ্কিমচন্দ্র, পাঠ্য পুস্তক ঝাড়িয়া গুছাইয়া পড়িতে

আরম্ভ করিতেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে দেখা যাইত, বঙ্কিমচন্দ্র, সকল বালকের উপর স্থান গ্রহণ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহাদের নিকট কৈশোরে পাঠশিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই এক্ষণে জীবিত নাই; ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও জীবিত ছিলেন না। তবে তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হুগলি কালেজে আমার পঠদ্দশায় শুনিয়াছি। কোন শিক্ষক বলিতেন, বঙ্কিমচন্দ্রের তুল্য প্রতিভাবান্ ছাত্র, দ্বারকানাথ মিত্র ব্যতীত হুগলি কালেজে আর কেহ আসেন নাই। উভয়ের মধ্যে তুলনা করিয়া শিক্ষক বলিতেন, "মেধাশক্তিতে দ্বারকানাথ শ্রেষ্ঠতর ছিলেন, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিতে বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বারকানাথের উপর যাইতেন।" আমরা মুখব্যাদান পূর্ব্বক তাঁহাদের গল্প শুনিতাম। হুগলি কালেজ প্রায় পঁচাত্তর বর্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র ছাত্র আসিল, গেল; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বারকানাথের তুল্য ছাত্র হুগলি কালেজে আর কখন আসেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৈশোর বড় সুখে কাটিয়াছিল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, নিশীথে সকল সময়ই তিনি পুস্তক লইয়া বিভোর থাকিতেন। তিনি এক সময়ে পরিণত বয়সে জনৈক সহপাঠীর নিকট বলিয়াছিলেন, "আমি পুস্তক পাঠে যত আনন্দ পাই, তত আনন্দ জগতে আর কিছুতেই পাই না।" যৌবনের শেষভাগে বহরমপুরে অবস্থান কালে তিনি মুন্‌সেফ্ নফর বাবুর নিকট বলিয়াছিলেন, "পুস্তক লিখিয়া আমি যত আনন্দ পাই, তত আনন্দ আর কিছুতেই পাই না।"

অপরাহ্ন টুকু বঙ্কিমচন্দ্র অন্য কাজের জন্য রাখিতেন। ছুটাছুটি অথবা ব্যায়াম করিতেন না। তিনি একটি বাগান করিয়াছিলেন; সেই বাগানে তিনি অপরাহ্ন অতিবাহিত করিতেন। কোনদিন খালের ধারে বেড়াইতে যাইতেন। কোন দিন বা তাস খেলিতে বসিতেন।

বাগান খানি বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছিলেন। অর্জ্জুনার পাড়ের নীচে দশ পনর বিঘা জমির উপর তিনি এক উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন।

উদ্যানের নাম ছিল, ফুল-বাগান। বাগানের কিয়দংশ ভূমিতে ফুলগাছ ছিল; অবশিষ্টাংশ ফলের গাছে সমাচ্ছাদিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কালেজের উদ্যান হইতে ভাল ভাল গাছ আনিয়া 'ফুল বাগানে' স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন।

এই বাগানের মধ্যে অর্জ্জুনা দীঘীর তটে তিনি একখানি সুন্দর-গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গৃহটী ইষ্টক-নির্ম্মিত, লতাগুল্ম-সমাচ্ছাদিত। যেখানে গৃহ ছিল, সেখানে এখন কয়েকখানি ইট পড়িয়া আছে; তদ্ব্যতীত সে মনোহর ফুল বাগানের—সে চারুদর্শন উদ্যান-বাটীর কোন চিহ্ন নাই। আর চিহ্ন আছে, কৃষ্ণকান্তের উইলে; বারুণী পুষ্করিণীর বর্ণনা যখন পড়ি, তখনই আমার অর্জ্জুনা দীঘীর কথা মনে পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র এ উদ্যান ছাড়িয়া সময় সময় খালের ধারে বেড়াইতে যাইতেন। খাল, গঙ্গার একটি ক্ষুদ্র শাখা মাত্র; ভাটপাড়া ও কাঁটালপাড়ার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া জলাভূমির মধ্যে দেহ সংগোপন

করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহ হইতে খাল বেশী দূর নয়,—অর্জ্জুনা দীঘীর কিছু দক্ষিণ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তার পথটি বড় দুর্গম, ঝোপ জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই দুর্গম পথ একাকী অতিক্রম করিয়া কখন কখন খালের ধারে সন্ধ্যার প্রাক্কালে লতাবিতান তলে বসিতেন।

বসিয়া কখন 'শস্যশ্যামল' প্রান্তর পানে চাহিয়া থাকিতেন, কখন 'স্তরপরম্পরাবিন্যস্ত শ্বেতাম্বুদমালা-বিভূষিত' আকাশ পানে চাহিয়া থাকিতেন, কখন 'জ্যোৎস্না-প্রদীপ্ত সরোবরতুল্য স্থিরমূর্ত্তিতে' বসিয়া ক্ষুদ্র বীচিমালার তরঙ্গভঙ্গ দেখিতেন। কিন্তু এখানে বসিয়া কখন কবিতা লিখিতেন না।

কবিতা লিখিতেন গৃহে, কবিতা লিখিতেন ফুল-বাগানে। লিখিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। যখন ইচ্ছা হইত তখনই লিখিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই রাত্রি জাগিয়া লেখাপড়া করিতেন। শুনিয়াছি, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে তিনি পুস্তক ফেলিয়া শয়ন করিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র কৈশোরে ও নবযৌবনে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ছিলেন। দুর্ব্বল হইলেও তিনি সাহসী ছিলেন। শুধু সাহসী নয়; আমার মনে হয়, তিনি বাল্যকাল হইতে অদৃষ্টবাদী ছিলেন। খালের দুর্গম পথে সন্ধ্যার পর কেহ যাইতে সাহস করিত না, সর্প শৃগাল তথায় যথেষ্ট ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কোন কোন দিন এই পথে নির্ভীক হৃদয়ে সন্ধ্যার পর একাকী গৃহে ফিরিতেন। তাঁহার এ সাহস গঙ্গাপার হইবার সময়ও দেখিয়াছি। মেঘ ঝড় গ্রাহ্য না করিয়া ভয়শূন্য হৃদয়ে নৌকারোহণে পারাপার হইতেন। (কাহিনী ১৬ পৃষ্ঠা)। যৌবনে খুলনায় অবস্থান কালে তাঁহার সাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় পাইয়াছি। রূপসা নদীর মোহানা পার হইবার সময় একদা আকাশে মেঘাড়ম্বর করিল। বঙ্কিমচন্দ্র ভীত না হইয়া নৌকায় উঠিলেন। দীনবন্ধু বাবু ও জনৈক ওভারসিয়ার তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। সহযাত্রীরা মেঘ দেখিয়া নৌকায় উঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিষেধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের নিষেধ না শুনিয়া হাসিতে হাসিতে নৌকায় উঠিলেন; এবং প্রবল ঝড়ের মধ্যে প্রশান্তচিত্তে

গল্প করিতে করিতে মোহানা পার হইলেন। প্রৌঢ়ে—বহরমপুরে অবস্থান কালে—তাঁহার সাহস ও তেজের পরিচয় পাইয়াছিলাম। (কাহিনী ৪১ পৃষ্ঠা)। তার পর যাজপুরের পথে দস্যু-সম্মুখেও বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্দ্দমনীয় সাহস দেখিয়াছিলাম। (সে ঘটনাটি পরে উল্লেখ করিবার ইচ্ছা আছে)। এইরূপ দুর্ব্বল, ক্ষীণকায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহস ও তেজ বরাবর দেখিয়া আসিয়াছি। আমার মনে হয়, এটা শুধু সাহস নয়, এটা অদৃষ্টের উপর নির্ভরতা।

সাহিত্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী।

—ঃ০ঃ—

বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলি কালেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন আরও দুইটি প্রতিভাবান্ যুবক বাঙ্গালার দুইটি সুবিখ্যাত কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। একজনের নাম দীনবন্ধু মিত্র, অপরের নাম দ্বারকানাথ অধিকারী। দীনবন্ধু বাবু কলিকাতা হিন্দু কালেজে পড়িতেন, দ্বারকানাথ কৃষ্ণনগর কালেজে পড়িতেন। দুই জনেই বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। দীনবন্ধু বাবু, বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা ৯।১০ বৎসরের বড়। দীনবন্ধু বাবু কিছু কাল হুগলি কালেজে পড়িয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।

এই তিনজন শক্তিশালী নবীন যুবকদের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় না থাকিলেও সাহিত্যক্ষেত্রে সত্বর পরিচয় হইল। সে কথা ক্রমে বলিতেছি।

তখনকার দিনে সাহিত্যের অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই তখন সাহিত্য-সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বি-বিহীন একমাত্র সম্রাট। তাঁহার একখানি কাগজ ছিল; তাহার নাম, সম্বাদ প্রভাকর। প্রভাকর দৈনিক ছিল—প্রভাকর মাসিক ছিল। প্রাত্যহিক, অর্থাৎ দৈনিক প্রভাকর রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ প্রকাশিত হইত। দক্ষিণা,—"মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কা মাত্র।" প্রভাকর-যন্ত্র কলিকাতায় ছিল। কিছু কাল হেদুয়ার নিকটে থাকিয়া হোগলকুড়িয়ায় উঠিয়া যায়।

গুপ্ত-কবি আরও একখানি কাগজের সম্পাদক ছিলেন। তাহার নাম, "সাধুরঞ্জন।" 'সাধুরঞ্জনের' আকার ক্ষুদ্র ছিল, প্রভাকরেরও তাই। মোটে দুই খানা পাতা, তাও আবার দৈর্ঘ্যে ফুলস্কাপ কাগজের চেয়ে ছোট। ছাপা হইত ঘুঁড়ির কাগজে। সে রকম কাগজে এখন প্রুফও দেয় না।

দেশীয় সংবাদ পত্রের অবস্থা সে সময় কিরূপ ছিল, ও কি ভাবে অবস্থা উন্নত হইল, তাহা দেখাইবার

উদ্দেশ্যে Contemporary review * হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম।—

"That the early growth of the native Press was but slow, can be judged from the fact that, in 1850, after 28 years of existence, there were but 28 vernacular papers in existence in all North India with an annual circulation of about 60 copies, while in 1878 there were 97 vernacular papers in active circulation, and in 1880 there were 230 with a circulation of 150,000 copies. The first vernacular newspaper was printed in 1818, at Serampur. In 1890-91, there were 463 vernacular papers."

আমি কিন্তু উপরের হিসাবে ততটা আস্থা স্থাপন

* Volume x x x Vii; Page 461

করিতে পারিলাম না। কেন না, আমি দেখিতে পাই ১২৬০ সালের প্রারম্ভে অনেকগুলি বাঙ্গালা কাগজ বর্ত্তমান ছিল। নীচে তাহাদের হিসাব দিলাম ঃ—

সংবাদ প্রভাকর	দৈনিক	সংবাদ পত্র।
” পূর্ণচন্দ্রোদয়	ঐ	ঐ।
” ভাস্কর	বারত্রয়িক	ঐ।
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	মাসিক	ধর্ম্মপত্র।
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা	পাক্ষিক	ঐ।
সংবাদ সাধুরঞ্জন	সাপ্তাহিক	সংবাদ পত্র।
রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ	ঐ	ঐ।
বৰ্দ্ধমান জ্ঞান-প্রদায়িনী	ঐ	ঐ।
সংবাদ বৰ্দ্ধমান	ঐ	ঐ।
সংবাদ জ্ঞানোদয়	ঐ	ঐ।
কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা	ঐ	ঐ।
রসরাজ	অৰ্দ্ধ সাপ্তাহিক	ঐ।
নূতন সমাচার চন্দ্রিকা	ঐ	ঐ।
উপদেশক	মাসিক	ধর্ম্মপত্র।

সত্যার্ণব	মাসিক	ধর্ম্মপত্র।
বিবিধার্থ সংগ্রহ	মাসিক	নানা বিষয়ক।
ধর্ম্মরাজ	ঐ	ঐ।

এই সতর খানি কাগজ ১২৬০ সালের বৈশাখ মাসে বাঙ্গালা দেশে বিদ্যমান ছিল। এতৎপূর্ব্বে ৭৬ খানি বাঙ্গালা কাগজ ছিল; তাহারা জল বুদ্বুদের মত উঠিয়া কালস্রোতে মিলাইয়া গিয়াছিল। আমি তাহাদের তালিকা দিয়া পাঠকদের আর জ্বালাতন করিলাম না।

এ শুধু বাঙ্গালার কথা। এতদ্ব্যতীত উর্দ্দু, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত কাগজ ছিল। উপরোক্ত তালিকার উপর নির্ভর করিলে রিভিউয়ের হিসাবে অবিশ্বাস করিতে হয়। যে হিসাবটাই সত্য হউক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে, তখনকার দিনে সংবাদ পত্রের অবস্থা শোচনীয় ছিল। শোচনীয় হইলেও প্রভাকর সকলের উপর স্থান লইয়াছিল। এই শ্রেষ্ঠ কাগজ প্রভাকরে কিরূপ ভাবে পদ্য লেখা হইত, নিম্নে তাহার একটু পরিচয় দিলাম।—

জনৈক কবি লিখিলেন,—

পাপানল খর খর, জ্বলিতেছে গর গর
সর সর ওহে বন্ধুগণ।

গুপ্ত কবি লিখিলেন,—

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর,
পরিমাণে ধন দানে গৌরব প্রচুর,
বাবা গৌরব প্রচুর।

পরে আবার লিখিলেন,—

দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়,
বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকার ময়,
বাবা অন্ধকার ময়॥

প্রভাকরে তখন অনেকেই কবিতা লিখিয়া পাঠাইত। তন্মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রভাকর-সম্পাদক সেই ছাত্রমণ্ডলীর গুরু এবং উৎসাহদাতা ছিলেন। সকল ছাত্রের নাম করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহারা কিরূপ লিখিতেন তাহাও জানাইবার প্রয়োজন নাই। আমি শুধু তিন জন ছাত্র লিখিত

কাব্যের একটু পরিচয় দিব। তৎপূর্ব্বে গুরু ঈশ্বরচন্দ্র কিরূপ লিখিতেন, তাহা তাঁহার প্রভাকরের দুই তিন স্থান হইতে একটু একটু তুলিয়া দেখাইব।

১। প্রভাকর, ১২৬০ সাল, ১লা বৈশাখ।—

অম্বুদ অম্বর, গহন শিখর,
দৃষ্টি করি আমি যাহে।
হেন জ্ঞান হয়, ওহে দয়াময়,
বিরাজিত তুমি তাহে॥
পৃথিবী সলিল, অনল অনিল,
রবি শশী আর তারা।
নিয়ম তোমার, করিয়া প্রচার
পরিচয় দেয় তারা॥

২। প্রভাকর, ১৭৭৫ শকাব্দা, ৯ই জ্যৈষ্ঠ।—

ভাবি মনে, স্নিগ্ধ হব, সরোবরে নেয়ে
পুকুরে ফুকুরে কাঁদি, জল নাহি পেয়ে॥
সে জলে অনল জলে পুড়ে হই খাক্।
ডুব দিয়ে ভূত সাজি, গায়ে মেখে পাঁক॥

৩। প্রভাকর, ১২৬১ সাল, ১লা জ্যৈষ্ঠ।—

কেন আর কাল কাট, হেলায় হেলায়।
জীবন করিছ শেষ, খেলায় খেলায়।
আর কত ঘুরিবে হে মেলায় মেলায়।
এই বেলা পথ দেখ বেলায় বেলায়॥
ভূতে করে হাড় গুড়া, ঢেলায় ঢেলায়।
জান না কি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায়॥

৪। প্রভাকর, ১লা শ্রাবণ ১২৬০ সাল,—

পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীসর্ব্বাধ্যক্ষ পরমেশ্বর পরম পিতা ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।

সেবকানুসেবক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তস্য প্রণামা শত সহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ—মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ প্রণত সেবকের সমস্তই মঙ্গল জানিবেন। বিশেষতঃ আপনার মঙ্গলেই আমার দিগের মঙ্গল। ইত্যাদি।

এবার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রতিদ্বন্দী দ্বারকানাথের কবিতার একটু পরিচয় দিব।

১। এখন যেরূপ সাজ, প্রকাশিতে হয় লাজ,
তথাপি শুনহ গুণধাম।
ধর্ম্ম ত্রিলোকের স্বামী, তাঁহার তনয়া আমি,
জগতে সতীত্ব মম নাম॥

২। একদিন স্বপ্নে কোন অরণ্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এক পরম সুন্দরী নারী জীর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক মস্তকে হস্ত দিয়া বিষণ্ণ বদনে উপবিষ্টা আছেন, এবং তাঁহার নয়ন যুগল অজস্র অশ্রু নিস্রাব করিতেছে।

৩। কেবল তোমার পাশ, যাইয়া করিবে বাস,
সদা এই অভিলাষ, মন মোর করে লো,
ভবে নাই হেন জন, বিনে তুমি প্রাণধন,
আর করে নিবেদন, তাপিত অন্তরে লো॥

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী দীনবন্ধু বাবুর লিখিত কবিতা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিব।

১। কৃষকেরা বীজ বপনাগ্রে কর্ষণ দ্বারা এবং বারি সেচনে ভূমিকে কোমল করে, কেহ তাহাতে

প্রস্তর বা অঙ্গার ক্ষেপণ করে না। সদুপদেশ বীজ স্বরূপ, জনগণের মনঃক্ষেত্রে রোপিত হয়, সুতরাং উপদেশরূপ বীজ বপনাগ্রে মিষ্ট কথা রূপ বারি বপন-দ্বারা মনঃক্ষেত্র নরম করা আবশ্যক।

২। জামাই ষষ্ঠী।

(যুবকের) তাপ বাড়ে, কমে যত, তপনের তাপ।
রবি অস্ত দেরি দেখে, বাড়িছে বিলাপ॥
—মনের আঁধার যায়, দেখিয়া আঁধার।
নিশিতে প্রণয় নীরে দিবেন সাঁতার॥
—মেয়ের মায়ের মন, রসে টল মল।
ভূষণে ভূষিতা করে তনয়া কমল॥
জামাই সোহাগি টিপ্ ভালে কেটে দিল।
বিমল কমলে যেন ভ্রমর বসিল॥
—নির্জ্জনে নলিনী সনে, কর প্রেমালাপ।
আমরা থাকিলে হেথা বাড়িবে বিলাপ॥
—কি ভাবে ভাবনা প্রিয়ে ভাবিয়া না পাই।
পরিণত বিধুমুখ তাহে কথা নাই॥

রূপের গৌরবে বুঝি হ'য়ে গরবিনী।
প্রেমাধীন জনে,দুখ দেও আদরিণী॥
—তব সনে প্রণয়িনী এই দরশন।
বল দেখি আমি তব হই কোন্ জন॥
রসিকা বালিকা করে সরস উত্তর।
তব পরিচয় দিব শুন প্রাণেশ্বর॥
জানিয়াছি জিজ্ঞাসিয়ে ঠাকুর্ঝির ঠাঁই।
তুমি প্রাণ হও মোর ঠাকুর জামাই॥
উত্তরেতে নিরুত্তর মাধব হইল।
বাহিরে মহিলাদল হাসিতে লাগিল॥

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচনা লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে, প্রভাকর হইতে আর তাহা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। দুই চারি বৎসর পরে হয়ত প্রভাকরও আর পাওয়া যাইবে না। আমি তাঁহার বাল্য রচনাগুলি রক্ষা করিবার মানসে নিম্নে একে একে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহারা বিরক্তি বোধ করিবেন তাঁহারা যেন এ অংশ-টুকু বাদ দিয়া যান। আমি কোন রচনার পরিবর্ত্তন বা বর্ণশুদ্ধি না করিয়া যথাযথ প্রকাশ করিলাম।

প্রথম কবিতা।

শিশির বর্ণনা ছলে স্ত্রী পতির কথোপকথন।

লঘুললিত।

স্ত্রী। হইয়াছে জল, বড়ই শীতল,
ছুঁইলে বিকল হইতে হয়।
আগে যে জীবন, জুড়াত জীবন,
সে বন এখন, নাহিক সয়॥

সুখদ মলয়, হইলেক লয়,
এলো হিমালয় শীতল অতি।
পদার্থ সকল, সমীরণ জল,
কি কাল শীতল হলো সম্প্রতি॥
সকল শীতল, করয় বিকল,
কিন্তু অপরূপ, নিরখি তায়।
সমস্ত শীতল, প্রতপ্ত কেবল,
বোধ হয় প্রাণ, তোমার গায়॥

পতি। মোরে নিরন্তর, তব নেত্রকর,
পাবক প্রখর, দাহন করে।
মম দেহোপর, বহ্নি খর তর,
তাই উষ্ণভাব এ দেহে ধরে॥

স্ত্রী। কেন বিভাবরী, দীর্ঘ দেহ ধরি,
ধরায় বিরহি রহে এখন।
ত্যজিতে ধরণী, না চায় রজনী,
বল গুণমণি, শুনি কারণ॥

পতি। নয়ন মুদিয়ে, থাক ঘুমাইয়ে
তখনি হেরিয়ে, তোমার মুখ।

সতী বিভাবরী, শশীজ্ঞান করি,
হেরি প্রাণপতি পায় কি সুখ ॥
আছে যতক্ষণ, শশী প্রাণ ধন,
পাইয়ে রতন না ত্যজে তায়।
তাই বিভাবরী, পতি বোধ করি,
বহুক্ষণ ধরি রয় ধরায় ॥
কিন্তু লো যেক্ষণে নিদ্রার ভঞ্জনে,
চাহিয়া নয়নে, উঠ প্রভাতে।
হেরি ও নয়নে নিশা ভাবি মনে,
কুমুদী সতিনী, পালায় তাতে ॥

স্ত্রী। অতিশয় ঘন, বল কি কারণ,
নিরখি প্রভাতে এ কুজ্‌ঝটিকা।
কেন সব হয়, ধূমাকার ময়,
কি ধূম হইল, ধরা ব্যাপিকা ॥

পতি। এবে আর দর্প, না করে কন্দর্প,
তাহার কারণ শুন ইহায়।
তব নিকেতন, আসিল মদন,
আপন যাতন, দিতে তোমায় ॥

কিন্তু তব স্থান হরের সমান,
যে বহ্নি নয়নে সে ভস্ম হয়।
তাই ধনি তার, শক্তি সে প্রকার,
অবনীতে আর নাহিক রয়॥
ভস্ম হইল শর, তার কলেবর,
প্রবল দহনে, দাহন হয়।
দাহনের ধূম, ব্যাপে নভোভূম,
ভ্রমেতে কুআশা, লোকে কয়॥

স্ত্রী। কি কারণ প্রাণ, শঙ্কর সমান,
মোরে কর জ্ঞান উন্মত্ত প্রায়।
কোথায় কি মম, হের হর সম,
তোমারে বুঝাতে হইল দায়॥

পতি। বিবেচনা করি, তোরে প্রাণেশ্বরী,
বলি ত্রিপুরারি, প্রলাপ নয়।
হরের ভূষণ, সব বিলক্ষণ,
তোমার অঙ্গেতে, তুলনা হয়॥
হরের ইন্দুর, সমান সীন্দুর
শিরেলো তোমার, কি শোভা পায়।

সদা শিরোপরি, আছ সিঁথিপরি,
তিন ধারা ধরি, গঙ্গা খেলায়॥
স্কন্ধ শিরোপরে, হরের বিহরে,
সদা ফণিবরে, ভীষণ অতি।
বেণী ফণিবর, তব নিরন্তর,
স্কন্ধ শিরোপর, বয় তেমতি॥
যেই মত হরে, কণ্ঠে বিষধরে,
তেমতি গরল তুমিও ধর।
কিন্তু কণ্ঠে নয়, কিছু অধো রয়,
বিশেষিয়া বলি, ও পয়োধর॥
যে গরল হরে, কণ্ঠ দেশে ধরে
কাছে না এনে সে নাশিতে নারে।
কিন্তু পয়োধরে যে গরল ধরে,
দূর হইতেই মানবে মারে॥
যদি বল প্রিয়ে, কণ্ঠে না রহিয়ে,
অধোভাগে কেন, গরল রয়।
কণ্ঠে রৈলে তবে, মুখ কাছে রবে
মুখামৃতে বিষ নিস্তেজ হয়॥

স্ত্রী। কি মূঢ় মানব, কোলে নিজ সব,
দুরন্ত পাবক, লয়েছে টানি।
বিশ্বাসঘাতক, সেই সে পাবক,
করিবে দহন তাহা না জানি॥

পতি। দোষ দাও পরে, নিজ দোষাপরে,
দৃষ্টি নাহি কর কি অপরূপ।
আপনি কেমনে আপন নয়নে,
রেখেছো অনল, কহ স্বরূপ॥

স্ত্রী। তবে প্রেমাধার রাখিব না আর,
নয়নে আমার, কাল অনল।
দেখ প্রাণ ধন, মুদিয়া নয়ন,
তাড়াই আগুন, শয্যায় চল॥

পতি। যদি তুমি প্রাণ নাহি দিলে স্থান,
কোথায় অনল যাইবে আর।
পৃথিবীতে আর স্থান নাহি তার,
তাহে বলী শীত বিপক্ষ তার॥
যাইবে যথায়, যাইবে তথায়,
দুরন্ত শাত্রব, শীত ধাইয়ে।

এমতে ধরায় নাহি স্থান পায়,
শেষে জলে যায়, রয় ডুবিয়ে॥
তাই দেখ কাল, নিশা শেষকাল,
উঠে জল হোতে ধূমের রাশি।
তাই বলি প্রিয়ে, স্থান না পাইয়ে,
হয়েছে অনল সলিল রাশি॥

দ্বিতীয় কবিতা।

বর্ষা বর্ণনা ছলে দম্পতির রসালাপ।

কামিনী

ত্রিপদী।

দেখি কি হে ভয়ঙ্কর, গরজিয়ে গর গর,
ব্যাপিল গগনে নবঘনে।
নবনীল নিরুপম, অর্দ্ধ-তমস্বিনী সম,
দুলিছে দামিনী ক্ষণে ক্ষণে॥

ঘন ঘোর গরজনে, বিদারে গগনে বনে,
তীক্ষ্ণ তীর সম বরিষয়।
বল বল প্রাণনাথ, কেন কেন অকস্মাৎ,
গরজন বরিষণ হয়॥

পতি

প্রাণেশ্বরী শুন শুন, যে কারণে পুন পুন,
গরজন বরিষণ হয়।
অতিশয় দম্ভ ভরে, বর্ষা আগমন করে,
সঙ্গে সব সহচর হয়॥
ভেবেছিল যুবরাজ, নাহি ভুবনের মাঝ,
রূপবান তাহার সমান।
সে গর্ব্ব হইল নাশ, হারিল তোমার পাশ,
বরষার পূর্ণ অপমান॥
নিবিড় চাঁচর তব, তাহে কাদম্বিনী নব,
রূপেতে কি রূপে তোমা সমা।
তব মৃদু হাসি স্থানে, পদে পদে অপমানে
দুখিনী দামিনী নিরুপমা॥

মরি কি সুন্দর পশি, মুদিতা সুন্দরাবসি,
কোমল কমল কলি জলে।
তাহে পরাজিত করে, তোমার হৃদয়োপরে,
নব কুচ কলিকা যুগলে॥
বর্ষার পল্লব নব, তা' হ'তে অধর তব,
শতগুণে সুকোমল শোভা।
নদনদী জলে টলে, তা' হ'তে যৌবন জলে,
তব দেহ কিবা মনোলোভা॥
আর দেখো করিবরে, বরষায় মত্ত করে,
দ্বিগুণ উন্মত্ত তুমি কর।
হেরিয়া তোমার করে, হেরি তব পয়োধরে,
চিৎকার করিছে কুঞ্জর॥
যে দাড়িম্ব বরষার, সকল গর্ব্বের সার,
তব কুচে পূর্ণ মান নাশ।
মেঘে রবি ঢাকা ঢাকি, কেশেতে সিন্দূর মাখি,
তাহা হতে লাবণ্য প্রকাশ॥
পদে পদে এইরূপে, হারিয়া তোমার রূপে,
কত অপমান বরষার।

এতদুখ সহিবারে, বরষা নাহিক পারে,
রোদন করিছে অনিবার॥
সে রোদনে অনিবার, পড়ে বৃষ্টি ধার তার,
ঘননাদ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
তাই প্রাণ নিরন্তর, বরষিছে জলধর,
তাই মেঘ গর্জ্জে অনিবারে॥

কামিনী

বিঘোর নীরদোপরে, কত হাব ভাব ভরে,
চপলা চঞ্চলা চমকায়।
কেন কেন ক্ষণপ্রভা, ক্ষণেক প্রকাশি প্রভা,
ক্ষণপরে বারিদে লুকায়॥

পতি

গিরির শিখর পরে, থাকে যত জলধরে,
দেখিল তোমার কুচগিরি।
পরিহরি সে ভূধরে, রৈতে পয়োধর পরে,
আসিতে লাগিল ধিরি ধিরি॥
এসে দেখে হায় হায়, নীলবস্ত্র মেঘে তায়,
বসিয়াছে মনের পুলকে।

ক্রুদ্ধে মেঘ নাহি রক্ষে, অগ্নি শিখে উঠে চক্ষে,
তাই সখি বিদ্যুৎ চমকে॥
জলধর ক্রোধমনে, আদেশিল সমীরণে,
উড়াইতে বুকের বসন।
তাই বায়ু আসে ডেকে, যাবে বুক খুলে রেখে,
ধরিয়ে রাখিবে কতক্ষণ॥

কামিনী

আগে ছিল সুধাকর, বিমল কোমল কর,
নিরমল গগন মণ্ডলে।
এখন কেন গো শশী, গগন মণ্ডলে পশি,
ঢাকিয়াছে জলদ সকলে॥

পতি

তোমার সমান হতে, শশধর বিধিমতে,
বাঞ্ছা করে আকাশে থাকিয়া।
দেখে তুমি কর মান, জেনে সে মানের মান,
মুখ মেঘ বসনে ঢাকিয়া॥
বৃষ্টি ধারে ধীরে ধীরে, ফেলিয়া অশ্রুর নীরে,
ম্লানমুখে করিয়াছে মান।

হলো কিনা তোমা মত, দেখিবারে অবিরত,
ক্ষণে ক্ষণে হয় দৃশ্যমান॥

কামিনী

খর কর ধরি রবি, মেঘে ঢাকা দেখে ছবি,
নহে প্রকাশিত প্রভাকর।
না হেরি পতির মুখে, নয়ন মুদিয়া দুখে,
কমলিনী কতই কাতর॥
সাধে কি সকলে কয়, পুরুষ পরস-ময়,
কি কঠিন তাদের হৃদয়।
এই দেখ দিনকর, কেমন নিদয়ান্তর,
রমণীরে কেমন নির্দ্দয়॥
কমলিনী যাঁর তরে, সতত বিলাপ করে,
মৌনমুখী মুদিত নয়ন।
দয়া করি সেও তায়, ফিরিয়া নাহিক চায়,
সদা করে প্রাণে জ্বালাতন॥

পতি

গুণমণি দিনমণি, কেন লো রমণি মণি,
না বুঝিয়ে দোষ দিবাকরে।

নলিনীর পেয়ে দোষ, দিনেশ করেছে রোষ,
তার সনে দেখা নাহি করে ॥
তব মুখে কমলিনী, কোলে ধরে বিনোদিনী,
সিন্দুরের বিন্দু প্রভাকর।
কোলে অন্য দিবাকর, কমলিনী কলেবর,
দেখিয়ে মলিন দিনেশ ঈশ্বর ॥
মনে জানিলেন দড়, নলিনী অসতী বড়,
নাহি করে মুখ দরশন।
গুণমণি, দিনমণি, কেন লো রমণি মণি,
না জানিয়া দোষলো তপন ॥

কামিনী

এ সময় মধুকরে, কি জ্বালায় জ্বলে মরে,
মুদিত সকল শতদল।
যদি কোন পদ্ম পায়, অপ্রফুল্ল দেখে তায়,
মধুহীন যতন বিফল ॥
ভ্রমে ভ্রমি সে ভ্রমরে, যদ্যপি গমন করে,
অন্য কমলিনী নিকেতন।

মৃণাল কণ্টকে লেগে, ছিন্নঅঙ্গ হয়ে রেগে,
অন্য পদ্মে করিলো গমন॥
অপ্রকাশ্য সেই কলি, বাতাস লাগিল বলি,
হেলে দুলে ফেরে তাহা হতে।
নিরুপায় নিরাশায়, শেষে মধুকর যায়,
কলিকা উপরে স্থান লতে॥

পতি

আ মরিলো এ অধীনে, সেই মত একদিনে,
ঘটাইলে প্রাণের রতন।
তুমি লো কমলবন, ছয় পদ্ম সুশোভন,
কর পদ হৃদয় বদন॥
যবে প্রিয়ে মান করি, মজাইলে প্রাণেশ্বরি,
লক্ষ্য করি মুখ শতদল।
গিয়ে তার মধুপানে, তৃপ্ত করিবারে প্রাণে,
অপ্রফুল্ল দেখি সে কমল॥
তাহাতে বঞ্চিলে ছলে, যাই কর শতদলে,
হাতে ধরে ঘুচাইতে মান।

গহনা মৃণালে কাঁটা, অঙ্গুলি যাইল কাটা,
পরে পাদ পদ পড়ি প্রাণ ॥
হেলে দুলে সে কমলে, লুটাইয়া শতদলে,
ফিরাইলে প্রাণের ললনা।
শেষে যাই কলিপরে, শোভিছে যা' হৃদি পরে
দূরে গেল মানের ছলনা ॥

কামিনী

বল বল তারাচয়, কেন কেন ম্লান হয়,
ছিল কিবা শোভাকর কর।

পতি

যামিনী কামিনী সতী, লইয়ে যামিনী পতি,
বিলাসিছে মেঘের ভিতর ॥
পাছে বা দেখিতে পাই, নিভাইয়ে দেছে তাই,
আকাশের দীপ তারাগণে।
তবুও তো নিরন্তর, স্থির নহে শশধর,
উঁকি মেরে দেখে ক্ষণে ক্ষণে ॥

কামিনী

পেয়ে নীর ধর নীর, পূর্ণাকার ধরে নীর,
আহা মরি শোভা তার কত।
জলপূর্ণ সরোবর, যদ্যপিহে মোহকর,
কমলিনী বিনে শোভা হত॥

পতি

নালো প্রাণ মনোহর, দেখিতেছি সরোবর,
সরোজিনী সহ শোভা পায়।
ধরণী সলিলাবৃতা, যেন সরো সুশোভিতা,
তুমি প্রাণ কমলিনী তায়॥

কামিনী

এর বা কারণ কিবা, এই বরষার দিবা,
দীর্ঘ দেহ করেছে ধারণ।
কমে গেছে তমস্বিনী, তবু তাহে বিষাদিনী,
বিরহিনী বিনোদিনী-গণ॥

পতি

সুমেরু শিখর আর, ও কুচ ভূধরাকার,
এ তিন শিখর নিরখিয়ে।

হইল তপন ব্যস্ত, কোন্‌টায় যাবে অস্ত,
তাই ভাবে বিলম্ব করিয়া॥
ঘন ঘোর ঘন অতি, ঢেকেছে যামিনী পতি,
বিরহিনী বিষাদে রজনী।
কেঁদে কেঁদে বুক ফাটি, দুখে দেহ করে মাটি
যৌবনেই মরে গেল ধনী॥

তৃতীয় কবিতা।

দূরদেশ গমনের বিদায়।

পতি

ললিত।

একবার দেখি আর, দেখি দেখি এইবার,
দেখি ফিরে বিধুমুখ, দেখি আঁখি ভরি-লো।
আজিকার নিশী ভোরে, লয়ে যাবে কোথা মোরে,
কতদিন তোমা বিনে, রহিব কি করি-লো॥
বিদরে বিদরে বুক, হেরিব না বিধুমুখ,
বিধুমুখ হাসি ভরা, রব স্বপ্নে স্মরি-লো।

আসি কিনা আসি ফিরে, হেরি কিনা প্রেয়সীরে.
জানিনে জানিনে কিছু, বাঁচি কিনা মরি-লো॥
হেরি কিনা হেরি আর, শশিমুখে ফিরে বার,
জনমের মত তাই, হেরি ভাল করি-লো।
সেই শেষ সুখ মরি, বিধি বুঝি লয় হরি,
বুঝি নিশি পোহাইল, তাই হৃদে ডরি লো॥
কি শুনি কি শুনি ধনি, কুহু কুহু করি ধ্বনি,
হৃদয়ে শিহরি মরি, যে শুনেছি কাণে-রে।
বুঝেছি বুঝেছি মরি, পোহাইল বিভাবরী,
পোহাইল পোহাইল, মন তা না মানে-রে॥
হা রজনি একবার, রহ রহ রহ আর,
একবার চাহি আমি, চন্দ্রমুখী পানে-রে।
মুখ পানে চেয়ে রই, নয়নে নয়নে হই,
একবার দীর্ঘশ্বাস, সলিল নয়নে-রে॥
একবার মরি মরি, হৃদয় হৃদয়ে করি,
অধরে অধর ধরি, জুড়াইব প্রাণে রে॥
ধরি হৃদি হৃদি পরে, কত দিবসের তরে,
জনমের মত কিনা, কে জানে কে জানে রে॥

নালো নালো মিছে বলি, যামিনী গিয়াছে চলি,
ফিরিবে না, ফিরিবে না, ফিরাবার নয়-লো।
ওই দেখ নীল নিশী, মৃদু আলো সনে মিশি,
করিছে বিঘোর আলো, চারিদিগ্ ময়-লো॥
অসীম আকাশে পশি, নাহি রবি নাহি শশী,
গগনে নিভেছে যেন, যত তারা চয়-লো।
কি বলি গগনোপরে, একাকি মধুর করে,
প্রভাতের সুখতারা, কিবা শোভা হয় লো॥
এখনি আকাশোপর, প্রকাশিবে প্রভাকর,
এখনি যাইব কোথা, ভেবে হৃদি দয়-লো।
আসিলো আসিলো প্রিয়ে, আসিলো বিদায় নিয়ে,
চলিলাম কতদূরে, কি কপালে রয় লো॥
যথা যাব তথা রব, প্রেমডোরে বাঁধা তব,
অন্তরে অন্তরে বাঁধা, প্রণয়েরি পাশে লো।
স্বপনে নয়নে মনে, হেরিব সে চন্দ্রাননে,
হেরিব সে বিধুমুখ, মৃদু মৃদু হাসে-লো॥
তোমা চিন্তা সর্ব্বক্ষণে, শয়নে স্বপনে মনে,
এক আশে রবে প্রাণ, ফিরে দেখা আশে-লো।

সুখ শশী হলে হারা, একা প্রভাতের তারা,
হবে মোর অন্ধকার, হৃদয় আকাশে-লো॥

স্ত্রী

ত্রিপদী।

কেন অরে বিভাবরী, পোহাইল মরি মরি,
পোহাইল দিবারে যাতনা।
কেন রে যামিনী ভাগে, স্বপ্নে জানিবার আগে,
কেন কেন মরণ হলো না॥
জেনেছি জেনেছি আগে, যখন যামিনী ভাগে,
হৃদি মোর হইল চঞ্চল।
তখনি জেনেছি মনে, পাইব প্রাণেরি জনে,
যাবে মোর যা আছে সকল॥
তখনি ভেবেছি মনে, কেন কেন কি কারণে,
হৃদি মোর চঞ্চল বিকল।
কেন রে অস্থির হিয়া, ক্ষণে উঠি শিহরিয়া,
কেঁদে কেঁদে উঠিছে কেবল॥
প্রাণনাথ হৃদি পরে, হৃদি পরশিলে পরে,
অস্থির হৃদয় হব স্থির।

স্বর্গ সুখ সম হিয়ে, তদুপরে হৃদি দিয়ে,
কত সুখে ঘুমাই গভীর ॥
মরি মরি সে প্রকারে, যাইতে পাবনা আর,
নিদ্রা তব হৃদির উপর।
হৃদিপরে হৃদি দিয়ে, পয়োধরে পরশিয়ে,
জুড়াবনা কাতর অন্তর ॥
সেখানে যতেক জ্বালা, নাহি করে ঝালাপালা,
শুধু যত সুখের স্বপন।
আর কি মধুরাকার, হেরিব না ফিরে বার,
শশধর সমান বদন ॥
নয়নে নয়নে করি, অধর অধরোপরি,
করিব না কি আর চুম্বন।
আর কিহে করে করে, মিলাব না পরস্পরে,
স্কন্ধে কর করিয়ে ধারণ ॥
নাহে নাহে সুখকাল, হয়েছে অতীত।
বিরহ বারিধি মাঝে, হয়েছি পতিত ॥
জানি জানি সেই জ্বালা, অহরহ ঝালাপালা,
করিবে আমারে মনে মনে।

না দেখে প্রিয়ের মুখ, একেলা দাহিবে বুক,
নানাগুণে গোপনে গোপনে ॥
শুধু প্রাণনাথ আশা, রবে এক হৃদে আশা,
শপ্রবল সয়নে স্বপনে।
আসা দিন অনুরাগী, রব প্রাণে তার লাগী,
শুধু সেই দিন আসামনে ॥
যেন যবে বিভাবরী, তমসা বসন পরি,
শশধর না করে প্রকাশ।
যদ্যপি তাহারোপরে, ভয়ঙ্কর জলধরে,
তাহা সহ ঢাকয়ে আকাশ ॥
নিবিড় তিমির ময়, শুধু দরশন হয়,
শশী তারা নাহিক আকাশে।
শুধু ভেদি জলধর, যদি হয় ক্ষীণ কর,
এক তারা একাকী বিকাসে ॥
তেমতি আমার বুকে, অন্ধকার দুখে দুখে,
গেছে যত আশা যত সুখ।
শুধু প্রাণনাথ আসা, তারি প্রাণভরা আশা,
একাকী বিহরে মোর বুক ॥

সে মুখ বাসর কবে, বল বল কবে হবে,
কবে হবে ফিরে দরশন।
করি তাহা জপমালা, ভুলিব বিরহ জ্বালা,
যদি পারি ভুলিতে রতন।

পতি

চৌপদী।

যদি দেহে প্রাণ ধরি, আসিবহে ত্বরা করি,
তোরে ফেলে প্রাণ মরি, রহেনা লো রহেনা।
অন্তরে প্রণয় ডোরে, যে দৃঢ় গেঁথেছ মোরে,
প্রাণেতে ত্যজিতে তোরে, সহেনা লো সহে না॥
কিন্তুলো তরুণ করে, প্রকাশিল প্রভাকরে,
আর কথা পরস্পরে কহেনা লো কহে না।
তবে যাই সুনয়নি, যাইলো হৃদয় মণি,
যাই কিন্তু পদ ধনি, বহেনা লো বহে না॥

চতুর্থ কবিতা।

চন্দ্রদূত।

রূপক। ত্রিপদী।

দ্বিযাম যামিনী যায়, আমরি কি শোভা তায়,
নিরখি নির্ম্মল নদী তীরে।
নিরমল নিলাকাশ, সীমা বিনা সুপ্রকাশ,
মাঝে হেরি মধুর শশিরে॥
যেন কোন নববালা, পাইয়া বিরহ জ্বালা,
মলিনতা মধুর বদনে।
গগন গহন বনে, মনোদুখে মরি মনে,
ভ্রমিতেছে গজেশ গমনে॥
সেই রূপ মনোহর, রূপধরি শশধর,
আলো করে ধরণী আকাশ।
গগনের যত তারা, হইয়াছে কর হারা,
অল্প তারা আকাশ প্রকাশ॥
মাঝে মাঝে শশধরে, ঢাকে ক্ষীণ জলধরে,
মরি যেন নাথ দরশনে।

রহি গুরুজন মাঝে, মোহিনী মহিলা লাজে,
ঢাকা দেয় বদন বসনে॥
চন্দ্রিকা বসন পরা, গভীর নিশীতে ধরা,
মোহ মন্ত্রে যেন নিদ্রা যায়।
ঘোর স্তব্ধ ত্রিভুবন, দেখিয়া চাহিছে মন,
আরাধিতে অচিন্ত্য স্রষ্টায়॥
শুধু হয় শব্দ তায়, পরশি নিকুঞ্জ গায়,
চলিছে সমীর মৃদু স্বরে।
পূর্ণ নদী স্থির নীরে, শুধু শব্দ ধীরে ধীরে,
মধুর মলয় মন্দ করে॥
আহা মরি মরি কিরে, এমন নদীর তীরে,
কেরে শত শোভা ধরি বসি।
বুঝি এ বিরহ লাগী, প্রণয়িনী অনুরাগী,
যুবক জনেক যেন শশী॥
ভৃণের কুসুম কুঞ্জ, ললিত লতিকা পুঞ্জ,
ঘেরি তারে বারি ধারে রয়।
যেমন মলিন শশী, মলিন বদনে বসি,
দীর্ঘশ্বাসে বিদরে হৃদয়॥

আঁখি হতে বারে বারে, ধারা বহে ধারে ধারে,
তাহাতে কতই শোভা ধরে।
যেন সে নয়ন জলে, শশী পশি ছায়া ছলে,
চুম্বন গণ্ডেতে তার করে॥
নিরখি নয়ন ভরি, মধুর চন্দ্রমাপরি,
শেষে শশী সম্বোধিয়া কয়।
আরে মনোহর শশী, গগন মণ্ডলে পশি,
পার যেতে ত্রিভুবন ময়॥
তাই বলি শশধর, আমার বচন ধর,
যাও সেই মোহিনীর কাছে।
যার তরে আশা পথে, আরোহিয়া মনোরথে,
আগে মোর পরাণ গিয়াছে॥

পয়ার।

কিন্তু কি হেরি তোর, হৃদয় মাঝায়।
কিরে সে কালীর রেখা, লেখা দেখা যায়॥
বুঝি মম মনোরমা, ভাবিয়া আমায়।
আসিবার কথা লিখে, দেছে তোর গায়॥

নারে আর কেন মজি, মিছার স্বপনে।
জানি ভাল ভাবে না সে, অনুগত জনে ॥

ত্রিপদী।

বুঝি মোর দুখে দুখী, নাহি দেখি বিধুমুখী,
বুঝি চাঁদ করেছ রোদন।
হৃদয়েরি রেখা চয়, আঁখি ধারা চিহ্ন রয়,
ও যে নহে কলঙ্ক কখন ॥
বুঝি তারি দেখা তরে, আকাশ রোদন করে,
তারারূপ সহস্র নয়নে।
নীহার নয়ন ধারা, ফেলিছে যতেক তারা,
শত শত বিন্দু বরিষণে ॥
তাই বলি নিশাপতি, রতনে যতনে অতি,
ঝটিতি করহে দরশন।
এই ভাষা কহ গিয়ে, আশা বিনে ফাটে হিয়ে,
তার লাগি মলো একজন ॥

পয়ার।

শশি হে বসিয়ে আর, বিলম্ব না কর।
এমন অচল কেন, রও শশধর ॥

বুঝেছি বুঝি হে তব, যেই ভাব মনে।
যে কারণে যেতে নারো, নারী নিকেতনে॥
মোহিণীর মুখরূপ, করি দরশন।
কত লাজ কত জ্বালা, পেয়েছ তখন॥
তত আর নাহি দুখ, তার অদর্শনে।
সুখেতে আকাশ মাঝে, প্রকাশ আপনে॥
সাধেতে সাধিতে বাদ, আপনার প্রতি।
যাবে না যামিনী নাথ, যথায় যুবতী॥
ইহা যদি নিশানাথ, না মান আপনি।
আদি অন্ত জানি আমি বলিব এখনি॥

চৌপদী।

ললনা লপনে লাজ, পেয়ে মানে দ্বিজরাজ,
লুকালে মেঘের মাঝ, ঘোমটা ধরিয়া রে।
এই কথা মূঢ়ে কয়, তাই অমানিশা হয়,
কেহ কহে তাহা নয়, গিয়াছে মরিয়া রে॥
মহিলার মুখাকারে, অভিমানে আপনারে,
একেবারে নাশিবারে, গমন করিয়া রে।

মহেশ ললাট স্থলে, ধিকি ধিকি বহ্নি জ্বলে,
ঝাঁপ দিলে সে অনলে, পরাণ হরিয়া রে॥
বিমল বারিধি জলে, ডুবেছিলে কেহ বলে,
মূঢ়ে বলে বারি তলে, ছায়া সে পড়িয়া রে।
ভয় এই পাছে তায়, কামিনী তথায় যায়,
ছিলে কম্পমান কায়, সলিলে লড়িয়া রে॥
পরেতে জানিয়া ভাল, করিছে বিরহ কাল,
কামিনী বদন কাল, তাই ফিরে আইলে।
ফিরে এলে সিন্ধু হতে, বলে নর শতে শতে,
যে তুমি এমনি মতে, সমুদ্রে জন্মাইলে॥
বিধুমুখ মহিলার, দেখ নাহি ফিরেবার,
নাহি দেখি শোভা তার, আজো না পলাইলে।
যেতে বলি যতবার, তত কর অস্বীকার,
বুঝেছি কারণ তার, জ্বালা পাবে যাইলে॥

পয়ার।

নাহি ডর শশধর, ধর হে বচন।
চরণে শরণ তার, করিও গ্রহণ॥

প্রমদার পদতলে, পড়ি নিরন্তর।
তোমার সদৃশ আছে দশ শশধর॥
বিশেষত পদে যদি, না পড় প্রথমে।
মুখের সম্মুখে কথা, কহ যদি ভ্রমে॥
তখনি ঘটিবে কুহূ, যেন নিশাকর।
ললনা ললাটে আছে সিন্দূর ভাস্কর॥

ত্রিপদী।

তাহে যদি বল তবে, কেন দিন-পতি রবে,
ললনার ললাট উপর।
প্রেয়সীর পদদ্বয়, সদা কিবা শোভা হয়,
যুগল কমল মনোহর॥
নখর নিকর তায়, শশি সম শোভা পায়,
কমলের কোলে শশধর।
ক্রোধে রক্ত দিবা-পতি, জানিল অসতী অতি,
পদরূপা নলিনী নিকর॥
ঠেকে শিখে নারীরীতে, আর পদ্ম আঙ্গুলিতে,
বদন কমল কামিনীর।

সিন্দুর বিন্দুর রূপ, নারী মুখে অপরূপ,
দিনেশ বসিল হ'য়ে স্থির ॥
যদি বল কি প্রকারে, চিনিবে তুমি হে তারে,
দেখ নাই আগেতো সে জনে।
জান যদি আপনার, কুমুদিনী প্রেমাধার,
তারে তবে চিনিবে নয়নে ॥

চৌপদী।

যাও যাও সুধাকর, কেন হে বিলম্ব কর,
একবার শশধর, যাও যাও যাও রে।
প্রাণের প্রেয়সী পাশে, বল গিয়ে যদি আসে,
ধরিব পরাণ আশে, বধিও না তাও রে ॥
নহে রহ এই স্থলে, অহরহ কোন ছলে,
যেও না হে অস্তাচলে, এই ভিক্ষা দাও রে।
মোহিনীর মুখ তোরে, জ্ঞান করি প্রেম ডোরে,
বাঁধিয়া বাঁচাব মোরে, যেওনা কোথাও রে ॥
মনে হয় সে রজনী, যখন রমণী মণি,
অধরে অধরে ধনী, ধরিল আমায় রে।

সে কি এই নদী তীরে, এই সে নিকুঞ্জ কিরে,
তোরি করে কলঙ্কী রে, দেখেছি কি তায় রে॥
হা নিকুঞ্জ মনোহর, হা মধুর শশধর,
হে তটিনী স্থিরতর, ধরি সবে পায় রে।
ফিরে দেখা একবার, মোহিনী মধুরাকার,
একবার দেখা আর, হৃদি ফেটে যায় রে।
ফিরে দরশন করি, তটিনীর তটোপরি,
চম্পকের শাখা ধরি, আমা পানে চায় রে।
কি শুনি কি শুনি মরি, মোহন স্বরেতে করি,
কেরে মোর নাম ধরি, ডাকিল কোথায় রে॥
বুঝি মোর প্রাণেশ্বরী, এহো অনুগতে স্মরি,
রাখি গে হৃদয়োপরি, আঁখি আঁখি করি রে।
নারে মিছে কেন আর, স্বপ্ন দেখে বারে বার,
মজি সুখে মিছে কার, যাতনায় মরি রে॥
নাহিক কপাল তার, প্রাণেশ্বরী পাইবার,
এত আশা অভাগার, সম্বরি সম্বরি রে।
যত সুখ আশা আর, সব করি পরিহার,
শেষ আসা আশা সার, তা কিসে পাসরি রে॥

যদিও জানিরে মনে, পাইব না প্রিয়জনে,
গোপনেতে প্রাণ পণে, তবু আশা ধরি রে।
যদ্যপি স্বপ্নে বা ভ্রমে, ছায়া সুখে কোন ক্রমে,
পাই যদি প্রিয়তমে, হৃদয় ভিতরি রে॥
দারুণ বিধির বিধি, চেতনে হরিল নিধি,
জ্বালা জ্বালাইল বিধি, মরি মরি মরি রে।
কিন্তু আশা পাছে পাছে, তাই চাঁদ তোর কাছে,
যেতে বলি যথা আছে, আমার সুন্দরী রে॥

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে কিরূপ গদ্য রচনা করিতেন তাহা জানিতে লোকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। আমি নিম্নে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্প সঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহঃরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অম্বুবিম্বূপম জীবনে চন্দ্রার্ক সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না, যে সে সব

উৎসব শব হইলে কি হইবে এবং পরমনিধি প্রিয় পিতা পরাৎপরের প্রতি প্রীতি প্রভাবের অভাব করে, বিবেচনা করে না যে তাঁহার সমীপে উত্তরকালে কি উত্তর করিবে। কদাপিও মূঢ় মানবমণ্ডলী মনোমধ্যে মুহূর্ত্তেকও বিবেচনা করে না যে তাহার কি অনিত্য পদার্থ প্রযত্ন পুরঃসর প্রতিপালন করিতেছে। এখন যে দেহ ধূলিকণা পতনে পাষাণ প্রহার প্রায় বোধ হয়, আশু সেই দেহ শ্বসমূহের করাল পদাঘাতে বিদীর্ণ হইবেক। এখন যাহার রাজীব রাজী বিরাজিত শয্যাতেও নিদ্রা হয় না, জীবনান্তে সে ধূলি কর্দ্দম অস্থিকণাকীর্ণ লক্ষ লক্ষ রক্ষো, যক্ষ, ভূত প্রেতাদির বাসস্থান শ্মশানে চিরনিদ্রিত হইবেক। এবং যে অঙ্গ কোমল কমল স্পর্শনে বিশীর্ণ হয় সে অঙ্গে গৃধিনী চঞ্চু আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিবেক। যে লপনেন্দু শত শত শশধর সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে, সে বদন কর্দ্দম মণ্ডিত হওত মৃন্মণ্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অম্বুরেণু অসি অনুমান হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক। যে রসনা প্রমদাধর রসনা পান করিয়া অন্য রস পান করে না, সে

ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্র ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক। যে নাসিকা স্থলে চন্দনও কদনা পায় না, সে নাসিকা দুর্গন্ধ কীটাদি এবং গলিত শব মাংসের ঘ্রাণ গ্রহণে বাধ্য হইবেক, যে শ্রবণ কামিনী কাকলী শ্রবণে সন্তোষ প্রাপ্ত হয় না, সে শ্রবণ শিবাগণের চীৎকার শ্রবণ করণে বাধ্য হইবেক, দিবাকর কর প্রকাশে মধুকর নিকর যে করে কমলিনী ভ্রমে মকরন্দ লোভে ভ্রমিত সে কর কদর্য্য কীট নিকরে ব্যপ্ত হইবেক। যে পদ কখন বিপদ গ্রস্থ হয় নাই, এবং যে পদ কখন সম্পদ সংরক্ষণে ও ধুলি সহ সাক্ষাৎ করে নাই, সে পদ স্বপদ পরিত্যাগ পুরঃসর ধুলি হইয়া যাইবেক। ধরাবাসিদিগের এই ধারা দর্শনে অশ্রুধারা ধারে ধারে ধারণ হয়, অতএব হে মানবগণ অনিত্য যত্নে ক্ষান্ত হও।"

এই রচনার নিম্নে প্রভাকর-সম্পাদক একটু টীকা কাটিলেন। তিনি লিখিলেন,—

"ইঁহার লিপি নৈপুণ্য জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন এবং অক্ষর গুলীন্ স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।"

কবির লড়াই

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় বাঙ্গালায় কবি, হাফ্ আখ্ড়াই ও পাঁচালীর বড়ই প্রাধান্য। রাম বসু, হরুঠাকুর, ভোলানাথ, যজ্ঞেশ্বরী, কৃষ্ণকমল তখন লোকান্তরে গমন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তি লুপ্ত হয় নাই; দাশরথি রায়ও তখন জীবিত। দাঁড়-কবিরা একদিন বাঙ্গালা মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাব, তখনকার কবিদিগের রচনার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাগুলি এতদ্বিষয়ে জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তিনিও ছড়া ও গান বাঁধিতেন। এক পক্ষ, অপর পক্ষকে গালি দিয়া জয়ী হইবার চেষ্টা করিত। দীনবন্ধু বাবু, দ্বারকানাথ অধিকারী ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও এইরূপ কবির লড়াই চলিত। আমি নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এ যুদ্ধে যোগদান করিতেন না। তবু দ্বারকানাথ তাঁহাকে চট্টো কবি বলিয়া

গালি দিতে ছাড়েন নাই ; দীনবন্ধু বাবুকে সহুরে কবি নাম দিয়া পাঁচালী সাজাইয়াছেন। দীনবন্ধু বাবু পাল্টা গাহিয়া দ্বারকানাথকে বুনো-কবি নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

দ্বারকানাথ লিখিলেন ;—

পয়ার।

শহুরে কবি।

আমার কশুর কিছু নাই গতবারে।
কথায় কথায় কটু কহিয়াছি তারে॥
সে যদি মানুষ হয় জ্ঞান থাকে তার,
আমার সহিত রণ করিত না আর॥

চট্টো।

তাই তাই তাই বটে, অতি সুখ ময়।
এমন কবিতা আর হইবার নয়॥
ভাগ্যে তুমি বেঁচে আছ, তাই ভাই মোরা।
কবিতা দেখিতে পাই মুর্খ মন চোরা॥
কিন্তু কবিবর আমি, তার ঠাঁই ঠাঁই।
তব মনোগত কটু, ভাব বুঝি নাই॥

কৃপা করি কহ স্বীয়, সরল স্বভাবে।
"শাখায় কুরঙ্গ" তুমি বলেছ কি ভাবে॥

শহুরে।

হা হা ভাই বুঝিতে পারনি, এই গাল।
এর ভাব ঠিক যেন পাড়াগেঁয়ে ডাল॥
শাখায় কুরঙ্গ আমি, এভাবে লোয়েছি।
কৌশল করিয়া মিত্র, বানর বোলেছি॥
আর এক ঠাঁই দেখ, করি অনুমান।
কহিয়াছি তারে আমি, বীর হনুমান॥
বুক চিরে রাম লিখে, কে বেঁধেছে ঋণে।
রামচন্দ্র, দীনবন্ধু, হনুমান বিনে॥

চট্টো।

জান কেন অধিকারী, কবিতা মাঝারে।
মোরে আদি কবি বলে, দ্বিতীয় তোমারে॥

* * *

তোমার সহিত কভু, না পারিবে বুনো।
তার চেয়ে তুমি ভাই বুদ্ধি ধর দুনো॥

* * *

শহুরে।

বুনোরে যদ্যপি আমি বলি কুবচন।
তাহাতে ঈশ্বর রুষ্ট হবে না কখন॥
কারণ ভূলোক মাঝে ইহা জানে কে না।
ঈশ্বর আমার কাছে চিরকাল কেনা॥

তার পর দ্বারকানাথ কবিতা ছাড়িয়া গদ্যে ধরিলেন, "হে মিত্র, বারম্বার এরূপ চিত্র করিয়া আর স্বীয় কালেজের সুখ্যাতি বিস্তার করিবেন না।" ইত্যাদি।

কিছু দিন বাদে কবিবর দীনবন্ধু উত্তর করিলেন, "আমাদিগের বুনো কবিটি * * * চপল। দ্বারিক বাবু, আর একটি অনুরোধ, এই শ্লোকটি পড়িবেন,—

দিব্যং চূত ফলং প্রাপ্য ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দম পানীয়ং ভেকো মক মকায়তে॥

* * *

বুনো কবির গালাগালি মনে না করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলাম, কারণ গালাগালির সহিত উপদেশ থাকিলে উপদেশের মহত্ত্ব যায় না, নীচ

লোকে যদি মুদ্রা দান করে তবে কি মুদ্রার মূল্য কম হয়? নারিকেলের মালাস্থ অমৃত পান করিলেও অমর হওয়া যায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহার গালাগালির উত্তর না দিয়া তাঁহার সদুপদেশ অবলম্বন করিলাম, কারণ তাঁহার মন্দ কথায় রাগান্ধ হইয়া যদ্যপি সৎকথা না শুনি তবে shakespeare আমাকে বলিবেন,—"you are one of those that will not serve God if the devil bid you."

১২৫৯ সালের ২রা চৈত্রের প্রভাকরে বিঘোষিত হইল,—"হিন্দুকালেজের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুত দীনবন্ধু মিত্র, হুগলি কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র শ্রীযুত দ্বারকানাথ অধিকারী এই ছাত্র ত্রয়ের বিরচিত গদ্য পদ্য পরিপূরিত তিনটি প্রবন্ধ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এই সকল রচনার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ও সংশোধন না করিয়া অবিকল প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমারদিগের সহযোগীগণ এবং গুণগ্রাহক গ্রাহকগণ বিশেষাভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া যাঁহার রচনা যে রূপে ও যে ভাবে উৎকৃষ্ট বোধ হইবেক, তাঁহাকে সেইরূপে সেই ভাবে পুরস্কৃত করিবেন। আমরা এ বিষয়ে অগ্রে কোন কথাই উল্লেখ করিব না।"

প্রথমে দীনবন্ধু বাবুর "দম্পতি প্রণয়" নামে এক দীর্ঘ কবিতা প্রভাকরে মুদ্রিত হইল। তারপর দ্বারকানাথের গদ্য কাব্য সত্যবতীর সহিত পাপিণীর বিবাদ প্রকাশিত হইল। সর্ব্বশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশিত হইল। এ যুদ্ধে, এ পরীক্ষায় দ্বারকানাথকে শ্রেষ্ঠ আসন ও পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল।

হায়, সে দ্বারকানাথ আর নাই। যৌবন ফুটিবার পূর্ব্বেই চন্দ্রশেখর বা লীলাবতী-তুল্য পুস্তক লিখিবার পূর্ব্বেই তিনি সহযোগীদের ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ বৎসর।

উপরে যে সকল কাব্যের পরিচয় দিয়াছি, তাহার ভূরিভাগ বঙ্কিমচন্দ্রের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত হইয়াছে; ষোড়শ বৎসরেও কিছু হইয়াছে। কোন কোন ভাব ঋতুসংহার হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; তবু বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত কাব্যনিচয়ে যে কবিত্ব, যে ভাবের সৌন্দর্য্য স্থানে স্থানে দেখাইয়াছেন, তাহা পঞ্চদশ বৎসর বয়সে কয়জন লোক পারিয়াছেন?

আর এক কথা। উপরের কবিতাগুলির ভাব প্রণিধান করিতে না পারিলে কাহারও তাহা ভাল লাগিবে না। কবিতাগুলি বালকের রচিত বটে, কিন্তু সে বালক বঙ্কিমচন্দ্র। কাব্যাংশের ভাব গভীর ও সুন্দর, বাক্যার্থ কঠিন ও জটিল। নিম্নে একটা দৃষ্টান্ত দিলাম। প্রথম কবিতার প্রথম চরণে আছে—

হইয়াছে জল, বড়ই শীতল,
ছুঁইলে বিকল হইতে হয়।
আগে যে জীবন, জুড়াত জীবন,
সে বন এখন নাহিক সয়॥

এখন জীবন ও বন অর্থে জল। এ অর্থ না জানিলে ভাব হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই তরুণবয়স্ক কবি সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"বঙ্কিমচন্দ্রের বিরচিত কবিতার সুবঙ্কিম ভাব কৌশল সকল অতিশয় সন্তোষজনক, ইনি রূপক বর্ণনা স্থলে নায়ক নায়িকার কথোপকথন ছলে যে সমস্ত প্রগাঢ় ভাব ব্যক্ত করেন তদ্দৃষ্টে সুপণ্ডিত ভাবুক মাত্রেই প্রীত হইয়া থাকেন। ইনি অতি তরুণ বয়সে অতি প্রবীণ সুরসিক জনের ন্যায় মন হইতে অতি আশ্চর্য্য নূতন নূতন ভাব সকল উদ্ভূত করিতেছেন। এ অংশে ইঁহার প্রশংসা বর্ণনে বর্ণাবলী বলহীনা, ফলে এই স্থলে একটি অনুরোধ এই যে, *বঙ্কিম পদরচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা*

যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাব গুলীন্ প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিম ভাষা ব্যবহার না করেন, যত ললিত শব্দে পদ বিন্যাস করিতে পারিবেন ততই উত্তম হইবেক।"

আমার ধারণা, এই সকল কবিতা রচনার পর 'মানস' ও 'ললিতা' লিখিত হয়। যদি তাই হয়, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের তখন অন্যূন ষোড়শ বৎসর বয়স। উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল অপ্রকাশিত কাব্যনিচয় উদ্ধৃত করিয়াছি, তদপেক্ষা মানস ও ললিতা কোন কোন ব্যক্তির মতে উৎকৃষ্টতর হইতে পারে, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই উভয় কাব্য বঙ্কিম-চন্দ্রের অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সংশোধিত অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ললিতা সম্বন্ধে একটা গল্প শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে একদিন "সন্ধ্যার সময় খালের ধার হইতে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ বহিয়া গৃহে ফিরিতে-ছিলেন। তখন আকাশ নিবিড় মেঘে সমাচ্ছন্ন। গৃহে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ঝড় উঠিল। ঝড়ের বর্ণনা ললিতা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।—

গভীর জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাঁদ,
থেকে থেকে উচ্চতর স্বনে।
পবন করিছে জোর, যেন সাগরের সোর,
হুঙ্কারে গরজে প্রাণপণে॥
বারেক চঞ্চলাভায়, দেখি নীল মেঘ গায়,
কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্তবন।
পাতা উড়ে ঢাকে ঘনে, পড়িতেছে ঘোর স্বনে,
বড় বড় মহীরুহগণ॥

এই স্তব্ধ বনে অন্ধকারে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। ঝড় বৃষ্টির ভয় নয়,—ভূতের ভয়। তেইশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রকে কাঁথিতে ভূতের অনুসরণ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু একটু ভীত হইতেও দেখিয়াছি। এই ভয় বাল্যকালে কিছু বেশী থাকাই সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র এই জনশূন্য দুর্গম পথে যাইতে যাইতে প্রকৃতির যে ভাব চারিদিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ ললিতায় অঙ্কিত করিয়াছেন। ললিতা কাব্যটিকে বঙ্কিমচন্দ্র ভৌতিক গল্প বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অন্ধকারাবৃত

নির্জ্জন পথে ভৌতিক বিভীষিকা মনোমধ্যে সঞ্জাত হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু পাত্রবিশেষে কার্য্য কারণের ফল ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কত জীবহত্যা হইয়া আসিতেছে, জীবহত্যা দর্শনে কত লোকের হৃদয় কাঁদিয়া আসিতেছে; কিন্তু কয়জনের শোকোচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে গুরুগম্ভীর রবে ধ্বনিত হইয়াছে;—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্ব সগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।"

পৃথিবীর আবহমান কাল হইতে কত আপেল, কত আম্র প্রভৃতি ফল বৃক্ষদেহ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু কয়জন লোক Law of Motion হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন? বিভীষিকায় অনেকেরই হৃদয় বিচলিত হয়, কিন্তু কয়জনের ভয়কম্পিত চিত্ত হইতে ললিতার সৃষ্টি হয়? অনেকেই কাপালিক সন্দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কয়জন কপালকুণ্ডলা লিখিয়াছেন? (কাহিনী ২০ পৃষ্ঠা)

ললিতায় স্থানে স্থানে বিদেশী ভাব দেখা যায়।

মানসে তা' নাই; আছে শুধু, সুপ্ত প্রতিভার অস্ফুট গর্জ্জন। অপ্রকাশিত কাব্যগুলি খাঁটি দেশী,—সৌন্দর্য্যময়, ভাবপূর্ণ। কিন্তু ভাষার জন্য, শব্দের জন্য বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে আকুলি বিকুলি করিতে হইয়াছে। ভাবের সঙ্গে ভাষা পদক্ষেপ করিয়া যাইতে পারে নাই।

আর এক কথা; বঙ্কিমচন্দ্র, স্বভাব-কবি ঈশ্বরগুপ্তের নিকট কবিতা লিখিতে শিখিয়াও কখন তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য-শিষ্য ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকাল হইতে একা দূরে বসিয়া, কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ না করিয়া কাব্য ও উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

হুগলি কালেজে শেষ কয়েক বৎসর।

বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কালেজে একজন দেশ-বিশ্রুত শিক্ষকের সাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। আমি যশস্বী ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা বলিতেছি। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হুগলি কালেজের হেডমাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার সহোদর ভ্রাতা মহেশচন্দ্র কলিকাতা হিন্দু কালেজে শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা—ঈশান ও মহেশ—বহু পূর্ব্বে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যশ, কীর্ত্তি আজও অন্তর্হিত হয় নাই। তাঁহারা দুই ভাই দুই কালেজে থাকিয়া যে দুই জন মহাপণ্ডিত গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে চিরকাল পরিগণিত হইবে।

ঈশান বাবুর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি সাহিত্য শিখিয়াছিলেন। সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন, ভট্টপল্লী নিবাসী কোন পণ্ডিতের নিকট। চারি বৎসর ধরিয়া— ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য পড়িয়াছিলেন। চারি বৎসরে দশ বৎসরের পাঠ শেষ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে ষোড়শ বৎসর বয়সের পর হইতে প্রভাকরে পদ্য বা প্রবন্ধ লিখিতে দেখি নাই। আমি শুনিয়াছি, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রকে একদিন বলিয়াছিলেন, "তোমার লিখিবার শক্তি যথেষ্ট আছে, কিন্তু তুমি পদ্য না লিখিয়া গদ্য লিখিবে।"

এ উপদেশ কোন্ সময়ে দিয়াছিলেন তাহা আমি অবগত নহি। যে সময়েই দিয়া থাকুন, বঙ্কিমচন্দ্র এ উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। ইহা অনেকেই বিদিত আছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিন গুপ্ত-কবির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। কিন্তু ইহা অনেকে জানেন না, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে কাঁচরাপাড়ায় তাঁহার গৃহ একবার জন্মের মতন

দেখিতে গিয়াছিলেন; সেখানে গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয়স্বজনের নিকট বসিয়া কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এতৎপূর্ব্বেও বঙ্কিমচন্দ্র, কবির সে আশ্রম দেখিতে—সে আশ্রমে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে একবার গিয়াছিলেন। তখন তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনী লিখিতেছিলেন। যিনি এমন করিয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে পারেন—এমন করিয়া শ্রদ্ধা দেখাইতে পারেন, তিনি কত উচ্চে অধিষ্ঠিত।

এবার আমি একটি ক্ষুদ্র গল্প বলিব।—'মিউটিনি' সময়ের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও শেষ পরীক্ষা দিয়া হুগলি কালেজ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার বয়স তখন ঊনবিংশতি বর্ষ মাত্র।

সে সময় সমগ্র ভারতবর্ষ অশান্ত। বিদ্রোহ-বহ্নি, ব্যারাকপুর ও বহরমপুরে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মাদ্রাস ও অযোধ্যা সমিধ্ সংগ্রহ করিতেছে; দিল্লী মশাল জ্বালিতেছে; কানপুর চাপাটি পাঠাইয়া শিশু ও রমণীর জন্য চিতা সজ্জিত করিতেছে।

বাঙ্গালী আগুন জ্বালাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে—দূরে

দাঁড়াইয়া পশ্চিম আকাশের গায় লাল চিত্র নিরীক্ষণ করিতেছে। মোগল আশা-উৎফুল্ল—মহারাষ্ট্র প্রতিহিংসাপরায়ণ—বাঙ্গালী দর্শক।

বাঙ্গালী দর্শক, বাঙ্গালী আবার পথপ্রদর্শক; বাঙ্গালী সকল বিষয়ে অগ্রণী। বাঙ্গালীই ইংরাজের প্রথম দেওয়ান—বাঙ্গালীই ইংরাজের ফাঁসিকাষ্ঠে সকলের আগে ঝুলিয়াছে—বাঙ্গালীই সর্ব্বাগ্রে খ্রীষ্টান হইয়াছে—বাঙ্গালীই সকলের আগে বিলাত গিয়াছে। বাঙ্গালী ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আগুন প্রধূমিত করিয়াছে—বাঙ্গালী ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহবহ্নি জ্বালাইয়াছে—আবার ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের 'বয়কট' অনলেও ফুৎকার দিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, ভাল বা মন্দ সকল কার্য্যেই বাঙ্গালী পথপ্রদর্শক।

যখন সিপাহী-বিদ্রোহ চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিল, তখন চুঁচুড়ায় Martial Law জারি হইল। চুঁচূড়ায় সে সময় একদল হাইল্যাণ্ডার সেনা থাকিত। এক্ষণে আর সেনা থাকে না, কিন্তু যে বৃহৎ অট্টালিকায় তাহারা বাস করিত, সে অট্টালিকা আজও আছে।

এক্ষণে তাহা আদালত ও আফিসের কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই গোরানিবাসের নিম্নে গঙ্গা। তথায় একটি ঘাটও আছে; তাহাকে ব্যারাকের ঘাট বলে।

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্রকে লইয়া এই ঘাটে আসিয়া নামিলেন। উদ্দেশ্য,—থিয়েটার দর্শন। চুঁচুড়ার জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি একটি থিয়েটারের দল সংগঠিত করিয়াছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রকে এই দলে যোগ দিবার জন্য তিনি অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কিছুতেই সম্মত হ'ন নাই। অবশেষে সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি, বঙ্কিমচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া কাঁটালপাড়ার অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ যুবা, কেহ প্রৌঢ়, কেহ বা বৃদ্ধ; কিন্তু সকলেই ভদ্র ও শিক্ষিত।

বঙ্কিমচন্দ্র একখানি স্বতন্ত্র নৌকায় ছোটভাইকে লইয়া আসিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ৩।৪ বৎসরের ছোট। ব্যারাকের ঘাট হইতে ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটী নিকট নহে; ঘণ্টা ঘাট হইতে নিকট।

বঙ্কিমচন্দ্র ব্যারাকের ঘাটে নামিলেন; কাঁটালপাড়ার অন্যান্য ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র নৌকায় আসিয়া ঘণ্টা ঘাটে নামিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য একটু ভ্রমণ। রাস্তা, গঙ্গার ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সুরম্য পথ অবলম্বন করিলেন। রাস্তার ধারে—গঙ্গার দিকে বাঁশের রেলিং; মাঝে মাঝে থাম। বঙ্কিমচন্দ্র এই পথ বহিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমভিব্যাহারে চলিয়াছেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে তিনি দেখিলেন, কয়েকজন ইংরাজ সৈনিক-কর্ম্মচারী পথের ধারে ঘাসের উপর বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে দুই একটা কুকুরও ছিল। একটা কুকুর, পূজনীয় পূর্ণচন্দ্রের পিছনে লাগিল। আমরা দেখিতে পাই, সংসারে আমরা যে জিনিষটাকে বা যে মানুষটাকে যত ভয় করি, সে জিনিষটা বা মানুষটা আমাদের তত চাপিয়া ধরে। কুকুরকে দেখিয়া পূর্ণ বাবু ভীত হইয়া পড়িলেন, তাঁহাকে ভীত দেখিয়া কুকুর ও ভয় উভয়ই আরও চাপিয়া ধরিল।

কুকুরের প্রভু নিকটেই ছিলেন। তিনি দেখিলেন, রহস্য মন্দ নয়। তিনি তাঁহার চতুষ্পদ জীবটিকে আরও উৎসাহিত করিবার মানসে নানাবিধ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিলেন ; কুকুর প্রোৎসাহিত হইয়া পূর্ণবাবুর সমীপস্থ হইল। তিনি তখন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া একটা থামের উপর লাফাইয়া উঠিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে কিছু লক্ষ্য করেন নাই, তিনি সাহেবদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া গঙ্গা পানে চাহিয়াছিলেন। যখন লক্ষ্য করিলেন, তখন পূর্ণ বাবু থামের উপর, কুকুর লম্ফোদ্যত। ক্রোধে বঙ্কিমচন্দ্রের বদনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি সাহেবদের লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে বলিলেন "Fine sport indeed ! Don't you feel ashamed ?"

বঙ্কিমচন্দ্র এত তেজের সহিত এমন সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন যে, সাহেবরা লজ্জিত হইয়া কুকুরকে অবিলম্বে ডাকিয়া লইয়াছিলেন।

থিয়েটার ভাঙ্গিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। কাঁটালপাড়া হইতে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা

সকলে দল বাঁধিয়া একত্র ফিরিতেছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রও সে দলে ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, চুঁচুড়ায় Martial Law জারি হইয়াছিল। এই সামরিক বিধান অনুসারে, চুঁচুড়ার সীমা মধ্যে রাত্রি নয়টার পর কেহ পথে বহির্গত হইলে প্রহরী তাহাকে গুলি করিয়া নিহত করিতে পারিত। ঘণ্টা ঘাটের উপর দুইজন প্রহরী ছিল। কাঁটালপাড়ার দল ঘণ্টা ঘাটের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র একজন গোরা অন্ধকারের ভিতর হইতে অগ্রসর হইয়া জনৈক অগ্রগামী ভদ্রলোকের বুকের উপর সঙ্গীন স্থাপন করিল। নিরীহ ভদ্র-লোকেরা আনন্দ সহকারে থিয়েটারের গল্প করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছিলেন, সম্মুখে এই বিপদ! বঙ্কিমচন্দ্র একটু পিছাইয়া ছিলেন। সকলে থামিল দেখিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, একজন গোরা বন্দুকহস্তে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে—অপর প্রহরী অগ্রগামী ভদ্রব্যক্তির বুকের উপর সঙ্গীন স্থাপন করিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে তখন সামরিক বিধানের কথা উদয় হইল। তিনি

বুঝিলেন, এই বিধান অনুসারে প্রহরী তাঁহাদের সকলকে নিহত করিতে সমর্থ। বঙ্কিমচন্দ্র, কম্পিত-কলেবর ভদ্রলোকটিকে সরাইয়া দিয়া নিজে সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, ও সংযত ভাষায় তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহারা গঙ্গার অপর পার হইতে থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। গোরা বলিল, "How am I to know that ?" বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "You may ask the District Magistrate. He was present." গোরা বলিল, "I believe you. Take yourselves off at once."

সাহেবরা পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল ; কম্পান্বিত-কলেবর ভদ্রলোকেরা ঝড়বেগে গঙ্গার দিকে ধাবিত হইলেন। ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, মহাবিপদ !—সেখানে নৌকা নাই। সাহেবেরা Take yourselves off বলিয়া খালাস ; কিন্তু ভদ্রলোকেরা যান কিরূপে ? সাঁতার কাটিয়া না গেলে ত উপায় নাই। ডাঙ্গায় সাহেবের ভয়, জলে কুমীরের ভয়। কেহ কেহ জলটাকে অধিকতর নিরাপদ মনে করিয়া কাপড় গুটাইতে লাগিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের নিরস্ত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কালেজের ঘাটে লইয়া গেলেন। সেখান হইতে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, সম্মুখস্থ চড়ায় দুইখানা নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। চীৎকার করিয়া মাঝিদের ডাকিতে কাহারও সাহস হইল না। বঙ্কিমচন্দ্র ডাকি-লেন। তাহারা আসিল, এবং ভীত, ক্লান্ত ভদ্রলোকদের লইয়া অপর পারে প্রস্থান করিল।

বঙ্কিমচন্দ্র, বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি ডিপুটি কালেক্টর। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাই তিনি সি, আই, ই। বাঙ্গালার মাটির দোষ। তা'হউক, বঙ্কিমচন্দ্র যেন এই দূষিত মাটিতেই শতাব্দীতে শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্সি-কালেজে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কালে-জের পাঠ সমাপ্তি করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। হুগলি কালেজে Senior scholarship পরীক্ষায় শীর্ষস্থান

অধিকার করায় বঙ্কিমচন্দ্র একটা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বৃত্তি কত টাকার তাহা জানি না। তিনি এই বৃত্তি লইয়া প্রেসিডেন্সি কালেজে আইন পড়িতে লাগিলেন।

যাদবচন্দ্র তখন চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাসা করিয়া কলিকাতায় থাকিতে হইল। তখন ইষ্টার্ণবেঙ্গল রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল পথ তিন বৎসর আগে খুলিয়াছে। কিন্তু হুগলি ঘুরিয়া কলিকাতায় প্রত্যহ যাতায়াত সুবিধাজনক নয়। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রকে মাতাপিতা ছাড়িয়া কলিকাতায় একা গিয়া থাকিতে হইল। সঙ্গে ভৃত্য ও পাচক; সঞ্জীবচন্দ্র মধ্যে মধ্যে গিয়া থাকিতেন।

তখন কলিকাতার অবস্থা ভয়ানক। বিদ্রোহানল চারিদিকে প্রজ্বলিত। 'ইংরাজের সিংহাসন প্রবল স্রোতোমুখে জীর্ণ তরীর ন্যায় কাঁপিতেছে। ইংরাজের শিশু ও রমণীরা, বাঙ্গালীর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা, ইংরাজের দুর্গ ও জাহাজে আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছে। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব আলিপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় পলাইয়া

আসিয়াছেন। গভর্ণর জেনারল ক্যানিং নেটিভ গার্ড তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার প্রাসাদ দুর্গে পরিণত করিয়াছেন। ভলন্টিয়ার-দল চারিদিকে সজ্জিত হইতেছে। কোম্পানির কাগজের দর অসম্ভাবিতরূপে নামিয়া গিয়াছে। কাজ কর্ম্ম বন্ধ। দস্যু তস্কর মাথা তুলিয়াছে। কলিকাতাবাসীরা ভীত, ত্রস্ত; যে যেখানে পারিতেছে পলাইতেছে।

এমনই দিনে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষার্থ আসিলেন। তিনি কিন্তু নির্ব্বিকার। বঙ্কিমচন্দ্র স্থির জানিতেন, ইংরাজদের কেহ তাড়াইতে পারিবে না,—মুসলমান ও হিন্দুরা দুই দিনের জন্য উপদ্রব করিতেছে মাত্র। তিনি ইংরাজি যেমন পড়িয়া যাইতেছিলেন তেমনই পড়িয়া যাইতে লাগিলেন; ইংরাজের ধর্ম্মাধিকরণে ওকালতি করিবার জন্য যেমন আইন শিক্ষা করিতেছিলেন, তেমনই শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার ব্যারিষ্টার-অধ্যাপক Montriou সাহেবকে কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "যদি এক দিনের জন্যও ভাবিতাম, তোমাদের রাজত্ব যাইবে,

তাহা হইলে তোমার আইন-পুস্তক গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতাম।”

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ শেষ হইতে না হইতে ইংরাজের বুদ্ধি ও শক্তি প্রভাবে অনল নির্ব্বাপিত-প্রায় হইল। যে জাতি মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া ক্ষিপ্ত-প্রায় কোটি কোটি মনুষ্যকে দমন করিতে পারে, সে জাতি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বিদ্রোহ দমন করিয়া ইংরাজ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বি, এ, পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিঘোষিত হইল যে, ৫ই এপ্রেল পরীক্ষা গৃহীত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র আইন ছাড়িয়া বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তখন পরীক্ষার দুই মাস মাত্র বিলম্ব। এত অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষোপযোগী পুস্তক পাঠ করিয়া প্রস্তুত হওয়া দুরূহ। অনেকে পিছাইয়া গেলেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ তেরজন পিছাইলেন না। তাঁহারা পরীক্ষা দিলেন। ইংরাজি সাহিত্য ও ইতিহাস পরীক্ষা

করিলেন, গ্রাপেল সাহেব ; সংস্কৃতের পরীক্ষা করিলেন, সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পরীক্ষায় দুইজন মাত্র উত্তীর্ণ হইলেন ; তাও আবার দ্বিতীয় বিভাগে। প্রথম স্থান গ্রহণ করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ; দ্বিতীয় হইলেন, বাবু যদুনাথ বসু।

বি, এ, পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইল, মে মাসের শেষ ভাগে। পরীক্ষার ফল দেখিয়া ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের কার্য্য গ্রহণ করিবে ?"

বঙ্কিমচন্দ্র। পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া উত্তর দিতে পারি না।

ছোটলাট। এতদপেক্ষা কি বড় চাকুরি তুমি প্রত্যাশা কর ?

বঙ্কিমচন্দ্র। যত বড় চাকুরি আপনি আমাকে দিন্ না কেন, পিতার অভিপ্রায় না বুঝিয়া আমি কোন কার্য্য গ্রহণ করিতে পারি না।

ছোটলাট, বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃভক্তি দর্শনে প্রীত হইলেন; বলিলেন, "ভাল, তোমায় আমি কিছু দিনের সময় দিলাম; তোমার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া সত্বর আমায় সংবাদ দিবে।"

চাকৃরি গ্রহণ করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বড় বেশী ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু পিতার আদেশে গ্রহণ করিতে হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৩এ আগষ্ট তারিখে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর দুই মাস।

বঙ্কিম-জীবনী।

দ্বিতীয় খণ্ড।
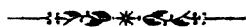
চাকুরি।

যশোহর ও নাগোয়া।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কর্ম্মস্থল যশোহর। যশোহরের পথ তখন দুর্গম। রেল নাই, নৌকা বা পাল্কীতে যাইতে হইত। সময়ও বড় অল্প লাগিত না, তিন দিন, চারি দিন পথে অতিবাহিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মাতা পিতা, আত্মীয় স্বজনদের ছাড়িয়া সুদূর যশোহর অভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আর একজনকে ছাড়িয়া গেলেন ; আমি তাঁহার রূপযৌবনশালিনী, সর্ব্বগুণময়ী সহধর্ম্মিণীর কথা বলিতেছি। তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণ ফাটিয়া গেল। ত'ার ঠিক এক বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র সেই দেব-দুর্ল্লভ স্ত্রীকে হারাইলেন।

যশোহরে দীনবন্ধু বাবুর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আলাপ। উভয় উভয়কে ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই।

কিন্তু পরস্পর পরস্পরের রচনা, প্রভাকর ও সাধুরঞ্জনে পড়িয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। এক্ষণে এক প্রতিভা, অপর প্রতিভার সহিত সাক্ষাৎ-আলাপে প্রবৃত্ত হইল; এক বিদ্যুৎ, অপর বিদ্যুতকে আলিঙ্গন করিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নাগোয়াতে বদলি হইয়া গেলেন। নাগোয়া মেদিনীপুর জেলায়। কাঁথির নাম অনেকেই অবগত আছেন। কাঁথির সন্নিকটেই নাগোয়া। পূর্ব্বে এইখানেই মহকুমা স্থাপিত ছিল; পরে স্থানটি অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হওয়ায়, মহকুমা কাঁথিতে উঠিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র নাগোয়া মহকুমার হাকিম হইয়া যে জেলায় তাঁহার 'হাতে খড়ি' হইয়াছিল, সেই জেলায় আসিলেন।

এই নাগোয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র, কাপালিক-দর্শন পাইয়াছিলেন। (কাহিনী ২০ পৃষ্ঠা)। এখান হইতে সমুদ্র বেশী দূর নয়। সময় পাইলে মধ্যে মধ্যে সমুদ্র দেখিতে যাইতেন। নাগোয়া হইতেও সমুদ্রের চীৎকার সময় সময় শুনা যাইত। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বিপত্নীক। নিস্তব্ধ

নিশীথে শয্যায় শুইয়া সমুদ্রের রোদনে তিনি আপন হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনিতেন। চপল সমুদ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিত, গম্ভীর বঙ্কিমচন্দ্র নীরবে কাঁদিতেন। সে নীরব রোদন, বঙ্কিমচন্দ্রের মাতাপিতা ছাড়া আর কেহ দেখিল না, বুঝিল না। তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। (কাহিনী ১২ পৃষ্ঠা)

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন রাজকার্য্যানুরোধে মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। স্থানীয় জমিদার, বঙ্কিমচন্দ্রের রাত্রি বাসের জন্য তাঁহার উদ্যান-বাটী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বঙ্কিমচন্দ্র শিবিকারোহণে উদ্যানগৃহে সমুপস্থিত হইলেন। আহারাদির উদ্যোগ হইতেছে; বঙ্কিমচন্দ্র একা একটি ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। এমন সময় সহসা সেই কক্ষে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকটির রূপ ও বয়সের কথা শুনি নাই; তবে সে শুভ্রবসনে সমাচ্ছাদিত ছিল, ইহা শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র,

এই স্ত্রীলোকটিকে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" স্ত্রীলোকটি কোন উত্তর করিল না। বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?" রমণী তথাপি নীরব। বঙ্কিমচন্দ্র উঠিলেন; এবং অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথার উত্তর দাও না কেন? তুমি মানুষ, না প্রেতিনী?"

বঙ্কিমচন্দ্রকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রমণী উন্মুক্ত দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হইল; এবং গৃহ ছাড়িয়া উদ্যানে আসিয়া দাঁড়াইল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার অনুসরণ করিলেন। উদ্যানে আসিয়া যখন তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেন, তখন দেখিলেন, রমণীর শুভ্রবসন ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, অবশেষে রমণী-মূর্ত্তি বায়ু-হিল্লোলে মিলাইয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষণকাল স্তম্ভিত চিত্তে তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরে গৃহমধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, "আমি এখনি এ স্থান ছাড়িয়া যাইব—পাল্কী প্রস্তুত কর গে।"

নাগোয়াতে বঙ্কিমচন্দ্র বেশী দিন ছিলেন না, কয়েক মাস থাকিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে খুলনাতে বদলি হইয়া গেলেন। কিন্তু বদলি হইবার পূর্ব্বে তাঁহার একশত টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল। চাকরিতে প্রবৃত্ত হইবার দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার পদোন্নতি হইল। এ সৌভাগ্য সকলের হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া খুলনায় চলিয়া গেলেন।

খুলনা।

খুলনা তখন যশোহরের অধীন একটি মহকুমা মাত্র; তখনও স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয় নাই। বেনব্রিজ সাহেব সে সময় যশোহর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। মিষ্টার বেন্‌ব্রিজের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এইখানে প্রথম আলাপ; এই আলাপ বহরমপুরে 'ডফিন' ঘটনার পর সখ্যয় পরিণত হয়। (কাহিনী ৪৬ পৃষ্ঠা)।

খুলনায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ঘোর অরাজকতার মধ্যে পড়িলেন। একদিকে নীলকরের অত্যাচার, অপরদিকে দস্যু তস্করের উপদ্রব। নীলকর সাহেবদের মন যোগাইতে যোগাইতে গভর্ণমেণ্ট হায়রাণ। নীলকরেরা আবার জমিদার। বড় ছোট খাট জমিদার নয়,—কৃষ্ণনগরের হিল্‌স্ সাহেবের তিন লক্ষ বিঘা জমি ছিল। এই সাহেবই, প্রজা ঈশ্বর ঘোষের নামে খাজনা বৃদ্ধির মকদ্দমা স্থাপন করিয়া Sir Barnes Peacock প্রমুখ হাইকোর্টের সমুদায় বিচারপতিদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিলেন।

হিল্‌স্ সাহেবকে লইয়া আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত নীলকরদের বিবাদ বুঝাইতে হইলে আমায় কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে হইবে। নীলকরদের প্রতাপ কতদূর ছিল, ইহা না বুঝিলে কেহ বুঝিতে পারিবেন না, তাহাদের অত্যাচার দমন করিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে কতটা বেগ পাইতে হইয়াছিল। আমি সে সময়কার কাগজ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দুই চারি কথায় বুঝাইতে প্রয়াস পাইব।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া লিখিলেন, "The planter—denied laws, courts and police—like Englishmen all over the world became a law into himself."

এই সকল জমিদার ও নীলকরেরা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুযোগ করিলেন যে, যশোহর ও নদীয়া জেলার প্রজারা তাঁহাদের খাজনা দিতেছে না, এবং যাহাতে দেয় তাহার উপায় করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট আর স্থির থাকিতে না পারিয়া মরিস্ ও মণ্ট্রেসারকে স্পেশাল কমিশনর নিযুক্ত করিয়া অনুসন্ধানার্থে পাঠাইলেন। কমিশনর সাহেবেরা অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন, নীলকর-জমিদার সাহেবেরা নিরীহ ভদ্রলোক, কখন কোন প্রজার গায় হাত তুলেন নাই, বা কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই; যত দোষ বাঙ্গালী প্রজার। তাহারা কিছুতেই খাজনা দেয় না।

এই সকল নিরীহ সাহেবদের মধ্যে মরেল নামধেয় একজন শান্ত শিষ্ট নীলকর জমিদার ছিলেন। তাঁহার

অখ্যাতি করিলে চলিবে না; কেন না, তাঁহার সুখ্যাতি গায়িতে গায়িতে তখনকার কাগজওয়ালাদের মুখ দিয়া লাল পড়িয়াছে; এবং তদানীন্তন ছোটলাট Sir J. P. Grant তাঁহার Indigo minutesএ মরেল সাহেবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—"He is a model settler and an example to all Indigo planters."

এই model settler ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক দাঙ্গা করিয়া বসিলেন। সে কথা পরে বলিতেছি; আগে মরেল সাহেবের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের একটু পরিচয় দিই। মরেল সাহেব একটা নগর বসাইয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন, "মরেল-গঞ্জ"। সাহেব এই নগরের রাজা। তাঁহার কিছু সৈন্যও ছিল। লাঠিয়ালের সংখ্যা বড় অল্প নয়,—পাঁচ সাত শত হইবে। লাঠিয়ালেরা যে শুধু লাঠি ঘাড়ে করিয়াই লড়াই করিত, তা নয়,—তাহাদের কাহারও কাহারও হাতে বন্দুক সড়্‌কি প্রভৃতি অস্ত্র থাকিত।

এই দলের কর্ত্তা বা ক্যাপ্টেন ছিলেন ডেনিস্‌ হিলি।

হিলি সাহেব পূর্ব্বে Yeomanry Cavalryতে ছিলেন। সেখানে নরহত্যা বা গৃহদাহের তেমন সুবিধা ছিল না; বেতনও সামান্য। হিলি সাহেবের ভাল লাগিল না; অথবা সে কাজ করিতে পারিলেন না। সে চাক্‌রি ছাড়িয়া দিয়া তিনি অবশেষে মরেল সাহেবের লাঠিয়াল-দলের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

মরেল সাহেবের অধিকাংশ সম্পত্তি যশোহর জেলার মধ্যে অবস্থিত। মরেলগঞ্জ, বঙ্কিমচন্দ্রের এলাকাভুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় আসিয়া দেখিলেন, মরেল সাহেবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ; তিনি আদর্শ প্ল্যাণ্টার রূপে দেশ শাসন করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় আসিয়া চার্জ্জ লইবার ঠিক এক বৎসর পরে মরেল সাহেব একটা দাঙ্গা করিয়া বসিলেন। তদ্‌সম্বন্ধে Friend of India কাগজ কি লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"In November 1861, an affray took place at surulia, a village in the sunderbuns between a Zamindar and a party belong-

ing to Mr. Morell, an enterprising landlord in the vicinity. Such affrays have been only too common, and Mr. Morell having applied in vain for the protection of the police, was obliged to protect himself. * * * This last affray was headed by a Mr Hely and by a native."

Friend of India অম্লান বদনে লিখিলেন, মরেল সাহেবকে পুলিশ রক্ষা করিল না, কাজেই তিনি আত্ম-রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। কিছুকাল পরে Friend of Indiaকেও সুর বদলাইতে হইয়াছিল। আমি কাগজ পত্রে যাহা দেখিয়াছি, তাহা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া নিম্নে বিবৃত করিলাম।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দ ২৬এ নভেম্বার তারিখে কয়েক খানা মানুষ বোঝাই নৌকা আসিয়া বড়খালি গ্রামের তটে আশে পাশে লাগিল। তখনও রজনী প্রভাত হয় নাই—অল্প অল্প অন্ধকার ঝোপে ঝাপে চারিদিকে লুকাইয়া রহিয়াছে। নৌকার লোকেরা নিঃশব্দে

উঠিয়া গ্রামখানি ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা সংখ্যায় বড় কম নহে,—প্রায় তিনশত হইবে। কাহারও হাতে লাঠি, কাহারও হাতে সড়কি, কাহারও হাতে বা বন্দুক। ইহারা সকলেই মরেল সাহেবের লাঠিয়াল। ডেনিস হিলি তাহাদের নেতা। হিলি, মরেল সাহেবের জমিদারির সুপারিণ্টেডেণ্ট; সুতরাং তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে জমিদারের হিতার্থে লাঠিয়াল লইয়া বিদ্রোহী-প্রজা দমন করিতে যাইতে হইত।

বড়খালির প্রজারা বড়ই দুরন্ত। তাহারা বৃদ্ধি খাজানা দিতে গোল করে, নীল চাষ করিতেও আপত্তি করে। কাজেই তাহাদের শাসন প্রয়োজন হইয়া উঠিল; কিন্তু মরেল সাহেব সহজে তাহাদের শাসন করিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রজারা সংখ্যায় অনেক, একতাসম্বন্ধ ও বলবান্।

বলবান হইলেও তাহাদের ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। তাহাদের এক মাঠ ধান বা এক গোলা চাল লুণ্ঠিত হইলে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত; সাহেবের দুই একটা লাঠিয়াল জখম হইলে, সে সংবাদ

সাহেবের কাণেও পৌঁছিত না। এইরূপে বহুকাল হইতে মরেল সাহেবের সঙ্গে বড়খালির প্রজাদের বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। সাহেব অবশেষে তাহাদের বিশেষরূপে শিক্ষা দিবার মানসে ১২ নৌকা লাঠিয়াল হিলি সাহেবের অধ্যক্ষতায় পাঠাইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার পুলিস পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, হিলি সাহেব একটা দাঙ্গা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। কিন্তু কোথায় যে দাঙ্গা করিবেন, তাহা পূর্ব্বাহ্ণে কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সাহেবেরা ভাণ করিলেন, সরুলিয়া আক্রান্ত হইবে; পুলিস সেই দিকে ছুটিল। সাহেবেরা এ দিকে রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া বড়খালি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রত্যুষে যখন বড়খালি আক্রান্ত হইল, তখন গ্রাম-বাসীরা সকলেই জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারাও লাঠি ও সড়্কি লইয়া 'মার্' 'মার্' শব্দে ছুটিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, এবার সাহেবেরা সংখ্যায় অনেক। তাহাদের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু কেহ ফিরিল না। রহিম উল্লা নামধেয় জনৈক বলবান্

পাঠান লাঠি লইয়া অগ্রসর হইল। তাহার লাঠিতে মরেলগঞ্জের কয়েকজন অস্ত্রধারী ধরাশায়ী হইল। হিলি সাহেব তাহা দেখিলেন। সত্য মিথ্যা জানি না—ইহা জনরব যে, হিলি সাহেব বন্দুক ছুঁড়িলেন, রহিম আহত হইল। মকদ্দমা যে রূপ দাঁড়াইয়াছিল আমি তখনকার কাগজ হরকরা, ইংলিশম্যান, ফেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি হইতে ভাবার্থ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রহিম আহত হইয়া পলায়ন করিল; এবং গৃহ-প্রাঙ্গণে বসিয়া ক্ষতস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। উঠানের চারিদিকে উচ্চ গাছ, গাছের পাশে দরমার উচু বেড়া, তার নীচে খাদ। রহিম যখন বসিয়া পায়ের ক্ষত বাঁধিতেছে, তখন দ্বিতীয় গুলি আসিয়া তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিল। রহিম তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইল। এ গুলি প্রথম গুলির ন্যায় হিলি সাহেবের বন্দুক হইতে ছুটিয়াছিল বলিয়া সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয়।

রহিম, গ্রামের একজন মান্য গণ্য ব্যক্তি। সে যখন মরিয়া গেল, তখন গ্রামবাসীরা ভীত হইয়া জঙ্গলের

দিকে পলাইতে লাগিল। সে সময়ের দৃশ্য বর্ণন করিতে আমি অসমর্থ। লাঠিয়ালেরা মহা উল্লাসে গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহা লইয়া যাইতে পারে, তাহা লুণ্ঠন করিল; যাহা লইয়া যাইতে অসমর্থ, তাহা ভস্মীভূত করিল; যাহা আগুনে পুড়াইবার নয়, তাহা জলে ফেলিয়া দিল; যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাকে মারিল। রমণীরাও নিস্তার পাইল না। যাহাদের বয়স আছে, তাহারা বন্দী হইল। রহিম উল্লার স্ত্রী ভগ্নী কেহই পরিত্রাণ পাইল না।—বিজয়ীদল, তাহাদের সঙ্গে লইয়া চলিল। আর একটা জিনিস তাহারা সঙ্গে লইল, সেটা রহিম উল্লার মৃতদেহ।

যে গ্রাম অরুণোদয়ে হাসিতেছিল, সে গ্রাম মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে হৃতসর্ব্বস্ব হইল। গ্রাম বেষ্টন করিয়া রমণীর হাহাকার-ধ্বনি, আর অনলের গর্জ্জন উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ণে সে ধ্বনি পৌঁছিল;—তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন।

তিনি পুলিস লইয়া স্বয়ং তদন্ত করিতে আসিলেন। মরেলগঞ্জে আসিয়া দেখিলেন, সাহেবেরা পলাতক।

আমি বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, লাইটফুট নামধেয় জনৈক সাহেব,মরেলের অংশীদার ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আগমনে মরেল, লাইটফুট, হিলি সকলে পলায়ন করিলেন। ধরা পড়িল, বাঙ্গালী লাঠিয়ালরা। তন্মধ্যে দৌলত চৌকীদারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র, হিলি সাহেবের নামে ওয়ারেণ্ট ইষু করিয়া আসামীদের বিচারার্থ যশোহর পাঠাইলেন। নিজে বিচার করিলেন না; কেন না, আইনানুসারে তদন্তকারী বিচার করিতে অসমর্থ।

দায়রার বিচারে দৌলত চৌকিদারের উপর ফাঁসির হুকুম হইল, এবং চৌত্রিশ জন আসামীর উপর যাবজ্জীবন দীপান্তর বাসের দণ্ডাদেশ হইল।

সাহেবেরা নিরুদ্দিষ্ট। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে মরেল ও লাইটফুট বিলাত পলাইলেন। হিলি ছদ্মবেশে নামান্তর গ্রহণ করিয়া বোম্বে হইতে পলাইতেছিল, এমন সময় পুলিস গিয়া তাহাকে ধরিল, এবং টানিয়া আনিয়া জেলে ফেলিল। হিলি অনেকদিন জেলখানায় পড়িয়া রহিল। অবশেষে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের

ফেব্রুয়ারি মাসে হাইকোর্টের বিচারে হিলি খালাস পাইল।

খালাস পাইবারই কথা। হিলিকে কেহ সনাক্ত করিতে পারিল না; তা' ছাড়া রহিম উল্লার মৃতদেহ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

হিলি মুক্ত হউক, তাহাতে কোন দুঃখ নাই। হিলি যুবক, হিলি আইরিষ; তাহার মুক্তিতে— তাহার প্রাণরক্ষায় আমাদের আনন্দ বই দুঃখ নাই। কিন্তু আমাদের যে দুঃখ, সে দুঃখ বুঝিবে কে?

যখন সাহেবেরা পলাতক তখন খুলনায় রাষ্ট্র হইল, বঙ্কিমচন্দ্রকে মারিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছে। যে তাঁহাকে মারিতে পারিবে তাহাকে লক্ষটাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। কে ঘোষণা করিল, ও কে যে টাকা দিবে, তাহা আমি জানি না। জনবর যে, একজন সাহেব নাকি এক পকেটে রিভলভার ও অন্য পকেটে একলক্ষ টাকার নোট লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ছিল। সাহেব নাকি উক্ত

জিনিস দুইটি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিয়াছিল "তুমি কোন্ জিনিসটি চাও? যদি অর্থ গ্রহণ করিতে সম্মত না হও, তবে এখনি তোমায় হত্যা করিব।" বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিলেন, "আমার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া কথার উত্তর দেব।"

বঙ্কিমচন্দ্র উঠিয়া পাশের ঘরে গেলেন; এবং দ্বার বন্ধ করিয়া ভৃত্যদের ডাকিতে লাগিলেন। সাহেব তখন পলাইল।

তার পরই ঘোষণা প্রচার হইল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ মারিতে পারিল না; ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার পেস্কার মরেলগঞ্জের লোকেদের হাতে পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদ্ সম্বন্ধে হরকরা লিখিলেন,—"Another affray has taken place at Morellganj. The Police were rather severely handled in an attempt to seize the missing Peshkar."

পেস্‌কারকে উদ্ধার করিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে বেগ পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু উদ্ধার করিয়াছিলেন। এবং এমন শোধ লইয়াছিলেন যে, মরেলগঞ্জকে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল। যশোহর জেলার অন্যান্য মহকুমায় গোলযোগ চলিতে লাগিল; কিন্তু খুলনা শান্ত। বেন্‌ব্রিজ সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্য দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া গভর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। কর্ত্তা বিডন সাহেব ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বঙ্কিম-চন্দ্রের একশত টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। এইরূপে চারি বৎসর পাঁচ মাসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র দুইবার প্রোমোশন পাইলেন। পঠদ্দশায় তিনি যেমন এক এক ক্লাস ডিঙ্গাইয়া প্রোমোশন পাইয়াছিলেন, কর্ম্মক্ষেত্রেও তেমনই অনেককে অতিক্রম করিয়া প্রোমোশন পাইয়াছিলেন। চব্বিশ বৎসর পাঁচ মাস বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

জলদস্যু দমন করিতেও বঙ্কিমচন্দ্র সাহস ও তেজের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু মরেলগঞ্জ ঘটিত ব্যাপারের তুলনায় সে সব কথা অতি তুচ্ছ। যে নীলকর

জমীদারেরা বাঙ্গালার Unofficial Parliament বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যে নীলকরেরা ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেবের নামেও Libel case আনিতে পশ্চাৎ-পদ হয় নাই, সে সব ব্যবসাদারেরা বড় সহজ লোক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের দমন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাই ঘটনাটি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলাম।

আর একটা কথার উল্লেখ না করিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতে পারিলাম না। বঙ্কিমচন্দ্রের চারি দিকে যখন দস্যু তস্কর—যখন তাঁহার সঙ্গে নীলকরদের ঘোরতর বিবাদ চলিয়াছে, তখন তিনি স্থিরচিত্তে বসিয়া দুর্গেশনন্দিনী লিখিতেছেন। জানি না, খুলনায় কি দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পাঠান ও মোগলের লড়াই লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। খুলনায় প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু পাঠান বা মোগলের উল্লেখযোগ্য কোনও কীর্ত্তি নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বদলী হইয়া বারুইপুরে গেলেন, তখন দুর্গেশনন্দিনী লেখা

শেষ হইয়াছে। বারুইপুরে কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন; বোধ হয়, সেই সময়েই তিনি দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পড়িয়া অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয়কে শুনাইয়াছিলেন।—(কাহিনী ১৭ পৃষ্ঠা)। *

খুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্থানে এক জন সাহেব আসিল; সাহেবকে সাহায্য করিবার জন্য এক জন দেশীয় ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। যে কাজ বঙ্কিমচন্দ্র একা করিতেন, সে কাজ দুই জনে চালাইতে লাগিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে প্রথমবার বেশীদিনের জন্য ছিলেন না; বোধ হয় সাত মাস হইবে। এখানে এমন কিছু করেন নাই, যাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতে

---

* দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধীয় এই আখ্যায়িকা আমি বাল্যকালে পূজ্যপাদ সঞ্জীবচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে কোনও কথা কোনও দিন তুলেন নাই। তুলিলে পাছে ভ্রাতৃদ্বয় লজ্জা পান, তাই বোধ হয় তুলেন নাই। পিতার নিকট অথবা অন্য কাহারও নিকট এ সম্বন্ধে কিছু শুনি নাই।

পারে। বারুইপুরের কোনও ভদ্র ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কোনও মাসিক পত্রে কিছু লিখিয়াছিলেন; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

সাইক্লোনের সময় বঙ্কিমচন্দ্র দুঃস্থ প্রজাদের নানারূপে সাহায্য করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিদিন অপরাহ্ণে অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে কীটাণু, উদ্ভিদের সূক্ষ্মভাগ প্রভৃতি পরীক্ষা করিতেন। পরীক্ষিত পদার্থনিচয়ের অপরূপ শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "জগতের মধ্যে কেবল আমরাই কুৎসিৎ, আর আর সমস্তই সুন্দর!"*

লেখক বলিতেছেন, "এই সমস্ত পরীক্ষার সময় আমি কখনও তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরভক্তির অপর উচ্ছ্বাস দেখি নাই—কখনও ঈশ্বরের নামগুণ শুনি নাই, বা ঈশ্বর-বিশ্বাসের কোন পরিচয় কখনও পাই নাই।"

লেখক বলিয়া যাইতেছেন,—"আমাদের বারুইপুর

* কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

অবস্থানসময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্বন্ধে উভয়ের ঘনিষ্ঠতার কতকটা পরিচয় পাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সময়ে সময়ে বারুইপুরে আসিয়া কনিষ্ঠের অতিথি হইতেন। উভয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। শ্যামাচরণ বাবুতে জ্যেষ্ঠত্বের কোন অভিমান দেখি নাই, বঙ্কিম বাবুতেও কনিষ্ঠত্বের কোন সংস্কার অনুভব করি নাই। তাঁহারা ঠিক যেন পরস্পর পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহাদের আলাপের মধ্যে কোন লজ্জা সরম প্রকাশ পাইত না। সকল বিষয়ে পরস্পরে খোলাখুলি আলাপ ও আমোদ আহ্লাদ করিতেন।

"মধ্যে মধ্যে বাবু দীনবন্ধু মিত্র ও ২৪ পরগণার Assistant District Superintendent বাবু জগদীশ নাথ রায়, বঙ্কিম বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিতেন এবং সকলে কয়েক দিন অত্যন্ত আমোদ আহ্লাদে থাকিতেন।* * * একবার বঙ্কিম বাবুর মজিলপুরে অবস্থিতি কালে একদিন এই বাবুদ্বয় রাত্রি ৮।৮৷৷০ টার সময় গাড়ী করিয়া মজিলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বঙ্কিমবাবু পূর্ব্বাহ্ণে তাঁহাদের আগমনের কোন সংবাদ পাইয়াছিলেন কি না জানি না। তিনি তখন তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে অধ্যয়নে নিরত ছিলেন। তাঁহারা গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার বাসাবাটীর সম্মুখস্থ হইয়াই গান ধরিলেন, 'আমরা বাগবাজারের মেথরাণী।' বঙ্কিম বাবু তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ পাঠত্যাগ করিয়া, বারাণ্ডায় আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কালুয়া, নিকাল দেও"— 'কালুয়া, নিকাল দেও'। এইরূপে সম্ভাষিত হইয়া তাঁহার বন্ধুদ্বয় তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন।

"বঙ্কিম বাবুর এতগুলি সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত। আমি থিওডোর পার্কারের Ten Sermons নামক পুস্তকখানি তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন এবং সপ্তাহান্তে তাহা আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "Such worst English I have never read."

বারুইপুর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ-

ভাগে ডায়মণ্ড হারবারে বদলী হইয়া যান। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া আবার বারুইপুরে ফিরিয়া আসেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আবার তাঁহার বেতনবৃদ্ধি হইল। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় দেড় মাসের ছুটী লইয়া গৃহে আসিয়া বসিলেন। অবকাশান্তে আবার বারুই-পুরে আসিলেন। এবার সেখানে বেশীদিন থাকিতে হইল না; ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার এক নূতন চাকুরী জুটিল। গভর্ণমেণ্টের আমলাদের বেতন-নির্দ্ধারণ জন্য পুর্ব্ব হইতে এক কমিশন বসিয়াছিল। হাইকোর্টের জজ প্রিন্সেপ সাহেব এই কমিশনের সম্পাদক ছিলেন। এক্ষণে তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া যাওয়াতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থানে সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। এটা বড় সামান্য গৌরবের কথা নয়। যে পদে এক জন হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত ছিলেন, সেই পদে বাঙ্গালী যুবক বৃত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ কাজে দেড় মাস মাত্র নিযুক্ত ছিলেন। তার পর ২৪-পরগণার সদর আলিপুরে বদলী হইয়া আসিলেন।

বারুইপুরে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। দুর্গেশনন্দিনী ১৮৬৫ ও কপালকুণ্ডলা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই প্রকাশিত হয়। কপালকুণ্ডলা-প্রকাশের পর তাঁহার যশ চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তবু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছাড়েন নাই, তিনি তাঁহার "বিবিধার্থ সংগ্রহে" "লম্ফ-ত্যাগ" "নিদ্রাগমন" প্রভৃতি বাক্যাবলী লইয়া অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।

আলিপুরে বঙ্কিমচন্দ্র দশ মাস মাত্র ছিলেন। সেই দশ মাসের ভিতর তিনি মৃণালিনী লিখিয়া শেষ করিলেন। পরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে তিনি ছয় মাসের ছুটী লইলেন। ছুটীর কিয়দংশ গৃহে থাকিয়া আইন পুস্তক পাঠ ও মৃণালিনীর পাণ্ডুলিপি সংশোধনে অতিবাহিত করিলেন; এবং অবশেষে মৃণালিনী ছাপিতে দিয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন। তখনকার দিনে ছাপার কার্য্য তত দ্রুত অগ্রসর হইত না। মৃণালিনী মুদ্রিত হইতে এক বৎসরের উপর লাগিয়াছিল। অবকাশান্তে বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে

ফিরিয়া আসিলেন; তখনও মৃণালিনী ছাপা শেষ হয় নাই। অবশেষে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মৃণালিনী প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে চলিয়া গেলেন। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র B. L. পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

বহরমপুরের কথা কাহিনীতে (৩৪ পৃষ্ঠায়) বিবৃত হইল। তা' ছাড়া আরও কিছু পর পরিচ্ছেদে লিখিত হইল।

বহরমপুর।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। তখন তাঁহার বেতন হইল, সাত শত টাকা। কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে রাজসাহী ডিবিসনের কমিশনরের Personal Assistant স্বরূপ কার্য্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু স্থানান্তরে যাইতে হয় নাই, বহরমপুর তখন রাজসাহী ডিবিসনের

অন্তর্গত ছিল; এবং বহরমপুরেই কমিশনর সাহেবের Head Quarters ছিল।

এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃহীন হইলেন। নগ্নপদে নগ্নদেহে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরীয়মাত্র সম্বল করিয়া কাছারী আসিয়া বসিতেন। দুই একদিন মাত্র এই ভাবে কাছারি করিয়াছিলেন। তার পর ছুটী লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের লুপ লাইন খুলিয়াছে, কিন্তু আজিমগঞ্জ বা লালগোলা রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে নলহাটীতে গিয়া ট্রেণে উঠিতে হইল। সেখানে এক বিপদ। গাড়ীতে উঠিতে গিয়া দেখেন, দুই জন সাহেব মদ খাইতেছে। সময় নাই, সেকেণ্ড ক্লাস কম্‌পার্টমেণ্টও আর নাই। বাধ্য হইয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন।

সাহেবেরা দেখিল, এক জন নগ্নপদ, নগ্নদেহ বাঙ্গালী তাহাদের গাড়ীতে উঠিল। তাহারা ভাবিল, 'নেটিভ'টা বুঝি ভ্রমক্রমে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়াছে। তাহারা 'উতার যাও' 'উতার যাও' শব্দে চীৎকার করিতে

লাগিল। ট্রেণ কিন্তু তখন চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, বিপদ মন্দ নয়। তাঁহার সঙ্গে এক জন ভৃত্য ছিল, সেও তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। দুই জন মত্ত সাহেবের সম্মুখে ক্ষীণকায় দুর্ব্বল বঙ্কিমচন্দ্র একাকী। কিন্তু তিনি পিছাইলেন না; পরিষ্কার ইংরাজীতে সাহেবদের বলিলেন, "চলন্ত গাড়ী হইতে কেমন করিয়া নামিয়া যাইতে হয়, তোমরা আগে তাহা দেখাইয়া দাও।"

সাহেবেরা দেখিল, 'নেটিভ'টা বেশ ইংরাজি জানে। তাহাদের চক্ষু যদি মদের মোহে আচ্ছন্ন না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা দেখিতে পাইত, বঙ্কিমচন্দ্র সামান্য মনুষ্য নহেন। সাহেবেরা তাহা দেখিতে পাইল না; তাহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে নামিয়া যাইবার জন্য পীড়ন করিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া দীপ্তনয়নে তীব্র ভাষায় সাহেবদের ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। সাহেবেরা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। এমন সময় পরবর্ত্তী ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র নামিয়া প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলেন। তদবধি তিনি দ্বিতীয়

শ্রেণীর গাড়ীতে আর উঠিতেন না। তিনি বলিতেন, "দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইতর সাহেবেরা উঠে; বাঙ্গালী ভদ্রলোক যদি আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ট্রেণে যাতায়াত করিতে বাসনা করে, তাহা হইলে প্রথম অথবা মধ্য শ্রেণীর গাড়ী যেন ব্যবহার করে।"

১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে "বঙ্গদর্শন" প্রথম প্রকাশিত হয়। সে কথা পরে বলিব। এই সময়ে—"বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইবার পর—স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের একবার সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাৎটা সম্ভবতঃ বহরমপুরেই হইয়াছিল। রমেশ বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" ও "বঙ্গদর্শন" পাঠে বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষা এত সুন্দর হইতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি তোমার যদি এতই অনুরাগ হইয়া থাকে, তবে তুমি বাঙ্গালা লেখ না কেন?"

রমেশ বাবু। আমি বাঙ্গালা লিখ্‌ব! আমি জীবনে কখনও বাঙ্গালা লিখি নাই—লিখিবার প্রণালীও জানি না।

বঙ্কিমচন্দ্র। লিখিবার প্রণালী আবার কি? তোমার মত শিক্ষিত ব্যক্তি যে ধারায় লিখিবে, সেই ধারাই প্রণালী।

কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় রমেশ বাবুকে বলিয়াছিলেন, "তোমার ইংরাজি রচনা কখনও স্থায়ী হইবে না। অন্য লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। তোমার খুড়া গোবিন্দচন্দ্র, শশীচন্দ্র এবং মধুসূদন দত্ত, হিন্দু কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র; গোবিন্দ ও শশী যে সকল ইংরাজি কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা অত্যল্প কালের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মধুসূদন দত্তের বাঙ্গালা কবিতা কখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না,—বাঙ্গালা সাহিত্য যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহা বর্ত্তমান থাকিবে।" *

ইহার দুই বৎসর পরে রমেশ বাবুর বঙ্গবিজেতা

* Dutt's Literature of Bengal, P, 226.

প্রকাশিত হইল। তা'র পর তাঁহার আরও কত উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। সে সকল সহজে ধ্বংস হইবার নয়। কিন্তু তাঁহার Lays of Ancient India ধ্বংসোন্মুখ। গোবিন্দদত্তের Cherry Blossom, শশী দত্তের Vision of Sumeru বিলুপ্ত হইয়াছে। মধুসূদন দত্তের Captive Ladie কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার মেঘনাদবধ অবিনশ্বর।

বঙ্কিমচন্দ্রও একদিন পঠদ্দশায় Rajmohan's wife নামক গল্প ইংরাজি ভাষায় লিখিয়াছিলেন। গল্প শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়াছিল। তিনি Rajmohan's wife ও Adventures of a young Hindu ছাড়িয়া দুর্গেশনন্দিনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এই রকম ভুল অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির ঘটিয়া থাকে। তবে কেহ বঙ্কিমচন্দ্র বা মধুসূদন দত্তের ন্যায় ভুল শোধরাইয়া লয়েন, কেহ বা গোবিন্দচন্দ্র বা শশীচন্দ্রের মত, ভুলেতেই আজীবন বিভোর থাকেন।

হুগলী।

—*—

বঙ্কিমচন্দ্র ছুটী লইয়া বহরমপুর হইতে বিদায় হইলেন। ছুটীর অবসানে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে বারাসতে আসিলেন। সেখানে অতি অল্প সময় থাকিয়া সেই বৎসরেই মালদহে বদ্‌লী হইয়া আসিলেন। মালদহের জলবায়ু তাঁহার সহ্য হইল না; তিনি কয়েক মাস মাত্র তথায় থাকিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২২এ জুন হইতে নয় মাসের ছুটী লইয়া গৃহে আসিলেন।

গৃহে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, রাধারাণী ও কৃষ্ণকান্তের উইল লিখিতে লাগিলেন। তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের ফুলবাগান, উদ্যানবাটী, অর্জ্জুনা দীঘী ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি সেই ছবি তুলিয়া লইয়া, তাহাকে নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া "কৃষ্ণকান্তের উইলে" বসাইলেন।

"বঙ্গদর্শন" পূর্ণতেজে তখনও চলিতেছে। পরমারাধ্য

যাদবচন্দ্র "বঙ্গদর্শনে"র হিসাব প্রভৃতি রাখিতেন; সঞ্জীবচন্দ্র মুদ্রাঙ্কন কার্য্য পরিদর্শন করিতেন; বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সম্পাদন করিতেন।

১২৮২ সালের চৈত্র মাসে—ইংরাজি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে—বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে বদলী হইলেন। কাঁটালপাড়া হইতে হুগলী এক ঘণ্টার পথও নয়। বঙ্কিমচন্দ্র গৃহ হইতে হুগলি যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েক দিনের জন্য মাত্র। ১৮৮৩ সালের প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র কোনও কারণবশত "বঙ্গদর্শন" উঠাইয়া দিয়া সপরিবারে চুঁচুড়ায় চলিয়া গেলেন।

১২৮২ সাল বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে "বিষবৃক্ষ" তুল্য উৎকৃষ্ট উপন্যাস "কৃষ্ণকান্তের উইল" লিখিত হয়; এই বৎসর বঙ্গদর্শন উঠিয়া যায়; এই সময় তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব সমুদিত হয়; এই বৎসরেই তাঁহার কোনও নিকটাত্মীয়ের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

১২৮৩ সালের শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল হয়—আত্মীয়ের সহিত মনোমালিন্য

বিদূরিত হয়—বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত করিবার আয়োজন হয়।

ধর্ম্মভাবের সূচনা পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু হইয়াছিল—কোনও কারণ অবলম্বনে সহসা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নাই। যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা আসন্ন প্রসবা তখন তিনি রাধাবল্লভের মন্দিরে গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া সাশ্রুনয়নে ঠাকুরকে কত ডাকিয়াছিলেন। লোক-চক্ষুর সম্মুখে এই তাঁহার প্রথম ডাক। তার পর দুই তিন বৎসর যাইতে না যাইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আবার কাতর হইয়া রাধাবল্লভের চরণে পড়িতে দেখিলাম। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র কঠিন রোগগ্রস্ত—মরণাপন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে নিশিশেষে ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রিতাবস্থায় নবদূর্ব্বাদল শ্যাম° বংশীবদন রাধাবল্লভকে স্বপ্নে দেখিলেন। পরদিন ঠাকুরের নির্ম্মাল্য আনিয়া শিশুর মাথায় দিলেন। শিশু অচিরে আরোগ্য লাভ করিল। তদবধি বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল হইল—ভক্তির ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইল।

কিন্তু ইহা নির্ঝরিণী মাত্র। ঝঙ্কার নাই, শব্দ নাই, শক্তি নাই। প্রৌঢ়ে এই নির্ঝরিণী স্রোতঃস্বতীতে পরিণত হইয়াছিল। তার পর বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে এই ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বতীকে বিশালতরঙ্গময়ী কূল-পরিপ্লাবিনী শক্তিশালিনী নদীতে পরিণত হইতে দেখিয়াছি। (কাহিনী ১৭ পৃষ্ঠা)। বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ হইতে আমরা "কৃষ্ণচরিত্র" ও "ধর্ম্মতত্ত্ব" কুড়াইয়া পাইয়াছি। আর শিক্ষা পাইয়াছি, স্বল্প জ্ঞান—অহঙ্কার ও নাস্তিকতায় পর্য্যবসিত হয়; আবার সেই জ্ঞান যত বাড়িতে থাকে, ততই আমাদের মন ঈশ্বরমুখী হয়।

হুগলীতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় পাঁচ বৎসর ছিলেন। এই পাঁচ বৎসর বৃথা যায় নাই। মান, সম্ভ্রম, অর্থসমাগম যথেষ্ট হইয়াছিল। হুগলীর কলেক্টার, বঙ্কিমচন্দ্রের উপর জেলার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন; ডিবিজন্যাল কমিশনর বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে Personal assistant করিয়া লইয়াছিলেন। ছোটলাট ইডেন সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্রের

অনুরোধে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রকে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করিয়াছিলেন। পুস্তক-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ প্রচুরপরিমাণে আসিয়া তাঁহার লক্ষীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিল; সাধের "বঙ্গদর্শন" আবার মাথা তুলিল; "কমলাকান্তের পত্রাবলী", "রাজসিংহ", "মুচিরামগুড়ের জীবন চরিত", "কমলাকান্তের জবান-বন্দী","আনন্দমঠ" প্রভৃতি লিখিত হইয়া বঙ্গদর্শনে একে একে প্রকাশিত হইতে লাগিল। "আনন্দমঠ", "বঙ্গ-দর্শনে" বাহির হইবার অনতিপূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী ত্যাগ করিলেন।

হুগলীতে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম, H. A. D. Phillips. তিনি বৰ্দ্ধমানে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ফিলিপস্ শুধু যে এক জন দক্ষ সিবিলিয়ন ছিলেন, তা' নয়—তিনি নানাভাষাভিজ্ঞ মহাপণ্ডিত ইংরাজ-কুলপ্রদীপ ছিলেন। এই ফিলিপস্ সাহেবই কপালকুণ্ডলা ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া যশ কিনিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার

পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যানুরাগ জগতে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি অকালে লোকান্তরিত হইলেন।

চুঁচুড়ায় যে বাটীতে বঙ্কিমচন্দ্র বাস করিতেন, সে বাটী আজও আছে। বাটীটি প্রশস্ত, দ্বিতল,—ঠিক গঙ্গার উপর। বারান্দার নীচে দিয়া জাহ্নবী বহিয়া চলিয়াছে। মাথার উপর নীলাকাশ, পদনিম্নে কুলু কুলু ধ্বনি, সম্মুখে ধবলতরঙ্গা জাহ্নবী। বঙ্কিমচন্দ্র সে দৃশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—"একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগিরথী লক্ষ-বীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতে-ছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল।" *

* ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত।

এই দৃশ্য—কাব্য-রাজ্যের এই মনোরম চিত্রপট বঙ্কিমচন্দ্রের নবোদ্গতপত্র-তুল্য কোমল হৃদয়ে অনপনেয় রাগে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। হুগলী ত্যাগের কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন "দেবী চৌধুরাণী" লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনও তাঁহার মানসপটে এ চিত্র অঙ্কিত ছিল। তিনি কোমল তুলিকা লইয়া ভিন্ন আধারে ভিন্ন বর্ণে সেই কাব্য-রাজ্য অঙ্কিত করিলেন। তবে সে চিত্র যেন আরও সুন্দর—বর্ণ যেন আরও উজ্জ্বল—কুলুকুলু ধ্বনি যেন আরও কোমল। একটু উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—

"বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এখন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিয়াছে—সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও

চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে,' সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল ফল পাতা বাহিয়া তীব্রস্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর পত-পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে আঁধারে সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে।" *

হাবড়া।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী হইতে হাবড়া আসিলেন। আসিবার পরই সি, ই, বক্‌লণ্ডের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোরতর বিবাদ বাধিল। তখন সাহেব, হাবড়ার কালেক্টার। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। কেন না, বঙ্কিমচন্দ্র

* দেবী চৌধুরাণী—দ্বিতীয় খণ্ড—তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুলিস্-চালানি মকদ্দমাগুলি প্রায় ছাড়িয়া দিতেন,—পুলিসের কোনও আব্দার রক্ষা করিতেন না। সুতরাং কোন্ পুলিসের কর্ত্তা ম্যাজিষ্ট্রেট্, বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন ?

ধূমায়মান বহ্নি ক্রমে জ্বলিয়া উঠিল। একটি ঘটনা উপলক্ষ হইল। ঘটনাটির একটু বৈচিত্র্য আছে, তাই সবিশেষ বিবরণ দিলাম।

হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটী হইতে নোটিস্ জারি হইল, কেহ combustible পদার্থ দ্বারা গৃহ আচ্ছাদন করিতে পারিবে না ; যদি করে, দণ্ডার্হ হইবে। এই নোটিস প্রথমে ইংরাজিতে লিখিত হয় ; পরে বাঙ্গালায় অনুদিত হইয়া সহরময় প্রচার করা হয়। অনুবাদ করেন—ডনিথরণ সাহেব। তিনি তখন মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটরী। অনুবাদটি অতি সুন্দর,—Combustible শব্দের অর্থ করা হইল, জলীয়। তিনি জলীয় কি জ্বলীয় লিখিয়াছিলেন, আমি তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।

এই 'জলীয়' নোটিস এক বুড়ীর মাথায় পড়িল।

তাহার একখানি গোলপাতার আচ্ছাদন-যুক্ত ক্ষুদ্র কুটীর ছিল। বুড়ী লেখা পড়া জানে না; জনৈক প্রতিবেশীকে দিয়া নোটিস্ পড়াইল। সে দিগ্‌গজ-জাতীয় পণ্ডিত, বৃদ্ধাকে পরামর্শ দিল, জল দিয়া ঘর ছাইও না। বৃদ্ধা আশ্বস্ত হইল! তাহার এবম্প্রকার কোনও অভিপ্রায় ছিল না। সে তাহার গোলপাতার ঘরখানিকে কোনও রকমে জলযুক্ত হইতে দিল না। আচ্ছাদনটি তখন বেশ Combustible.

কিছু দিন গত হইতে না হইতে মিউনিসিপ্যালিটীর অনুচরেরা বুড়ীকে আসিয়া ধরিল। চেয়ারম্যান সাহেব সেই অশীতিপর বৃদ্ধাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মকদ্দমা বিচারের ভার বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অর্পণ করিলেন।

বিচার করিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, বৃদ্ধাকে অনর্থক পীড়ন করা হইয়াছে। যে নোটিসের অর্থ বিচারক স্বয়ং বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, সে নোটিসের অর্থ বুড়ী কিরূপে বুঝিবে? তিনি বৃদ্ধাকে অব্যাহতি দিয়া রায়ে লিখিলেন, "নোটিসের অর্থ বোধগম্য হইল

না। নোটীস insufficient বোধে আসামীকে মুক্তি দিলাম।"

বৃদ্ধা আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে কি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিয়াছিল, কেন তাহাকে সরকার বাহাদুর ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, কেনই বা অবশেষে ছাড়িয়া দিয়াছিল? সে হয় ত ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল, কোন রকমে এক আধ ফোঁটা জল চালের মাথায় পড়িয়া থাকিবে; অতঃপর জলবিন্দু রৌদ্রতেজে শুকাইয়া যাওয়াতে সে খালাস পাইয়াছিল!

বুড়ী খালাস পাইল দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বক্‌লণ্ড ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে নথি তলব করিয়া তিনি জজমেণ্টের উপর মন্তব্য লিখিলেন, "His (Bankim Chandra's) vanity in the knowledge of Bengali language has misled the judgment—"

এই মন্তব্য পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সাতিশয় রোষান্বিত হইলেন; এবং ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিলেন, "You

are not my judicial superior officer; and you have no right to criticise my judgment." তিনি আরও লিখিলেন, "তুমি যদি এ জন্য আমার নিকট এক মাসের মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না কর, তাহা হইলে তুমি কাগজপত্র কমিশনার সাহেবের নিকট পাঠাইবে।"

এক মাস গত হইয়া গেল; বক্‌লণ্ড সাহেব ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন না—কাগজপত্রও কমিশনরের নিকট পাঠাইলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কমিশনর সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কমিশনর বুঝি তখন বিম্‌স্ সাহেব ছিলেন। কিছু দিন পরে বিম্‌স সাহেব হাওড়ায় আসিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কমিশনরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

এদিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সেরেস্তাদার কেমন করিয়া তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি অবিলম্বে প্রভু বক্‌লণ্ডের কাছে ছুটিয়া গিয়া সকল কথা নিবেদন করিলেন। সাহেব বোধ হয় একটু ভীত হইলেন। ভয়—

মানের জন্য; তা'তে আবার তিনি পাকা ম্যাজিষ্ট্রেট নহেন—একটিং মাত্র। তিনি জানিতেন যে, জজ্‌মেণ্টের উপর মন্তব্য লেখা তাঁহার অন্যায় হইয়াছে; কিন্তু অধীনস্থ নেটিভ ডিপুটি যে এতটা করিয়া তুলিবে তাহা তাঁহার ধারণায় আসে নাই, এক্ষণে যাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত মিটিয়া যায়, তদভিপ্রায়ে তিনি সেরেস্তাদারকে বলিলেন, "অপরাহ্ণে বঙ্কিমচন্দ্র যখন আদালত ত্যাগ করিয়া গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিবেন, তখন আমায় সংবাদ দিবে।"

সেরেস্তাদার তাহাই করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে লইতে যখন গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল তখন তিনি ছুটিয়া গিয়া সাহেবকে সংবাদ দিলেন। সাহেব তৎক্ষণাৎ আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বারান্দায় ধরিলেন। বুদ্ধিমান বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাপারটা কি, কতক বুঝিলেন। সাহেব বলিলেন, "Have you seen Bankim Babu, what remarks I have made about you in my annual report ?"

Bankim:—It is not my habit to inquire

what District Magistrates write about me in their reports.

Buckland:—I have spoken very highly of you.

Bankim:—I don't care to know that.

সাহেব একটু মুস্কিলে পড়িলেন। এ রকম কড়া কড়া উত্তর পাইবেন তাহা তিনি মনে করেন নাই। কথাগুলায় একটা ধন্যবাদ, বা একটুও কোমলত্ব নাই। সাহেব তখন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, "বঙ্কিম বাবু, কিছু দিন পূর্ব্বে তোমার জজ্‌-মেণ্টের উপর একটা মন্তব্য লিখিয়াছিলাম বলিয়া তুমি কাগজপত্র গভর্ণমেণ্টে পাঠাইতে বলিয়াছিলে; আমি অনুরোধ করিতেছি বঙ্কিম বাবু, তুমি তোমার সে পত্র ফিরাইয়া লও।"

বঙ্কিমচন্দ্র। তুমি ক্ষমা (apology) না চাহিলে কিছুতেই ফিরাইয়া লইব না।

সাহেব। ম্যাজিষ্ট্রেটের একটা প্রেষ্টিজ আছে স্বীকার কর?

বঙ্কিম। আছে, কিন্তু সকলে তা' রাখিতে জানে না।

সাহেব। আচ্ছা বঙ্কিম বাবু, এক কাজ করা যাক্;—আমি আমার মন্তব্য প্রত্যাহার করি—তুমিও তোমার পত্র উঠাইয়া লও।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্মত হইলেন। সাহেব তাঁহার মন্তব্যের নিম্নে লিখিলেন, "I regret I passed the above remarks; I withdraw them."

বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় পত্রের প্রত্যাহার করিলেন। তদবধি বক্‌লণ্ড সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্রকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, এবং আজীবন তাঁহার হিতৈষী সুহৃদ ছিলেন। তাঁহার বঙ্গ-বিশ্রুত পুস্তকে (Bengal under the Lieutenant Governors) বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা তদানীন্তন ছোটলাট Sir Ashley Eden সাহেবের কাণেও উঠিয়াছিল। বোধ হয় কমিশনর সাহেব তুলিয়া থাকিবেন। উচ্চহৃদয় বঙ্গেশ্বর বিরক্ত না হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আরও সদয় হইয়া-

ছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বরাবর একটু স্নেহ নয়নে দেখিতেন। একদা কথা প্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বঙ্কিম বাবু, তোমার পিতা আজও জীবিত আছেন?"

"আছেন।"

"কতদিন তিনি পেন্‌সন ভোগ করিতেছেন?"

"পঁচিশ বৎসরের কম হ'বে না।"

বঙ্গেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিলেন,"দেখ বঙ্কিমবাবু, পঁচিশ বৎসর চাক্‌রী করিলে আমরা তা'কে পেন্‌সন্ দিয়া থাকি; তোমার পিতা পঁচিশ বৎসর পেন্সন্ পাইতেছেন, তাঁকে পেন্সনের পেন্সন দেওয়া আমাদের উচিত।"

তা'র কিছুকাল পরেই—অর্থাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের দেবোপম পিতা—পরমারাধ্য যাদবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিলেন। ১১৯৯ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১২৮৭ সালে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, অপাপবিদ্ধ আত্মা, রাজতুল্য সম্মান লইয়া তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটি গল্প আছে, তাহা এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।—

একজন সন্ন্যাসীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাদবচন্দ্রের বয়স যখন আঠার বৎসর তখন তিনি এই সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। যে অবস্থায় দীক্ষিত হন তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। মন্ত্র দিয়া বিদায় হইবার সময় সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, তিনি আরও তিনবার দর্শন দিবেন। দর্শনও দিয়াছিলেন ; কিন্তু তিন বারের কথা অবগত নহি। শুনিয়াছি, প্রথমবার নাকি তীর্থ-ক্ষেত্রে দর্শন দিয়াছিলেন। অপর দুইবারের কথা এক্ষণে আমি বলিব।

যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর অষ্টাহ পূর্ব্বে সন্ন্যাসী, কাঁটাল-পাড়ার বাটীতে আসিয়া দর্শন দিলেন। যাদবচন্দ্র তখন পূজার দালানে তক্তপোষের উপর ঢালা বিছানায় বসিয়াছিলেন। প্রায় সমস্ত দিন তিনি এই খানেই অতিবাহিত 'করিতেন। এইখানে বসিয়াই তিনি বঙ্গদর্শনের কার্য্যাদি করিতেন—প্রজা বা গ্রামবাসীদের মামলা মকদ্দমা করিতেন। তাঁহার ডাহিনে একখান স্বতন্ত্র তক্তপোষের উপর গালিছা বিছান থাকিত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদি আসিয়া তাহাতে

বসিতেন। বামে একখানা তক্তপোষ ছিল, তাহাতে ভদ্রলোকদের উপযোগী শয্যা বিস্তৃত থাকিত। তাঁহার বিছানায় পৌত্র পৌত্রী ছাড়া অপর কেহ বসিত না। পুত্রেরা যখন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তখন তাঁহারা প্রায় দাঁড়াইয়াই থাকিতেন। পিতা যদি অনুমতি প্রদান করিতেন, তবে তাঁহারা বসিতেন; কিন্তু সসঙ্কোচে—পৃথগাসনে। আমি কখন বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার পিতার সম্মুখে চেয়ারে উপবেশন করিতে দেখি নাই, পিতার সঙ্গে এক শয্যাতেও বসিতে দেখি নাই।

একবার পূজ্যপাদ যাদবচন্দ্রের শরীর একটু অসুস্থ হইয়াছিল। তিনি খট্টাঙ্গোপরি শয্যায় শয়ান ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পিতার নাড়ী পরীক্ষা করিবার বাসনা করিলেন। যাদবচন্দ্রের একপার্শ্বে গৃহ-প্রাচীর, অপর পার্শ্ব উন্মুক্ত। যাদবচন্দ্র প্রাচীরের নিকট শয়ান ছিলেন। শয্যার উপর না উঠিলে যাদবচন্দ্রকে স্পর্শ করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র মুস্কিলে পড়িলেন; শয্যার উপর উঠিতে পারেন না, পিতাকেও সরিয়া আসিতে

বলিতে পারেন না। অবশেষে তিনি এক পাশের বিছানা উঠাইয়া খাটের উপর পা রাখিয়া পিতার হস্ত-স্পর্শ করিলেন। পিতার শয্যা, পিতার বসন, পিতার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পবিত্র জ্ঞান করিতেন। পিতার কক্ষে কখন চর্ম্ম পাদুকা ধারণ করিয়া আসিতেন না—পিতার ব্যবহৃত জিনিষ কখন ব্যবহার করিতেন না।

আর এক দিনের কথা বলিব। একদা বঙ্কিমচন্দ্র পিতার সহিত সাক্ষাৎ মানসে দালানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যাদবচন্দ্র তখন নিয়মতুণ্ডে বঙ্গদর্শনের হিসাব লিখিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি কাণে কম শুনিতেন। পদশব্দ শুনিতে পাওয়া দূরে থাক্, নিকটে দাঁড়াইয়া সহজ কণ্ঠে কেহ কথা কহিলেও তিনি শুনিতে পাইতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের পদ শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল না। পিতৃভক্ত সন্তান পিতার কার্য্যে বাধা দিতে পারেন না—শিক্ষিত ভদ্র সন্তান পিতাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে পারেন না। পিতার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া চলিয়া যাওয়াটা তিনি যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না; তাহাতে পিতার প্রতি একটু যেন অবজ্ঞা দেখান হয়—যেন একটু অধৈর্য্য, একটু বিরক্তি প্রদর্শন করা হয়। জানি না কি ভাবিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নীরবে, নিঃশব্দে পিতার অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। অবশেষে যাদবচন্দ্রের একজন বৃদ্ধা দাসী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে, বঙ্কিমচন্দ্রকে ঈদৃশ বিপদাপন্ন দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "কর্ত্তামশায়, ও কর্ত্তামশায়, সেজবাবু এসে দাঁড়িয়ে আছেন যে।"

কর্ত্তামহাশয় তখন মাথা তুলিয়া দেখিলেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে সস্নেহে আহ্বান করিয়া বসিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম কর্ম্মস্থল যশোহর অভিমুখে যাত্রা করেন তখন তিনি জননীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পাদোদক একটা শিশিতে ভরিয়া লইলেন। যে জলটা জননীর পদস্পৃষ্ট হইয়াছিল,

তাহা গঙ্গোদক; জননী বলিলেন, "কর্‌লি কি! গঙ্গা-জল আমার পায়ে ঠেকালি?"

বঙ্কিমচন্দ্র ছল্ ছল্ নয়নে বলিলেন, "মা, তোমার চেয়ে কি গঙ্গা বড়?"

মাতৃভক্ত সন্তান চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিতার কক্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কক্ষ বাহিরে পাদুকা খুলিয়া, লোকে যেরূপে দেবালয়ে প্রবেশ করে, বঙ্কিম-চন্দ্র সেইরূপে ভক্তিপ্লুত চিত্তে পিতার ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে প্রণাম করিলেন, পিতার চরণধূলি মাথায় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না,—তিনি পিতার চরণ সমীপে বসিয়া রহিলেন। ইচ্ছা, পাদোদক গ্রহণ করেন। কিন্তু বলিতে সাহসে কুলাইল না। একবার চারিদিকে নেত্রপাত করিলেন; দেখিলেন, অদূরে আমার জননী ও পিতামহী নীরবে ম্লানমুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের পিছু পিছু আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কাতর দৃষ্টিতে জননীর পানে চাহিলেন। তিনি সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন; এবং ঝটিতি একটা

জলপূর্ণ ক্ষুদ্র পাত্র আনিয়া যাদবচন্দ্রের চরণসমীপে রক্ষা করিলেন। যাদবচন্দ্র অবনতবদনে নীরব রহি-লেন। যাদবচন্দ্র পা বাড়াইয়া দিলেন। ভক্ত পুত্র তাহা সযতনে ধৌত করিয়া লইলেন, এবং অন্তরালে গিয়া সেই পাদোদক একটা শিশিতে পূর্ণ করিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন বঙ্কিমচন্দ্র পাদোদক-পূর্ণ সেই শিশি দুইটি সম্বল করিয়া, বিদেশে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

সন্ন্যাসীর কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। বলিতেছিলাম, যাদবচন্দ্রের গুরুদেবের কথা। তিনি যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর অষ্টাহ পূর্ব্বে আসিয়া দর্শন দিয়াছিলেন। দর্শনের বিশেষ কোন বৈচিত্র নাই। যাদবচন্দ্র দালানে বসিয়া লেখাপড়া করিতে-ছিলেন, এমন সময় গুরুদেব আসিয়া সম্মুখে দাঁড়া-ইলেন। শুভ্রদেহ, জটাজুটমণ্ডিত, তেজোদীপ্ত, দীর্ঘা-কার মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া যাদবচন্দ্র বিস্মিত হইলেন। তিনি গুরুদেবকে চিনিতে পারিলেন না, অথচ যাদব চন্দ্র, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জানি

না কোন্ দৈবী-শক্তি প্রভাবে যাদবচন্দ্র পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার আসন্নকাল সমুপস্থিত। তিনি কয়েকদিবস পূর্ব্ব হইতে মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। উইল করিয়া, ঘর-দ্বার সংস্কার করিয়া, চাঁদোয়া প্রভৃতি মেরামত করিয়া তিনি মিস্ত্রীদের বলিয়াছিলেন, "বাড়ীতে শীঘ্র একটা বড় গোছের কাজ হইবে।" মুগ্ধ আত্মীয়েরা তখন কেহ বুঝিলেন না, যাদবচন্দ্র নিজের শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়া রাখিয়া যাইতেছেন।

যাদবচন্দ্র স্থির জানিতেন, গুরুদেব মৃত্যুর অষ্টাহ পূর্ব্বে আসিয়া দর্শন দিবেন। তিনি গুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু গুরুদেবকে সম্মুখে পাইয়া তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী বলিলেন, "যাদব, আমায় চিনিতে পারিতেছ না?" সে স্বর যাদবচন্দ্রের মর্ম্মস্পর্শ করিল,—তিনি সন্ন্যাসীর পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

তারপর উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা আমরা কেহ অবগত নহি। সন্ন্যাসী প্রায়

দুই দণ্ড কাল ছিলেন। তিনি এতদ্‌পূর্ব্বে যাদবচন্দ্রের কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু সেই দিন একটু দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স নির্ণয় করা অসম্ভব। যাদবচন্দ্র সত্তর বৎসর পূর্ব্বে দীক্ষিত হইবার সময় তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, আজও তাঁহাকে প্রায় তদ্রূপ দেখিলেন। তবে জটাভার যেন আরও বিশাল,—ভূপৃষ্ঠে লুটাইবার উদ্যোগ করিতেছে; নয়ন ও ললাট যেন আরও প্রশান্ত; দেহের জ্যোতি যেন আরও উজ্জ্বল। দেবতুল্য গুরুদেব, যাদবচন্দ্রকে শেষ উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

গুছাইবার যাহা কিছু বাকি ছিল, যাদবচন্দ্র তাহা দুই তিন দিনের মধ্যে সমাধা করিলেন। অবশেষে মহা-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন। চিকিৎসক নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন, সামান্য জ্বর; বলিলেন, "ভয়ের কোন কারণ নাই।" যাদবচন্দ্র সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আমায় গঙ্গায় লইয়া চল।" তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে কাহারও সাহস হইল না। তাঁহাকে খাটের উপর

শোয়াইয়া প্রথমে রাধাবল্লভের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে জাগ্রত দেবতার সম্মুখে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া যাদবচন্দ্র যুক্তকরে, গলদশ্রুলোচনে, বিগ্রহ পানে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিলেন। শুনিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্রের পুত্র হয় নাই বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

তারপর যাদবচন্দ্রকে গঙ্গা তীরে লইয়া যাওয়া হইল। সঙ্গে অনেক লোক। গঙ্গার তীরে রাধাবল্লভের ঘাটের উপর একটি ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ আছে; সেই গৃহে যাদবচন্দ্রকে লইয়া যাওয়া হইল। গৃহের আশে পাশে তাঁবু পড়িল; আত্মীয় স্বজনেরা তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিন রাত্রি, পুণ্যময় দেবতা গঙ্গাতীরে বাস করিলেন। তৃতীয় দিবস গভীর নিশীথে যাদবচন্দ্র তাঁহার কন্যা ও পরিচারিকাকে কক্ষ বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। কক্ষে অপর কেহ ছিল না। তাঁহারা দ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবং গবাক্ষ সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তার অনতিকাল পরেই তাঁহারা কক্ষমধ্যে

স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

Mohila Press, Calcutta.

মনুষ্যকণ্ঠ শুনিতে পাইলেন—স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, যেন দুইজন মানুষ ঘরের ভিতর মৃদুস্বরে কথা কহিতেছে। তাঁহারা বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকে বলে, গুরুদেব যাদবচন্দ্রকে শেষ দেখা দিতে আসিয়াছিলেন। হইতেও পারে। কিন্তু সে সম্বন্ধে যাদবচন্দ্র কিছু বলেন নাই; সন্ন্যাসীকেও কেহ দেখেন নাই। লোকের অনুমান মাত্র।

অবিলম্বে যাদবচন্দ্রের আহ্বানে কন্যা ও পরিচারিকা কক্ষমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তাঁহারা কক্ষমধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তবে ক্ষণকাল পরে যাদবচন্দ্রের উপদেশ মত তাঁহাকে অন্তর্জলি করা হইল। শত শত কণ্ঠোত্থিত হরিধ্বনির মধ্যে অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করিয়া পূর্ণজ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে যাদবচন্দ্র জীর্ণ দেহাধার ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠতর লোকে প্রস্থান করিলেন।

কলিকাতা।

—*—

পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরে, অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইলেন। লোকের ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র এই পদ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন; এমন কি, যে সকল অনুমান-সিদ্ধ মহাত্মনিচয় কিছু মাত্র অনুসন্ধান না করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও নিঃসঙ্কোচে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, Chief Secretary Macaulay সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ছোটলাটের দপ্তর হইতে অপমান সহকারে তাড়াইয়াছিলেন। এই সকল ভ্রান্ত সংস্কার দূরীকরণার্থে Assistant Secretaryর পদ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত পরিচয় দিব।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের দুই জন মাত্র সেক্রেটারী ছিলেন। একজনের অধীনে Revenue ও General বিভাগ ছিল, অপরের অধীনে

Judicial, Appointment এবং Political বিভাগ ছিল। উভয়ের অধীনে একজন করিয়া Civilian Under Secretary ছিল ; Assistant Secretary কেহ ছিল না—পদও ছিল না।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের decentralisation scheme অনুসারে পরবৎসর Financial Department সৃষ্ট হইল। কিন্তু এই বিভাগের Secretaryর পদ সৃষ্ট হইল না। কিছু কাল বাদে Assistant Secretaryর পদ সৃষ্ট হইল, এবং সেই পদে রবার্ট নাইট নিযুক্ত হইলেন। নাইট সাহেব কিছু দিন চাকরী করিয়া ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সম্পাদকতা করিতে চলিয়া গেলেন।

অবশেষে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সেক্রেটারির পদ সৃষ্ট হইল, এবং সেই পদে মেকেঞ্জি সাহেব নিযুক্ত হই- লেন। মেকেঞ্জি সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে রায় রাজেন্দ্রনাথ মিত্র এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইয়া আসি- লেন। বৎসরেকের উপর কাজ করিবার পর রাজেন্দ্র বাবু দীর্ঘকালের জন্য ছুটি লইলেন। তাঁহার স্থানে বাবু হেমচন্দ্র কর অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন। তিন

মাস যাইতে না যাইতে কর্ত্তৃপক্ষ, হেমবাবুকে সরাইয়া বঙ্কিম বাবুকে সেই পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিলেন।

তখন মেকলে সাহেব, মেকেঞ্জির স্থানে সেক্রেটারি। Chief secretaryর পদ তখনও সৃষ্ট হয় নাই—আরও কিছুকাল বাদে হইয়াছিল। মেকলে সাহেব আসিয়া গভর্ণমেণ্টে প্রস্তাব করিলেন যে, এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ উঠাইয়া দিয়া অন্য দুই বিভাগে যেমন Under Secretary আছে সেইরূপ Financial বিভাগে এক-জন সিভিলিয়ন অণ্ডার সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হউক। তিনি এই প্রস্তাব ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টে পাঠাইবার সময় রাজেন্দ্র বাবু, হেম বাবু ও বঙ্কিম বাবুর যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ উঠিয়া গেল। এই পদ রাজেন্দ্র বাবুর—হেম বাবু ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থানে অস্থায়ী ভাবে কার্য্য করিতেছিলেন মাত্র।

মেকলে সাহেবের প্রস্তাবে, ছোটলাটের দপ্তর হইতে বাঙ্গালীর অন্ন উঠিয়া গেল। উঠাইয়া দিয়া গভর্ণমেণ্ট একটু দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তার কয়েক

বৎসর পরে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে Public Service Commission স্থির করিলেন, তিন জন Under secretaryর মধ্যে একজন উপযুক্ত ভারতবাসী নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু এ প্রস্তাব বিশ বৎসর পরে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল,—বিশ বৎসর পরে রায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এই Under secretaryর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ সম্মানিত পদ পাইতে তিনিই প্রথম বাঙ্গালী।

মেকলে সাহেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যে এককালে ঝগড়া হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। একবার দস্তখত লইয়া উভয়ের মধ্যে সামান্য মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। সাহেব বলিলেন, "তুমি পুরা নাম দস্তখত করিবে।" বঙ্কিমচন্দ্র তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আগে তুমি পুরা দস্তখত কর, পরে আমি করিব। তুমি C. P. L. Macaulay বই Colman Patrick Louis Macaulay লেখ না। আমি B. C. Chatterji লিখিলে যত দোষ?"

মেকলে সাহেব হয়ত ছোটলাটের কান ভারি

করিতে একটু আধটু চেষ্টা করিয়া থাকিবেন ; কিন্তু কাগজ কলমে কিছু পাওয়া যায় না। বিচক্ষণ ইডেন সাহেব তখন আমাদের ছোটলাট। তিনি কর্ম্মদক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রকে একটু স্নেহচক্ষে দেখিতেন বলিয়া শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত মেকলে সাহেবের মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে, ছোটলাট প্রায় সকল সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের পোষকতা করিতেন। ইডেন সাহেব একদিন তাঁহার বন্ধু বাবু প্রসাদ দাস দত্তকে বলিয়াছিলেন, "Bankim chandra is an excellent officer. I always support him in his differences with Mr. Macaulay."

এইত গেল আসল কথা ; তা' ছাড়া বাজে কথাও কিছু আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জনৈক শত্রুর পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। এই শত্রু মহাশয়ের একখানি কাগজ ছিল। তিনি এই সুযোগে বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা রটনা করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। যাহা সাহেবেরা কখন করে না, বাঙ্গালী তাহা করিল। তাঁহার লিখিবারকৌশলটুকুও লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি লিখিলেনঃ—

"We understand that Baboo Bankim Chandra Chatterji, the offg. Assistant Secretary to the Bengal Government, received a short and sweet note from Mr. Secretary Macaulay, on the 22nd January. Mr. Macaulay is reported to have written:—"Very much pleased with the manner in which you have done your work, but you must make over charge within an hour." The charge against Bankim Babu is that, during his time, office secrets oozed out from the office. This is the alleged charge, and which of course every body must regard as simply absurd. The story goes that when the appointment was given to Bankim Baboo, it was done in opposition to the wishes of some secretaries who objected to have a native again. These

secretaries have now come forward with the charge that Bankim Babu permitted secrets to travel out of the office. His place has now been given to Mr. Blyth. So, after all, the place which was made over to the natives of Bengal with so much beat of drum, has now been again given to a European. We wonder when will men in high position learn to be sincere, and to adhere to the pledges they give."

বাঙ্গালী-সম্পাদক তাঁহার ইংরাজি কাগজে যাহা লিখিলেন, ন্যায়পরায়ণ রবার্ট নাইট তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার (৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে) ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে লিখিলেন ঃ—

"With respect to the statements made by our contemporary, we are informed that no "charge" of any kind has been made against Baboo Bankim Chandra

Chatterji, and his transfer was accompanied by no reflection whatever on his character or his abilities. It is a singular thing that if "office secrets" were divulged during the period for which the Baboo acted as Assistant secretary, the head of the office is unware of the fact, and the words which purport to be an extract from Mr. Macaulay's letter were never written by him. Baboo Bankim Chandra Chatterji is a man of high character and attainments, and whatever may be the reason for his transfer, we are glad to be assured that it implies no reflection on him as a public servant, and is, in fact, not personal to him at all, nor to Baboo Rajendra Nath Mitter, whose character for ability and integrity stands equally high.

We agree with the * * in regretting that it has been deemed expedient to take away this important appointment from a native, and we confess our inability to understand the reasons that justify the step. That, however, is a question to be argued on its merits, and we are glad to know that no demerit on the part of either of the gentlemen mentioned, had anything to do with its decision."

যাঁহারা ষ্টেটস্‌ম্যান না পড়িয়া শুধু বাঙ্গালীর কাগজ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মেকলে সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্রকে ছোট লাটের দপ্তর হইতে অপবাদ দিয়া তাড়াইয়াছিলেন। মেকলে সাহেব অপবাদ দেওয়া দূরে থাকুক বঙ্কিমচন্দ্রের সাতিশয় সুখ্যাতি করিয়া ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলেন। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মেকলে সাহেবের প্রস্তাবানুসারে Assistant secretaryর পদ উঠিয়া

গেল—Under secretaryর পদ সৃষ্টি হইল। Civilian ব্লাইথ সাহেব সেই পদে নিযুক্ত হইলেন।

যাজপুরের পথে ও হেষ্টি সাহেব।

—*—

কলিকাতা হইতে বদলি হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে আসিলেন। কিন্তু তথায় বেশীদিন থাকিলেন না; তিন্ মাসের মধ্যে বদলি হইয়া বারাসতে গেলেন। বারাসতেও তিন মাসের অধিক থাকিতে হইল না, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে যাজপুরে বদলি হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যাজপুরে ছয় মাস ছিলেন। ছয়মাস থাকিয়া যখন তথা হইতে ফিরিতেছিলেন তখন সঙ্গে তাঁহার মধ্যম জামাতা। তখন রেল হয় নাই। পথ বড় দুর্গম। তা'র উপর আবার পথে ডাকাইতের ভয়। এই ভয়সঙ্কুল দুর্গম পথে বঙ্কিমচন্দ্র শিবিকারোহণে চলিয়াছেন। জামাতা স্বতন্ত্র শিবিকায়।

ভৃত্যাদি মাল পত্র লইয়া অন্য পথে গিয়াছে। সঙ্গে দুইজন মাত্র লোক; তাহারা লণ্ঠন ধরিয়া পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।

রাত্রিকাল। চারিদিক নীরব। নিকটে জনমানব নাই। চাঁদ মাথার উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে; মাঘ মাসের সাদা মেঘ কখন চাঁদকে গিলিয়া ফেলিতেছে, আবার কখন উদ্গীরণ করিতেছে। চাঁদ যখন গিলিত হইতেছে তখন কাঁদিতেছে; আবার যখন উদ্গীরিত হইতেছে তখন হাসিতেছে। মাঝে মাঝে বেশ বৃষ্টি হইতেছিল।

পথের দুইধারে জঙ্গল। সেই বিশাল অরণ্য মধ্যে দুইটি মাত্র লণ্ঠন-সাহায্যে বেহারারা চলিয়াছে। কখন চাঁদের আলোকে পথ দেখিয়া চলিয়াছে, কখন বা বৃষ্টিধারা মাথায় ধরিয়া লণ্ঠন সাহায্যে পথ দেখিয়া লইতেছে। কন্‌কনে শীত। বঙ্কিমচন্দ্রের পাল্কী আগে, জামাতার পাল্কী পিছনে।

দুইখানা পাল্কীর ষোল জন বাহক; কিন্তু তাহারা উড়ে, সুতরাং, মিছা মানুষ। বাহকেরা শ্রুতিমধুর

রব করিতে করিতে গন্তব্য পথ ধরিয়া চলিয়াছে। সহসা তাহাদের মধ্যে একটা ভীতি সঞ্চার হইল।—তাহারা সম্মুখে ও পার্শ্বে মানুষ দেখিল। স্থির করিল, তাহারা ডাকাইত। মৃদুকণ্ঠে আপনাদিগের মধ্যে কি বলাবলি করিল; তারপর থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষিপ্রহস্তে পাল্কী নামাইল। বঙ্কিমচন্দ্রের তখন একটু নিদ্রাকর্ষণ হইয়া আসিতেছিল। পাল্কী সবেগে ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে?"

উত্তর দিবে কে? উড়িষ্যাদেশ-সম্ভূত বীরকুল-উজ্জ্বলকারী বাহকবৃন্দ তখন সদর্পে পলায়নতৎপর। সে পলায়নের বৃত্তান্ত রূপান্তরিত অবস্থায় 'দেবী চৌধুরাণী'তে লিপিবদ্ধ হয়। দেবী চৌধুরাণী এই ঘটনার কিছু পূর্ব্ব হইতে লিখিত হইতেছিল। আমি একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম ঃ—

"ডাকাইতের ভয়ে দুর্ল্লভচন্দ্র আগে আগে পলাইলেন, ফুলমণি পাছু পাছু ছুটিয়া গেল। কিন্তু দুর্ল্লভের এমনই পলাইবার রোখ যে, তিনি পশ্চাদ্ধাবিতা

প্রণয়িণীর কাছে নিতান্ত দুর্লভ হইলেন। ফুল্লমণি যত ডাকে, "ওগো দাঁড়াও গো, আমায় ফেলে যেও না গো!" দুর্লভচন্দ্র তত ডাকে, "ও বাবা গো, ঐ এলো গো!" কাঁটাবনের ভিতর দিয়া, পগার লাফাইয়া, কাদা ভাঙ্গিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দুর্লভ ছোটে—হায়! কাছা খুলিয়া গিয়াছে, এক পায়ের নাগরা জুতা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, চাদরখানা একটা কাঁটাবনে তাঁহার বীরত্বের নিশানস্বরূপ বাতাসে উড়িতেছে।" ইত্যাদি—

বাহকেরা ত পলাইল; লণ্ঠনধারী দুইজন লোক পলাইয়াছিল কি না, তাহা আমি স্মরণ করিয়া বলিতে পারিতেছি না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের অনুসন্ধান লইবার অবসর পাইলেন না, ডাকাইত আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিল। 'তাহারা সকলেই উড়িয়া। হাতে লাঠি ছাড়া তাহাদের আর কোন অস্ত্র ছিল বলিয়া শুনি নাই। যা'হউক,উড়িয়ারা যে লাঠি লইয়া ডাকাতি করিতে পারে, ইহা তাহাদের পক্ষে অগৌরবের কথা নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পাল্কীর একদিকের কপাট বন্ধ ছিল, অপর দিকের কপাট খোলা। বঙ্কিমচন্দ্র মুখ বাহির করিয়া দেখিলেন, দশ পনর জন ডাকাইত, দুই খানা পাল্কী ঘিরিতেছে। তিনি পাল্কী হইতে নামিয়া পথের উপর দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাতে একটা যষ্টি বা লাঠি ছিল বলিয়া শুনিয়াছি। তিনি সেই যষ্টি উঠাইয়া অগ্রবর্ত্তী ডাকাইতকে পরিষ্কার উড়িয়া ভাষায় বলিলেন, "যে আগু হইবে তাহাকে গুলি করিয়া মারিব।" ডাকাইতেরা দাঁড়াইল। বঙ্কিমচন্দ্র ভয়শূন্য। সেই নির্জ্জন বন-পথে বিংশতি জন দস্যু-সম্মুখে দুর্ব্বল, সহায়শূন্য বঙ্কিমচন্দ্র স্থির, নির্ব্বিকার। নিশাকালে এই ভয়সঙ্কুল বন-পথ অতিক্রম করিতে সকলে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ না মানিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া এই পথে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে দস্যুরূপী অদৃষ্টের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি নির্ভীক হৃদয়ে বলিলেন, "সাধ্য থাকে, মার।" ভাগ্য, পরীক্ষায় তুষ্ট হইল,—দস্যুগণ পলাইল।

এই সময় হেষ্টি সাহেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোরতর

মসী-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সে যুদ্ধের কথা শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় এই মসী-যুদ্ধ চলিয়াছিল, সমগ্র বাঙ্গালা ব্যগ্র হইয়া তাঁহাদের পত্রাবলী পাঠ করিত। শুনিতে পাই এই সকল পত্রের জন্য ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের বিক্রয় এত বাড়িয়াছিল যে, কাগজ খানা কোন কোন দিন দুইবার ছাপিতে হইয়াছে। বিবাদ বাধিবার কারণ অতি সামান্য। সে সময় হেষ্টি সাহেবের হাতে বিশেষ কোন কাজ ছিল না; তাই তিনি হিন্দুদিগের গালি পাড়িতে আরম্ভ করিলেন। উপলক্ষ হইল, শোভা-বাজার রাজ-বাটীর শ্রাদ্ধ। আমি সে সকল বৃত্তান্ত পুস্তক শেষে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

হাবড়া—দ্বিতীয়বার।

——:০:——

যাজপুর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র হাবড়ায় বদলি হইয়া আসিলেন। তখন E. V. Westmacott সাহেব হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট। কিছু দিন যাইতে না যাইতে সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাদ বাধিল। ঘটনাটি এই রূপ;—একটা রেলওয়ে-মকদ্দমা বিচারার্থে বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে অর্পিত হয়। মকদ্দমার ঘটনাটি আমার স্মরণ নাই; অনুসন্ধানেও তাহা জানিতে পারি নাই। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, মকদ্দমার ফলাফল জানিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিলেন, প্রতিনিয়ত মকদ্দমা-নিষ্পত্তি সম্বন্ধে সংবাদ লইতেন। সহসা তিনি একদিন শুনিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বিচার করিয়া আসামীদের অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। সাহেবের তাহা সহ্য হইল না,—তিনি মহারুষ্ট হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে আসিয়া উপস্থিত।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন অন্য একটি মকদ্দমার বিচার

করিতেছিলেন। সাহেবকে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উঠিলেন না, বা বাক্যালাপ করিলেন না। সাহেব, এজলাসের সম্মান রক্ষার্থে মাথা হইতে টুপি খুলিয়া হাতে লইলেন, এবং প্ল্যাটফর্মের নীচে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "Bankim Babu, you have let off the accused in the Railway case!"

বঙ্কিমচন্দ্র সমভাবে চেয়ারে উপবিষ্ট থাকিয়া উত্তর করিলেন, "What of that?"

সাহেব। You ought to have convicted the accused.

বঙ্কিমচন্দ্র। You are uttering what constitutes contempt of court. I now represent Her Majesty.

সাহেব। You have done wrong, and you ought to be told so.

বঙ্কিমচন্দ্র আর কোন বাদানুবাদ না করিয়া সাহেবের বিরুদ্ধে Proceedings লিখিতে প্রবৃত্ত

হইলেন। সাহেব দেখিলেন, মহা বিপদ! যাহা কখন শুনেন নাই, দেখেন নাই তাহা একজন নেটিভ ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিতে উদ্যত! বুদ্ধিমান আইনজ্ঞ সাহেব বুঝিলেন, তাঁহার কাজটা আইন বিগর্হিত হইয়াছে। তিনি অচিরে ক্ষমা প্রার্থনা (apologise) করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, সাহেবকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সাহেবদের সহিত ঝগড়া করিতে করিতে কোন দিন হয়ত তাঁহাকে চাকরী ছাড়িতে হইবে? তাই তিনি আইন পরীক্ষা দিয়া ওকালতির পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন।

ঝগড়ার দুই তিন মাসের মধ্যেই ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব স্থানান্তরিত হইলেন। তিনি আরও কিছুদিন হাবড়ায় থাকিলে বঙ্কিমচন্দ্রকে একটু বেগ পাইতে হইত। সাহেব একটু বেগও দিয়াছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের বাসা তখন কলিকাতায়। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা হইতে হাবড়ায় প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন। সাহেব আদেশ করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে বাসা করিয়া হাবড়ায়

থাকিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া সহস্র অসুবিধা সত্ত্বেও আদেশ প্রতিপালনে তৎপর হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ত্তব্যজ্ঞান সাতিশয় প্রবল ছিল। সংসারে বা কর্ম্মক্ষেত্রে আমি কখনও তাঁহাকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট দেখি নাই। আমি একদিনের একটা কথা বলিব। তিনি কোন আত্মীয়কে মাসে মাসে কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন। এমন সাহায্য তিনি অনেকেরই করিতেন। যাহারা খাইতে পাইত না, তাহাদের খাইতে দিতেন। যাহারা অনাথা, তাহাদের কিছু কিছু মাসহারা দিতেন। তাহাদের দুঃখে বিগলিতচিত্ত না হইলেও সাহায্য করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সাহায্য করিতেন। জনৈক আত্মীয়ের কথা আমি বলিতেছিলাম। এই আত্মীয়কে বঙ্কিমচন্দ্র ঘৃণা করিতেন এবং বিষতুল্য বোধে পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে মাসে মাসে অর্থ সাহায্য করিতেন। আত্মীয়ের নাম মুখে আনিতে অথবা কাগজ কলমে লিখিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবৃত্তি হইত না; তিনি একদা

তাহার নামের পরিবর্ত্তে হিসাবে লিখিলেন—"বাজে খরচ—এত টাকা।"

হাবড়ায় দুইবৎসর থাকিতে না থাকিতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। বেতন হইল, মাসিক আটশত টাকা। পুস্তকের আয়ও তখন যথেষ্ট। জীবনের কোন সময়ে অর্থের অভাব তাঁহাকে অনুভব করিতে হয় নাই।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র তিন মাসের ছুটি লইয়া হাবড়া হইতে দ্বিতীয়বার বিদায় লইলেন। কিন্তু কাঁটালপাড়ায় গেলেন না, কলিকাতায় রহিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি কাঁটালপাড়ার বাস তুলিয়া দিয়াছিলেন, তবে রথ ও দুর্গোৎসব উপলক্ষে দুই চারি দিনের জন্য কাঁটালপাড়ায় গিয়া বাস করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এবার যশোহর জেলার ঝিনাদহ মহকুমায় বদলী হইলেন। কিন্তু বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না; জ্বরে কাতর হইয়া পড়িলেন এবং তিন মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর

ঝিনাদহ হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ভদরকে বদলি হইলেন। ভদরক বালেশ্বর জেলার একটি মহকুমা। বঙ্কিমচন্দ্র দুইবার উড়িষ্যা গিয়াছিলেন; প্রথমবার জাজপুরে—দ্বিতীয়বার ভদরকে। সেখানে গিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহার ছায়া সীতারামে কিছু কিছু দেখিতে পাই।

ভদরকে গিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এক মাস মাত্র তথায় ছিলেন। ফিরিয়া হাবড়ায় আসিলেন। কিন্তু সেখানে থাকিলেন না, পূর্ব্বকথিত ওয়েষ্টমেকট সাহেব তখন তথায় ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। পাছে উভয়ের মধ্যে আবার কলহ বাধে এই আশঙ্কা করিয়া বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র ছয় মাসের ছুটী লইলেন। ছুটীর পর মেদিনীপুরে চলিয়া গেলেন। সেখানে ছয়মাস মাত্র ছিলেন। চারি মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। অবকাশান্তে চব্বিশ পরগণা আলিপুরে বদলি হইলেন। আলিপুর হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরে আর যাইতে হয় নাই।

আলিপুর ও বিদায়।

—০—

বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে বদলি হইয়া আসিলেন। এইখানে মহামতি বেকার সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ। উভয়ের মধ্যে একটু আধটু সঙ্ঘর্ষণ হইয়াছিল; সে কথা বলা হইয়াছে। (কাহিনী ৭৭ পৃষ্ঠা)।

আলিপুরে যখন বঙ্কিমচন্দ্র অবস্থান করিতেছিলেন তখন এ ক্ষুদ্র লেখক মধ্যে মধ্যে আদালতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার বিচার কার্য্য দেখিয়াছে। দুই একবার বড় বড় কৌন্সিলের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রকে তর্ক বিতর্ক করিতে দেখিয়াছি। একবার হাইকোর্ট হইতে একজন সাহেব ব্যারিষ্টার আসিয়া আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। অপর পক্ষে মিষ্টার টি, পালিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তারক বাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনিতেন; কিন্তু সাহেব আদৌ চিনিতেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, একটা নগন্য নেটিভ

ডিপুটির সম্মুখে অবধানতার সহিত বক্তৃতা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া, হাতমুখ নাড়িয়া নানা ভঙ্গীতে সাক্ষীকে জেরা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি ফিরিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের ললাটে মেঘ উঠিয়াছে—সহাস্য নয়ন জ্বলিয়া উঠিয়াছে—ওষ্ঠ-প্রান্ত কুঞ্চিত হইয়াছে। আমি বুঝিলাম, মেঘ গর্জ্জন না করিয়া ছাড়িবে না। একটু অপেক্ষা করিলাম,—অচিরে অশনিপাত হইল। সাহেব, সাক্ষীকে কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সাক্ষী উত্তর দিবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র সহসা বলিয়া উঠিলেন, "The question is irrelevant—I disallow it."

সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "Irrelevant !"

তারকবাবু বলিলেন; "Certainly irrelevant."

বঙ্কিমচন্দ্র, তারকবাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন, "Don't waste your time on him, Mr. Palit."

এই ক্ষুদ্র কথায় সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল।

কিন্তু আর বাদানুবাদ করিলেন না। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিয়া থাকিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ ক্ষুদ্র কথায় মর্ম্মান্তিক তিরস্কার করিতেন—যেরূপ ক্ষুদ্র কথায় গুরুতর উপদেশ দিতেন, সেরূপ আমি অন্য কাহারও মুখে শুনি নাই। তিনি ক্ষুদ্র কার্য্য দেখিয়া মানুষের বিচার করিতেন—ক্ষুদ্র কথার উপর নির্ভর করিয়া কখন কখন মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ক্ষুদ্র কথায়, ক্ষুদ্র কার্য্যে মানুষকে যতটা চেনা যায়, বড় বড় বক্তৃতায় বা বড় বড় কার্য্যে ততটা চেনা যায় না। বৃহৎ অনুষ্ঠানে মানুষ তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া থাকে—সে তখন প্রস্তুত, সতর্ক।

একবার একটা সামান্য মকদ্দমা তাঁহার আদালতে উঠিয়াছিল। মকদ্দমার বিবরণ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। বাদীপক্ষীয় উকিলের জিজ্ঞাসাবাদে জনৈক সাক্ষী বলিতেছিল, "চেক্ দিতে মুই দেখেছিলাম।" সাক্ষীটা নিরক্ষর ও ইতর জাতীয়। কিন্তু মকদ্দমাটা তাহার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতেছিল। উকিল

মহাতেজে হাকিমকে বলিলেন, "হুজুর, লিখিয়া রাখুন, সাক্ষী চেক্ দিতে দেখিয়াছিল।"

হাকিম কথাটা পরিষ্কার করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ জিনিষ দিতে দেখিয়াছিলে?"

সাক্ষী। হুজুর, চেক্।

হাকিম। কে তোমায় এ কথা শিখাইয়া দিয়াছে?

সাক্ষী। কেহ নয় হুজুর।

হাকিম। চেক্ কা'কে বলে জান?

সাক্ষী উত্তর না করিয়া উকিলের মুখপ্রতি চাহিল। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "চ্যাক্ কা'কে বলে জান?"

সাক্ষী। তা' জানি হুজুর; খাজনা দিলে জমীদার চ্যাক্ দেয়।

হাকিম তখন বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি নিজে মকদ্দমার কিছু জান না, অপরের উপদেশ মত সাক্ষ্য দিতেছ, তোমার মুখ দিয়া চেক্ শব্দ বাহির হ'ত না—তুমি চ্যাক্ বলিতে। এখন সত্য করিয়া বল, কে

তোমায় শিখাইয়া দিয়াছে; নইলে তোমায় ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিব।"

সাক্ষী তখন কাঁদিতে কাঁদিতে উকীল বাবুর নাম করিল। উকীল বাবু কাঁপিতে কাঁপিতে মকদ্দমা উঠাইয়া লইলেন। এইরূপে একটা ক্ষুদ্র কথা, একটা জটিল মকদ্দমা নিষ্পত্তির হেতুভূত হইল। *

বঙ্কিমচন্দ্র যেমনই দক্ষতার সহিত কাজ করুন না কেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত তাঁহার কোনমতে বনিল না। অবশেষে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি পেন্‌সনের দরখাস্ত করিলেন। কিন্তু সে দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল। অগ্রাহ্য হইবারই কথা। তাঁহার বয়স তখন তিপ্পান্ন বৎসর মাত্র। পঞ্চান্নর পূর্ব্বে অবসর লইবার যো নাই। তবে পীড়িত হইলে স্বতন্ত্র কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমূত্র ছাড়া আর কোনও রোগ

* এই মকদ্দমার বিবরণ আড়িয়াদহনিবাসী জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াছি।

ছিল না। দেখিতে তিনি সুস্থকায়, সবল, বলিষ্ঠ। গভর্ণমেণ্ট বঙ্কিমচন্দ্রের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন।

তখন তাঁহার জেদ আরও বাড়িয়া উঠিল। আমি দেখিয়াছি, কোনও ঈপ্সিত কার্য্যে বাধা বা প্রতিবন্ধক পাইলে তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিতেন। যতক্ষণ না সে বাধা তাঁহার পদতলে বিমর্দ্দিত হইত, ততক্ষণ তাঁহার জেদ ও শক্তি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বাড়িতে থাকিত।

গভর্ণমেণ্ট যখন তাঁহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন, তখন তিনি কার্য্য হইতে অপসৃত হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। রোগের ভাণ করিলে সহজেই তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি অসত্য পথ অবলম্বন করিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিন সত্যাশ্রয়ী ছিলেন; আমি কখনও তাঁহাকে কোনও কথা অতিরঞ্জিত করিতে দেখি নাই—এক বর্ণ মিথ্যা বলিতে শুনি নাই। যৌবনে কি করিতেন, তাহা আমি জানি না—জানিবার প্রয়োজনও নাই। আমি একবার রমেশ বাবুর নিকট একটা অসত্য কথা বলিয়াছিলাম। (কাহিনী, ১৯ পৃষ্ঠা)—সে জন্য আমি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট যৎ-

পরোনাস্তি ভৎর্সিত হইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, "এই বয়সেই মিথ্যা কথা শিখিলে, এর পর কি শিখিবে?" সে তীব্র তিরস্কার আজও আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা রহিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র অসত্য পথ অবলম্বন না করিয়া ছোট লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বাঙ্গালার মসনদে তখন ইলিয়ট সাহেব অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী বঙ্কিমচন্দ্রকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। লেডী ইলিয়ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ স্বয়ং অনুবাদ করিয়া পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন।

একদিন অপরাহ্নে বঙ্কিমচন্দ্র লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অভিবাদনান্তে তিনি রাজপ্রতিনিধির নিকট তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন। সকল কথা শুনিয়া লাট সাহেব সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত বঙ্কিমবাবু?"

"তিপ্পান্ন বৎসর।"

এই বয়সেই অবসর লইতে ইচ্ছা কর?

"তেত্রিশ বৎসর চাকরী করিয়া আসিতেছি, আর পারি না।"

"তোমার শরীরে কোনও রোগ আছে?"

"বিশেষ কিছু নাই।"

সাহেব একটু অন্যমনস্ক হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বই লিখিবার জন্য কি অবসর খুঁজিতেছ?"

বঙ্কিমচন্দ্র। কতকটা তাই বটে।

ছোটলাট। উত্তম; আমি তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ছোটলাট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বঙ্কিমবাবু, তুমি তেত্রিশ বৎসর দক্ষতার সহিত চাকরী করিয়া আসিতেছ—গবর্ণমেণ্ট তোমার প্রতি তুষ্ট; তোমার কোনও প্রার্থনা নাই কি?"

বঙ্কিমচন্দ্র ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "না।"

সাহেব। তোমার আত্মীয় স্বজন কাহারও জন্য কোনও অনুগ্রহ (favour) চাহিবার নাই কি?

বঙ্কিমচন্দ্র। সাহেব, আপনি যদি এতই কৃপা-পরবশ, তবে আমার ছোট ভাইকে ডায়মণ্ড-হারবার হইতে আমার নিকটে কোন স্থানে আনিয়া দিন।

সাহেব। এ ত অতি সামান্য কথা; আর কোনও প্রার্থনা নাই কি?

বঙ্কিমচন্দ্র। আপাততঃ নাই।

বলিয়া তিনি বিদায় হইলেন। কয়েক দিন পরে পূর্ণবাবু আলিপুরে বদলী হইয়া আসিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের জন্য কখনও রাজদ্বারে ভিক্ষার্থী হয়েন নাই; আত্মীয় স্বজনের জন্য তিনবার ভিক্ষা চাহিতে হইয়াছিল। একবার জ্যেষ্ঠ জামাতার জন্য; দ্বিতীয়বার, ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্রের জন্য; তৃতীয়বার এ ক্ষুদ্র লেখকের জন্য। অপরের কৃপাপ্রার্থী হইতে তিনি বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পেন্‌সনের দরখাস্ত অবশেষে মঞ্জুর হইল। তেত্রিশ বৎসর এক মাস চাকরী করিবার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্‌টেম্বর অপরাহ্নে চার্জ বুঝাইয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করিলেন।

চারি শত টাকা পেনসন মঞ্জুর হইয়াছিল। দুই বৎসর ছয় মাস তেইশ দিন পেন্‌সন ভোগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র গভর্ণমেণ্টের নিকট বার হাজার টাকার কিছু বেশী পাইয়াছিলেন। তখন পুস্তকের বাৎসরিক আয় অন্যূন ছয় হাজার টাকা।

বঙ্কিম-জীবনী।

তৃতীয় খণ্ড।

জীবনের শেষ তিন বৎসর

অবসর গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যাহা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা করিতে পারেন নাই। এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি একখানিও নূতন পুস্তক লেখেন নাই। কেবল "ঢেঁকি" নামধেয় একটা নূতন প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজন করিয়াছিলেন। আনন্দমঠ, রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয়, কৃষ্ণচরিত্র ও কৃষ্ণকান্তের উইলের এক একটা নূতন সংস্করণ করিয়াছিলেন। রাজসিংহ ও ইন্দিরা বর্ত্তমান আকারে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র পুস্তিকা সঞ্জীবনীসুধা লিখিয়াছিলেন। কবিতা-পুস্তকের নাম গদ্য-পদ্য দিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। একখানি স্কুল-পাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহার নাম—Bengali selections approved by the syndicate of Calcutta university for the Entrance examination, 1895. বিবিধ

প্রবন্ধের একটা নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্র তিন বৎসরের মধ্যে সাহিত্যসেবার্থ আর কিছু করেন নাই।

অবসর লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার নাম, Society for the higher training of young men.—এক্ষণে ইহার নাম University Institute হইয়াছে। এই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। চারিটি তাঁহার গৃহে, দুইটি ইন্‌ষ্টিটিউট মন্দিরে। গৃহে যে কয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা শরীরের উন্নতি সম্বন্ধে; মন্দিরে যে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা উপনিষদ সম্বন্ধীয়। যাঁহারা এই বক্তৃতানিচয় শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই এক্ষণে জীবিত। কিন্তু শেষের দুইটি ছাড়া অন্য বক্তৃতাগুলি মরিয়া গিয়াছে—এক্ষণে তাহা কোথাও পাওয়া যায় না। শেষোক্ত বক্তৃতা দুইটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের University Magazineএ প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাবার্থ পুস্তক-শেষে সন্নিবিষ্ট হইল।

শুনিতে পাই, তিনি আরও একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কোথায় দিয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। বক্তৃতার বিষয় সম্রাট আকবর। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, সম্রাট আকবরের যে মূর্ত্তি ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, সে মূর্ত্তি তাঁহার ছিল না; তিনি হিন্দুদের যতটা সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছেন, ততটা সর্ব্বনাশ দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া কেহ কখনও করেন নাই। এ মতের পোষণার্থ বঙ্কিমচন্দ্র অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। সে সকল কথা আলোচনা করা আজিকার দিনে যুক্তি-যুক্ত নয়।

ঔরঙ্গজেবকে বঙ্কিমচন্দ্র "মহাপাপিষ্ঠ" বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, ঔরঙ্গজেবের ন্যায় "ধূর্ত্ত, কপটাচারী, পাপে সঙ্কোচশূন্য, স্বার্থপর, পরপীড়ক, দুই একজন মাত্র পাওয়া যায়।" * এই ঔরঙ্গজেবকেও বঙ্কিমচন্দ্র আকবরের উপর স্থান দিয়া

---

* রাজসিংহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গিয়াছেন। ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন। সেই অত্যাচার হইতে মহারাষ্ট্র, শিখ ও রাজপুতের জাতীয়তার উৎপত্তি। আজিকার দিনে কেহ কেহ বলেন, লর্ড কর্জ্জন বাঙ্গালীর উপকার করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে একবার কথা উঠিয়াছিল, তাঁহাকে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট করা হইবে। কিন্তু সিভিলিয়ানেরা আপত্তি করায় ছোটলাট সে প্রস্তাব চাপা দিয়াছিলেন। তা'র কয়েক বৎসর পরে—বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক পরে—আবার এ প্রস্তাব উঠিয়াছিল। তখন গোপাল বাবু, পূর্ণ বাবু প্রভৃতি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় সভার (Senate) সভ্য ছিলেন। কিন্তু সভায় বড় একটা যাইতেন না। যখন যাইতেন, তখন তিনি কোন পক্ষে যোগদান না করিয়া স্বাধীনমত ব্যক্ত করিতেন। খোসামোদ কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। জীবনভোর কখনও মানুষের খোসামোদ করেন নাই। মধ্য

বয়সে ভগবানের কিছু কিছু করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে ভগবৎ-চরণে প্রাণ লুটাইয়া দিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কিছু কালের জন্য মাছ মাংস ত্যাগ করিয়া হবিষ্যাশী হইয়াছিলেন। গায়ে নামাবলী দিতেন, শুদ্ধাচারে থাকিতেন, সতত গীতা আবৃত্তি করিতেন। কিন্তু যিনি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মাছমাংস খাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার শরীরে হবিষ্যান্ন সহ্য হইল না। তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তবু তিনি কিছুকাল যুঝিয়াছিলেন; কিন্তু আর পারিলেন না, চিকিৎসকদের উপদেশানুসারে আমিষ আহার আবার ধরিতে হইয়াছিল।

সন্ন্যাসী।

বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি গাড়ী ও দুইটি ঘোড়া ছিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে দৌহিত্রদের লইয়া শকটা-রোহণে বেড়াইতে যাইতেন। ১৩০০ সালের কার্ত্তিক-

মাসে একদিন অপরাহ্নে বেড়াইতে যাইবার জন্য সকলে সাজসজ্জা করিতেছেন, এমন সময় সদর দরজার সম্মুখে রাস্তার উপর একটা গোলমাল উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কাণে সে গোলমাল পৌঁছিল কি না, ঠিক বলিতে পারি না। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারবানের কোনও ত্রুটী ছিল না; পাঁড়েজী দ্বারপথ আগুলিয়া জনৈক সন্ন্যাসীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল। সন্ন্যাসী ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহে, পাঁড়ে তাহাকে কিছুতেই আসিতে দিবে না। সন্ন্যাসী যত বলে, "আমি ভিক্ষা চাহি না, বাবুর সঙ্গে শুধু সাক্ষাৎ করিতে চাহি"—পাঁড়ে তত জোর করিয়া বলে, "বাবুর সঙ্গে এখন কোনমতে 'মোলাকাৎ' হবে না। ফজিরমে আইয়ে—বাবু আভি ঘুম্‌নে যাতে হ্যায়।" সন্ন্যাসী যখন দেখিলেন, পাঁড়েজী কিছুতেই দ্বার ছাড়িবে না, তখন তিনি নিরস্ত হইয়া পথের একধারে বসিলেন। ক্ষণকাল পরে বঙ্কিমচন্দ্র ছেলেদের লইয়া বাহিরে আসিলেন। গাড়ী বড় রাস্তায় (কালেজ ষ্ট্রীট) অপেক্ষা করিতেছিল; গলিটুকু হাঁটিয়া গাড়ীতে উঠিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র

গলির উপর আসিয়া দেখিলেন, এক জন সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণনয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তিনি দৃষ্টির বিনিময়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন। সন্ন্যাসী তখন উঠিলেন; কয়েক হস্ত পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "খাড়া হো।"

বঙ্কিমচন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোম্‌হারা নাম বঙ্কিমচন্দর?"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্মতি জ্ঞাপন করিলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোম্‌হারা ওয়াস্তে ম্যাঁয় নেপালসে আতা হুঁ—লউট্‌কে আও।"

বঙ্কিমচন্দ্র—মহাতেজস্বী বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া বালকের ন্যায় সন্ন্যাসীর আজ্ঞায় ফিরিলেন, এবং সন্ন্যাসীকে সসম্মানে আমন্ত্রণ করিয়া উপরের ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া নাকি সন্ন্যাসী, বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "আমার গুরু নেপালে থাকেন, তিনি তোমার কাছে আমায় পাঠাইয়াছেন। তুমি ও আমি পূর্ব্বজন্মে এক গুরুর মন্ত্র-শিষ্য ছিলাম। আমরা উভয়ে একত্র যোগসাধনা করিয়াছিলাম।

তোমার কর্ম্মফল তোমায় সংসারে টানিয়া আনিল, আমি যোগী হইয়া আবার পূর্ব্বজন্মের গুরুকে পাইলাম।"

সন্ন্যাসীর বয়স বেশী নয়। বেশী না হইলেও তিনি সাধারণ সন্ন্যাসী হইতে অনেক বিভিন্ন। জটা বা বিভূতির ঘটা ছিল না—হাতে সিঁধকাটীর মত চিম্‌টাও ছিল না। প্রফুল্লানন, তেজোদীপ্ত যোগীর কোনও আড়ম্বর ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন. "গুরুদেব আপনাকে পাঠাইয়াছেন কেন?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "সে কথা আর এক দিন বলিব। আজ এই রুদ্রাক্ষটি গ্রহণ কর। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন এই রুদ্রাক্ষকে প্রত্যহ পূজা করিবে। কেমন করিয়া পূজা করিতে হইবে, তাহা আমি বলিয়া দিতেছি।"

সন্ন্যাসী আরও কিছু উপদেশ দিয়া বিদায় হইলেন। বিন্দুমাত্র জলগ্রহণ না করিয়া, কপর্দ্দকমাত্র ভিক্ষা না লইয়া, যোগিবর প্রস্থান করিলেন।

সে রুদ্রাক্ষের পূজা করিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ কখনও দেখে নাই।

তিন মাস পরে সন্ন্যাসী আবার আসিয়াছিলেন। নিদারুণ শীতের সময় একদিন মাঘ মাসের মধ্যাহ্নে আসিয়া দর্শন দিলেন। সে বার কেহ তাঁহার গতিরোধ করিল না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি উপরের বৈঠকখানায় উঠিয়া গেলেন।

তথায় বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন। অন্যান্য দুই চারিটা কথার পর সন্ন্যাসী বলিলেন, "বঙ্কিমচন্দর্, এ দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে, তা' কি বিস্মৃত হয়েছ?"

"না, বিস্মৃত হই নাই।"

"তবে প্রস্তুত হও।"

বঙ্কিমচন্দ্র দৌহিত্রকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। বালক অনিচ্ছাসত্ত্বে কক্ষত্যাগ করিল। তখন তিনি দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট বসিলেন। কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই।

তিনি কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তিন ঘণ্টা (কাহারও মতে ৫।৬ ঘণ্টা) পরে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বার খুলিলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল বিদ্যুৎভরা মেঘের ন্যায় গম্ভীর। খুড়ীমা চমকিত হইলেন; তবু সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতক্ষণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে কি হইতেছিল?"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "রমণ-প্রাপ্তি শিখিতেছিলাম।"

খুড়ীমা কথাটার অর্থ বুঝিলেন না; শুধু বুঝিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে অনিচ্ছুক। বুদ্ধিমতী খুড়ীমা সে কথা আর কখনও তুলেন নাই।

আমি এ সন্ন্যাসীকে দেখি নাই। সে সময় আমি দূরদেশে কর্ম্মস্থলে ছিলাম। পরে খুড়ীমা ও অন্যান্য লোকের মুখে উপাখ্যানটি শুনিয়াছিলাম। রমণ-প্রাপ্তির অর্থ আজও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। সে সন্ন্যাসীর দর্শনও আমরা আর কখনও পাই নাই।

দেহ ত্যাগ।

—*—

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমূত্র রোগের সূত্রপাত হয়। কিন্তু তাহা বাড়িতে পায় নাই—বড় একটা চিকিৎসাও করাইতে হয় নাই। ১৩০০ সালের শীতকালে সহসা রোগ বাড়িয়া উঠিল। খুড়ীমা সভয়ে দেখিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের রাত্রিতে নিদ্রা নাই—মুহুর্মুহুঃ উঠিয়া জল খাইতেছেন ও প্রস্রাব করিতেছেন। তখন তাঁহার চিকিৎসার প্রস্তাব উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "চিকিৎসা করাইতে চাও, কর—আমি তোমাদের মনে কোন আক্ষেপ রাখিতে দিব না।"

চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু রোগের উপশম হওয়া দূরে থাক্, রোগ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। অবশেষে চৈত্র মাসের প্রথমে শয্যা গ্রহণ করিলেন।

বহুমূত্র রোগ স্ফোটক বা ব্রণ উৎপন্ন না করিয়া

ছাড়ে না। এই ব্রণ অধিকাংশ সময়ে সাংঘাতিক হয়। বঙ্কিমচন্দ্রেরও তাই ঘটিল। মূত্রনালীতে ব্রণ বা স্ফোটক দেখা দিল। কেহ বলেন একটি, কেহ বলেন দুইটি ব্রণ হইয়াছিল। অবশেষে তাহাতেই মৃত্যু ঘটিল। (কাহিনী, ৬৪ পৃষ্ঠা)। ১৩০০ সালের ২৬এ চৈত্র রবিবার বেলা ৩টা ২৩ মিনিটের সময় বঙ্কিমচন্দ্র ৫৫ বৎসর ৯ মাস ১৪ দিন বয়সে ক্ষণভঙ্গুর দেহ ত্যাগ করিয়া মহামহিমময় লোকে প্রস্থান করিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার কক্ষে পাঁচ জন লোক উপস্থিত ছিলেন।—বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠা কন্যা, ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। অনেকেই ছুটিয়া আসিলেন। সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ সমাজপতি ও কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয় বড়াল তখন সুরেশ বাবুর বাড়ীতে তাস খেলিতে ছিলেন। তাঁহারা সংবাদ পাইবামাত্র তাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুরেশ বাবুর ছাপাখানা ছিল; তিনি তৎক্ষণাৎ একটা স্লিপ ছাপাইয়া, সহরময় বিলি করিবার জন্য চারি দিকে লোক পাঠাইলেন। সুরেশ বাবু, অক্ষয় বাবু প্রভৃতি অনেকেই শকটারোহণে নগ্নপদে বঙ্কিম-মন্দিরে আসিয়া সমুপস্থিত। সে মন্দির তখন ক্রন্দনরোলে প্রতিধ্বনিত। বন্ধু বান্ধব ও ভক্তবৃন্দ যখন আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন বেলা সাড়ে চারিটা। লোক ক্রমান্বয়ে আসিতে লাগিল; অবশেষে বাড়ীতে গলিতে লোক আর ধরে না।

কিন্তু দেহ লইয়া যাইতে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িল। যাহাকে খাট আনিতে পাঠান হইয়াছিল, সে আর ফিরে না। তাহার সন্ধানে যাহারা গেল, তাহারাও নিরুদ্দেশ হইল। অবশেষে বেলা ৬টার সময় পাঁড়ে এক বৃহৎ খাট আনিয়া উপস্থিত করিল। খাটের উপর উত্তম শয্যা বিস্তৃত হইল। শয্যোপরি পুষ্পরাশি বিকীর্ণ হইল। তার পর—তার পর যে পাঞ্চভৌতিক দেহে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু কালের জন্য বাস করিয়াছিলেন—যে মৃন্ময় ঘট মধ্যে দেবতা এত-

দিন অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, সে ক্ষণভঙ্গুর আধার ত্রিতল হইতে আনীত হইয়া খট্টাঙ্গোপরি রক্ষিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের মুখমণ্ডলে কোনও কষ্ট-চিহ্ন নাই—কোনও বিকার নাই। অপূর্ব্ব শান্তি, চিরপ্রফুল্লতা বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছিল। সে প্রফুল্লতা যেন এ সংসারের নয়,—তিনি যেন জ্ঞানদৃষ্টিতে কোনও অজ্ঞাত রাজ্যের সুখময় ছবি দেখিতে দেখিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়া মৃত বলিয়া মনে হয় নাই, মনে হইয়াছিল, যেন তিনি নিদ্রিত—যেন তিনি সুপ্তাবস্থায় সুখময় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

গগনভেদী হাহাকারের মধ্যে 'অনিন্দ্যজ্যোতি স্বর্ণ-তরু'কে গৃহের বাহিরে আনা হইল। পরে কলেজ ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট দিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। পুরমহিলাদের অনুরোধে ব্রাহ্ম-মন্দিরের সম্মুখে খাট নামান হয়। ব্রাহ্মমহিলারা গবাক্ষ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের দেহ দর্শন করেন। সুরেশবাবু, রাখাল

বাবু প্রভৃতি অনেকেই খাট ধরিয়াছিলেন। খাট হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন—তত জনস্রোত বাড়িতে লাগিল। সুরেশ বাবুর শ্লিপ পড়িয়া অনেকেই তখন বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে যিনি শুনিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের দেহ লইয়া যাওয়া হইতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ যে কোনও একটা দোকানে জুতা খুলিয়া শবদেহের অনুগমন করিতে লাগিলেন। গৃহচূড়া হইতে যিনি এ সংবাদ পাইলেন, তিনি ঝটিতি জুতা খুলিয়া জন-স্রোতে সম্মিলিত হইলেন। যাঁহার পদতল কখনও ধূলিসংশ্লিষ্ট হয় নাই, তিনি গাড়ী ছাড়িয়া নগ্নপদে শবদেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন শব-বাহকেরা হেদুয়ার মোড় ভাঙ্গিয়া বীডন ষ্ট্রীটে পড়িলেন, তখন জন-সংঘ বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। বীডন ষ্ট্রীটে উপেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বসুমতী আফিস তখন বীডন ষ্ট্রীটে। উপেন বাবু একটি মুদির দোকানে জুতা ফেলিয়া শবের অনুগমন করিলেন। থিয়েটারের

সম্মুখে খাট আবার নামান হইল। সে দিন সন্ধ্যাকালে অভিনয়। অনেক লোক অভিনয়-দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ থিয়েটার ছাড়িয়া শবদেহের অনুগমন করিলেন। যখন সকলে নিমতলা ঘাটে পৌঁছিলেন, তখন সহস্র সহস্র ব্যক্তি চারি দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই বিপুলজনতার কলেবর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। কেহ বঙ্কিমচন্দ্রকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইলেন, কেহ প্রণাম করিলেন, কেহ বা পুষ্পোপহার প্রদান করিলেন। সে দৃশ্য মর্ম্মস্পর্শী।

ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালী মৃত সাহিত্যিককে এমন করিয়া আর সম্মান দেখায় নাই। এই তাহার প্রথম আত্ম-সম্মান-বোধ, এই তাহার প্রথম জাতীয় ভাবের উন্মেষ। বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্মান দেখাইয়া বাঙ্গালী আপনাকে সম্মানিত করিল। পশ্চিম-জগতে ফরাসীরা একদিন ভিক্টর হুগোকে সম্মান দেখাইয়া জগতকে শিখাইয়াছিল, কবিকে কিরূপ সম্মান করিতে হয়; আরও শিখাইয়াছিল, যে জাতি সম্মান দেখাইতে জানে, সে জাতি

জগতে সম্মানিত হয়। শুনিয়াছি,* যে পথ দিয়া হুগোর মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হয়, সে পথ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। গাড়ী গাড়ী ফুল আনিয়া পথের উপর ঢালা হইল—বার গাড়ী ফুলের মালা আনিয়া মৃত দেহের চারি দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। গভর্মেণ্ট বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক সমাধির ব্যয়স্বরূপ মঞ্জুর করিলেন। সমাধি দেখিতে মৃতকে সম্মান দেখাইতে ফরাসীগণ সুদূর পল্লী হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সভা-সমিতি হইতে অসংখ্য প্রতিনিধি আসিতে লাগিল। ধনী, দরিদ্র, বৃদ্ধ, রমণী শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া পথের দুই ধারে দাঁড়াইতে লাগিল। মন্ত্রী, কর্ম্মচারী, কবি, মূর্খ, সকলে আসিলেন। পথে যখন আর লোক ধরে না, তখন তাহারা গাছে উঠিল। গাছে যখন আর স্থান সঙ্কুলান হয় না, তখন তাহারা গবাক্ষে, গৃহচূড়ে উঠিল। যখন সেখানেও আর স্থান হইল না, তখন লোকে নদীর উপর নৌকায় উঠিল। নদীবক্ষ নৌকায়

* Smith's life of Victor Hugo.

সমাচ্ছন্ন হইল। কিন্তু তাহাতেও সকলের স্থান সঙ্কুলান হইল না।

এরূপ সম্মান ফরাসীরাই দেখাইতে পারে, ইংরাজেরা পারে না। ইংরাজের সেক্ষপিয়রকে জেলে যাইতে হইয়াছিল—জন্‌সন্‌কে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া চেস্‌টারফিল্ডের দ্বারে আট বৎসর হাঁটাহাঁটি করিতে হইয়াছিল। ফরাসীরা আর একদিন এক জন কবিকে সম্মান দেখাইয়াছিল। কবির নাম—মলিয়ের। অনেকেই তাঁহার নাম শুনিয়া থাকিবেন। তিনি অনেকগুলি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি সেক্ষপীয়ারের নাটক অপেক্ষা কোনও অংশে খাটো নয়। সেই সকল নাটক থিয়েটারে অভিনীত হইত। মলিয়ের পুস্তক লিখিয়া যশ ও অর্থ উভয়ই যথেষ্ট অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মলিয়েরকে প্রসিদ্ধ French Academyর সভ্য করিয়া লইবার জন্য একবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। এই সভার এক শত জন সভ্য; এক শতের কম বা বেশী হইবার নিয়ম ছিল না। যাঁহারা সমগ্র ফরাসী দেশ মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে শ্রেষ্ঠ,

তাঁহারা এই সভার সভ্য হইতে পারিতেন। যখন মলিয়েরকে সভ্য করিয়া লইবার প্রস্তাব উঠিল, তখন অনেক সভ্যই আপত্তি করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "যে ব্যক্তি থিয়েটারে বই লিখিয়া খায়, সে আমাদের একাডেমীর সভ্য হইবার যোগ্য নয়।" এ কথাটি মলিয়েরের কাণে উঠিল; তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর ফরাসীরা বুঝিল, মলিয়ের কত বড় লোক ছিলেন। তাঁহার স্থান পূরণ করিতে যখন ফরাসীদের মধ্যে কেহ রহিল না, তখন তাহারা ব্যগ্র হইয়া মলিয়েরকে সম্মান প্রদর্শন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। যে সভা সভ্যরূপে মলিয়েরকে গ্রহণ করেন নাই, সেই সভা মলিয়েরের প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া সভা-গৃহে স্থাপন করিলেন; এবং সুবৃহৎ প্রস্তরগাত্রে তাঁহাদের অনুতাপ-কাহিনী ক্ষোদিত করিলেন। তা' ছাড়া সভা আর একটা কাজ করিলেন।—সভ্যের সংখ্যা কমাইয়া ৯৯জন করিলেন; এবং মৃত মলিয়েরের প্রতিমূর্ত্তি লইয়া এক শত সদস্য-

সংখ্যার পূরণ করিলেন। আজও সেই সভায় ৯৯ জনের অধিক সভ্য লওয়া হয় না। মলিয়েরের প্রস্তরমূর্ত্তি লইয়া এক শত জন ধরা হয়।

এরূপ সম্মান দেখাইতে বাঙ্গালী আজও শিখে নাই, কিন্তু শিখিতেছে। বাঙ্গালী ফুল আনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের চিতায় ঢালিল—বাঙ্গালী নগ্নপদে শোকবিমর্ষমুখে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে কলিকাতার চারি প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিল—বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের চিতাভস্ম ভক্তিপ্লুতচিত্তে মাথায় ধরিল। বাঙ্গালী কাঁদিল—প্রজ্বলিত চিতার উপর অনেক কাঁদিল।

কাঁদিল, বঙ্কিমচন্দ্রের অকালমৃত্যুর জন্য। যদি তিনি টলষ্টয় অথবা টেনিসনের পরমায়ু ভোগ করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যসৌধকে আরও বিশোভিত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় বাঙ্গালীর হৃদয়ে এতটা আঘাত লাগিত না। কিন্তু জ্বালাময়ী প্রতিভা লইয়া বাঙ্গালায় যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ত বেশীদিন এ জগতে থাকিতে পারেন না। ঈশ্বরগুপ্ত ৪৬ বৎসর, কেশবচন্দ্র ৪৬ বৎসর, কৃষ্ণদাস পাল ৪৬ বৎসর,

মধুস্থদন দত্ত ৫০ বৎসর, দীনবন্ধু মিত্র ৪৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যে বয়স য়ুরোপীয় কবিগণের মধ্যাহ্নকাল, সে বয়স বঙ্গকবিগণের সন্ধ্যা। বাঙ্গালী তা'র ক্ষুদ্র জীবনে কয়খানা পুস্তক লিখিয়া যাইতে পারে? এক জন সামান্যা ইংরাজ-মহিলা (Mrs. Sherwood) যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, কোনও বাঙ্গালী তাহার অর্দ্ধেকও লিখিতে পারেন নাই—লিখিবার অবসরও পান নাই।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দকে আমরা যেমন হাসিতে হাসিতে আহ্বান করিয়াছিলাম, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দকে আমরা তেমনই কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় দিয়াছিলাম। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আমরা কেশবচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কৃষ্ণদাস ও বঙ্কিমচন্দ্রকে পাইয়াছিলাম; ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমরা ভূদেবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রকে হারাইলাম।

তবে যাও বঙ্কিম, ভারত-জননীর চরণপ্রান্তে প্রণাম করিয়া—ভারতবাসীর আশীর্ব্বাদ মাথায় ধরিয়া অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় লোকে যাও। 'শুভ্র জ্যোৎস্না' তোমার মাথার উপর চন্দ্রাতপ ধরিবে—'মলয়জশীতল' সমীর

তোমায় বীজন করিতে থাকিবে—'ফুল্লকুসুমিত দ্রুম-দল' তোমার মস্তকে আশীর্ব্বাদস্বরূপ ফুল্লকুসুমদাম বর্ষণ করিবে। ওই দেখ, যাঁহার চরণে তুমি 'বিদ্যা, ধর্ম্ম, হৃদি মর্ম্ম' উৎসর্গ করিয়াছ, তিনি অশ্রুভারাকুল-লোচনে বিজয়মাল্যহস্তে তোমায় বিদায় দিতে আসিয়াছেন। পার্শ্বে সলিলবিপুলা জ্ঞান-প্রবাহিনী জাহ্নবী, তোমার চিতাভস্ম সযত্নে বক্ষে ধরিয়া অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতে ছুটিয়াছেন। ওই দেখ, স্বর্গ হইতে তোমার মানসপুত্রকন্যাগণ পুষ্পচন্দনহস্তে তোমার চরণপূজা করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। ওই শুন, প্রফুল্ল আসিয়া বলিতেছে, "বাবা, আমি তোমার নিকট নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিয়া এক্ষণে অক্ষয় স্বর্গের অধি-কারিণী হইয়াছি; এক্ষণে তোমাকে সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় লোকে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বনিয়ন্তা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। এস বাবা, তোমার সৃষ্টরাজ্যে, এস বাবা, তোমার সৃষ্ট লোকে, যেখানে বাক্যই অবতার—যেখানে যুগে যুগে মাসে মাসে পলে পলে, ধর্ম্মসংস্থাপ-নার্থ মহাবাক্য জন্মগ্রহণ করিতেছে, সেই মহৈশ্বর্য্যময়

লোকে এস।” ওই শুন, বীরকুলশেখর প্রতাপ বলিতেছে, “পিতা, আমি তোমার নিকট চিত্তসংযম শিখিয়া যে সুখময় রাজ্যের অধিকারী হইয়াছি, সে রাজ্যে লক্ষ শৈবলিনী নিয়ত আমার পদসেবা করিতেছে—কোটী রূপসী আমার পদতলে গড়াগড়ি যাইতেছে। এস পিতা, তোমার সৃষ্ট রাজ্যে—যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য—যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে এস।”

যাও—কিন্তু আবার আসিও। বাঙ্গালী যখন ‘সপ্তকোটীকণ্ঠে কলকল নিনাদে’ তোমায় ডাকিবে, তখন আবার আসিও—বাঙ্গালায় আবার অবতীর্ণ হইও।

জন্ম-কুণ্ডলী।
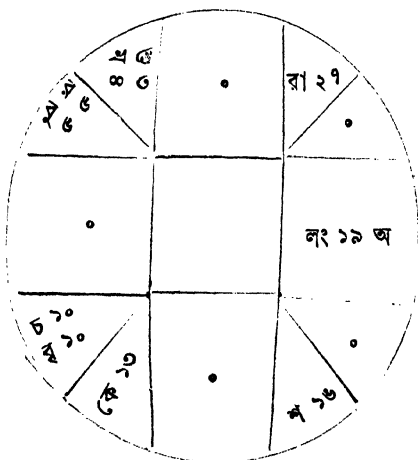
গ্রহস্ফুট ১৮।১৫।১১।২৬

জন্মলগ্ন শকাব্দ ১৭৬১। ২।১২

মৃত্যু ৫৫। ৯।১৪

পঞ্চান্ন বৎসর, নয় মাস, ১৪ দিন বয়সে মৃত্যু।

যোগঃ—বুধাদিত্য যোগ। নবমাধিপতি বুধ ও দশমাধিপতি শুক্র স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া স্বগৃহে অবস্থান

করিতেছেন। সুখাধিপতি ও কর্ম্মাধিপতি শুক্র পঞ্চমে কোণে অবস্থান করিতেছেন। ফল ঃ—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সুখ, বিদ্যা, মান, যশ।

রাহুর দশায় বৃহস্পতির অন্তর্দশায় মৃত্যু অনিবার্য্য।

উপাধি

—*—

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের নববর্ষ উপলক্ষে "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ উপাধি তাঁহার ভূষণ না হইয়া কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছিল। সকলেই স্বীকার করিবেন, এ উপাধি বঙ্কিমচন্দ্রের উপযুক্ত হয় নাই। যে উপাধি পুলিস-ইন্‌স্পেক্টার বা মাইনর স্কুলের শিক্ষক পায়, সে উপাধি বঙ্কিমচন্দ্রের উপযুক্ত হইতে পারে না। সে সময় এ বিষয় লইয়া একটু গোলযোগ উঠিয়াছিল। কোনও ব্যক্তি, কোনও সাময়িক পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। *

* লেখক—বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ; পত্র—'সাহিত্য', ১২৯৯ সাল, শ্রাবণ সংখ্যা।

প্রবন্ধের নাম—‘উপাধি-উৎপাত।’ আমি তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

“সে দিনকার উপাধিসত্র মনে পড়ে। বেল-ভেডিয়ারে সভাগৃহে দরবার বসিয়াছে। মহারাজা বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, নবাব বাহাদুর, রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর খিলাতের আশায় বসিয়া আছেন। বঙ্গাধিপ বক্তৃতা করিলেন, উপাধি-ধারীদিগের সুখ্যাতি করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। লোকের দৃষ্টি সমবেত মণ্ডলীর মধ্যে এক জনের উপর পড়িল। তিনি আর কেহ নহেন—রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর। অত রাজা, মহারাজা, নবাব থাকিতে, এক জন রায় বাহাদুরের প্রতি সকলের যে নজর পড়িল, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। রাজপ্রসাদে মানুষ ধন্য হয় না—নিজগুণে ধন্য হয়, এ কথা আমরাও—উপাধি-লোভী জাতি জানি। যদি কখন আমাদের জাতীয়-গৌরব হয়, যদি কখন আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে অপর জাতিকে প্রদর্শন করিবার উপযুক্ত রত্ন সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃভূমিকে লোকে

স্বর্ণগর্ভা বলিবে। ততদিনে রাজা মহারাজা নবাবের দল কে কোথায় বিস্মৃতিসাগরে তলাইয়া ডুবিয়া যাইবে, কে বলিতে পারে? এই কথা বুঝিতে পারিয়া সকলে বলিয়াছিল যে, 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিয়া বঙ্কিম বাবুর প্রতি অবমাননা প্রকাশ করা হইল।

"আর এক দিনের কথা মনে পড়ে। বিতণ্ডা প্রিয়, গর্ব্বিত পাদ্‌রী হেষ্টী, ছদ্মনামধারী বঙ্কিম বাবুর রচনা ও তর্ককৌশলে বিস্মিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিল, ইয়োরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। তখন বঙ্কিম বাবু সদর্পে বলিয়াছিলেন যে, তিনি সে সম্মানের প্রার্থী নহেন,স্বজাতির সুখ্যাতিই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট সম্মান।

"ইংরাজ রাজার নিকট তিনি এরূপ তেজের কথা বলিতে পারেন না, কারণ তিনি ইংরাজের কর্ম্মচারী। কিন্তু যদি তিনি বুঝাইয়া মিনতি করিয়া কহিতেন, 'দোহাই তোমাদের! তোমাদের কর্ম্ম করিয়াছি, তোমরা আমার বেতন দিয়াছে। কর্ম্মত্যাগ করিয়াছি,

এখন পেন্‌সন দিতেছ। আমার মাথায় উপাধি চাপাইয়া আর আমায় বিড়ম্বিত করিও না।' তাহা হইলে হয় ত তিনি রেহাই পাইতেন, নগণ্য রাজা মহারাজা রায় বাহাদুরদিগের সমভিব্যাহারে রাজদ্বারস্থ হইতে হইত না। যদি এ কথা প্রকাশ পাইত যে, বঙ্কিম বাবু 'রায় বাহাদুর' উপাধিগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা হইলে আজ সে কথা লইয়া আমরা স্পর্দ্ধা করিতে পারিতাম।"

ইহার কিছু দিন বাদে 'সাহিত্য'-সম্পাদক এক খানি 'বিশ্বস্ত' পত্র পাইলেন। সে পত্রের মর্ম্ম সকলকে জানাইয়া তিনি বলিলেন যে, "নিজে উপাধির প্রার্থী হওয়া দূরে থাক্, গেজেটে উপাধির তালিকা মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু এ সম্বন্ধে বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারেন নাই।" এই পত্র বঙ্কিম-চন্দ্র স্বয়ং লিখিয়া ছিলেন। সুতরাং অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের নববর্ষে বঙ্কিমচন্দ্র সি আই ই উপাধি পাইলেন। Investiture দরবার হইল, ২১এ

মার্চ। বঙ্কিমচন্দ্র তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সুতরাং তিনি দরবারে যাইতে পারেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন ঃ—"তখনও কিন্তু আমি বঙ্কিমবাবুকে দেখি নাই। না দেখিলে সকলে যাহা করিয়া থাকে আমিও তাহা করিতাম। মনে মনে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এমন কেহ কেহ আমাকে বলিতেন, 'বঙ্কিমের চেহারায় বুদ্ধি যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।' কিন্তু তাঁহাকে যখন দেখিলাম তখন আমার কল্পিত মূর্ত্তি লজ্জায় কোথায় লুকাইয়া পড়িল তাহার ঠিকানা রহিল না। ২২ কি ২৩ বৎসর হইল কলিকাতায় কালেজ রিইউনিয়ন নামে ইংরাজীওয়ালাদের একটা বাৎসরিক উৎসব হইত। * * আমি ঐ কালেজ রিইউনিয়নে যাইতাম। যাইতাম— কৃষ্ণ বন্দ্যো, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচরণ, প্যারীচাঁদ,

রামশঙ্কর, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় আমিও একজন কালেজোত্তীর্ণ—আমিও তাঁহাদের সমান, এই শ্লাঘার ভরে। এবং আমার বিশ্বাস অনেকেই আমার ন্যায় শ্লাঘার ভরে যাইতেন—সদ্ভাবসৃষ্টির বা বন্ধুত্ব-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষী হইয়া কেহ যাইতেন না। কিন্তু ও সব কথা এখন থাক। আমি দ্বিতীয় কালেজ রিইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলাম। সম্পাদক হইয়াছিলেন, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মরকতকুঞ্জ নামক প্রসিদ্ধ উদ্যানে সেবারকার উৎসব হয়। অভ্যাগত-দিগের অভ্যর্থনা করিতেছি, এমন সময় একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যে প্রকার অভ্যর্থনা করিতেছিলাম বিদ্যুতকেও সেই প্রকারে অভ্যর্থনা করিলাম বটে। কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে? শুনিলাম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম—আমি জানিতাম্ না, আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আর একবার করমর্দ্দন

করিতে পাইব কি? সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমবাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম, হাত উষ্ণ। সে উষ্ণতা এখনও আমার হাতে লাগিয়া আছে। সে হাত পুড়িয়া যায় নাই—আমার হাতের ভিতরেই আছে। যে ভালবাসাইয়া যায়, আগুনে তাহাকে পুড়াইতে পারে না।"*

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন ঃ—"সে দিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়্যুনিয়ন নামক মিলনসভা বসিয়াছিল। ঠিক কত দিনের কথা ভাল স্মরণ নাই, কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সে দিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুক-প্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ়পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র

* প্রদীপ, প্রথম ভাগ।

এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সে দিন আর কাহারো পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী এক সঙ্গেই কৌতুহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান পাইয়া জানিলাম, তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিত-দর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিম বাবু।" *

অবরোধ-প্রথা।

অবরোধ-প্রথা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য প্রবন্ধে কিছু বলিয়া গিয়াছেন। আমি নিম্নে একটু তুলিয়া দিলাম।

"স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখায় অপেক্ষা, নিষ্ঠুর, জঘন্য, অধর্ম্মপ্রসূত, বৈষম্য আর

* সাধনা।

কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গ মর্ত্ত্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক যাহা কিছু জগতে ভাল আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে। কেন? হুকুম পুরুষের।

"এই প্রথার ন্যায়বিরুদ্ধতা এবং অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এক্ষণে স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ অমর্য্যাদার ভয়। আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, অন্যে চর্ম্মচক্ষে দেখিবে! কি অপমান! কি লজ্জা! আর তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশ্বালয়ে বদ্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই? কিছু লজ্জা নাই? যদি না থাকে, তবে তোমার মানাপমান বোধ দেখিয়া আমি লজ্জায় মরি।

"জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অনুরোধে, তাহাদিগের উপর পীড়ন করিবার তোমার

কি অধিকার? তাহারা কি তোমারই মানরক্ষার জন্য, তোমারই তৈজসপত্রাদি মধ্যে গণ্য হইবার জন্য, দেহ ধারণ করিয়াছিল? তোমার মান অপমান সব, তাহাদের সুখ দুঃখ কিছু নহে?" * * *

এ প্রবন্ধের অনুমোদন করিতে পারি না— পরাধীন বাঙ্গালী পারিবেও না। যে জাতির পুরুষেরা আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ, সে জাতি কেমন করিয়া স্ত্রীকন্যার হাত ধরিয়া গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে যাইবে? বাঙ্গালা যখন স্বাধীন ছিল, তখন বাঙ্গালায় অবরোধ-প্রথা ছিল না। যে দিন মুসলমান বাঙ্গালায় প্রবেশ করিল, সে দিন বাধ্য হইয়া হিন্দুললনারা গৃহমধ্যে লুকাইল। সাত শত বর্ষ পূর্ব্বে যে কারণ বর্ত্তমান ছিল, আজ কি সে কারণ অন্তর্হিত হইয়াছে?

সাম্য।

—০—

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮০ সালের বঙ্গ-দর্শনে 'সাম্য' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি তা'র পর এক-বারমাত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া যে অবশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা আমার মনে হয় না। প্রবন্ধের ভাষা, ভাব, লিপিচাতুর্য্য অতি সুন্দর। আমার বিশ্বাস, বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত বয়সে বুঝিয়াছিলেন যে, এরূপ প্রবন্ধে সমা-জের ক্ষতি হইতে পারে। আমি কোনও কোনও স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"সংসার বৈষম্য পরিপূর্ণ। রাম এ দেশে না জন্মিয়া ও দেশে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল; রাম পাঁচির গর্ভে না জন্মিয়া জাদীর গর্ভে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল। তোমার অপেক্ষা আমি কথায় পটু, বা আমার শক্তি অধিক,

বা আমি বঞ্চনায় দক্ষ,—এ সকলই সামাজিক বৈষম্যের কারণ।

"রাম বড় লোক, যদু ছোটলোক কিসে? যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্ব্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু ছোট লোক; রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া, ধন সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড় লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাঁহার প্রপিতামহ চৌর্য্য বঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন; মুনিবের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র, সুতরাং সে বড় লোক। যদুর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার খাইয়াছে—সুতরাং সে ছোট লোক। অথবা রাম কোন বঞ্চকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে বড় লোক। রামের মাহাত্ম্যের উপর পুষ্প বৃষ্টি কর।

"বৈষম্য সাংসারিক নিয়ম। জগতের সকল পদার্থেই বৈষম্য। ব্রাহ্মণ শূদ্রে অপ্রাকৃত বৈষম্য। ব্রাহ্মণ-বধে গুরু পাপ, শূদ্র-বধে লঘু পাপ, ইহা প্রাকৃতিক

নিয়মানুকৃত নহে। ব্রাহ্মণ অবধ্য, শূদ্র বধ্য কেন? শূদ্রই দাতা, ব্রাহ্মণই কেবল গৃহীতা কেন? তৎপরিবর্ত্তে যাহার দিবার শক্তি আছে সেই দাতা, যাহার প্রয়োজন সেই গৃহীতা, এ বিধি হয় নাই কেন?

"সর্ব্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। তাহার ফলে কোথাও কোথাও দুই এক জন লোক টাকার খরচ খুঁজিয়া পায়েন না—কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতেছে।

"আমেরিকার চিরদাসত্বের উচ্ছেদ জন্য সে দিন ঘোরতর আভ্যন্তরিক সমর হইয়া গেল—অস্ত্রাঘাতে ক্ষতচিকিৎসার ন্যায় সামাজিক অনিষ্টের দ্বারা সামাজিক ইষ্ট সাধন করিতে হইল, এই চিকিৎসার বড় ডাক্তার দাঁতো এবং রোবস্পীর। বৈষম্যের পরিবর্ত্তে সাম্যসংস্থাপনই প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসিস্ বিপ্লবের উদ্দেশ্য।

"কিন্তু সর্ব্বত্র এই কঠোর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই। অধিকাংশ দেশেই উপদেষ্টার উপদেশেই সাম্য আদৃত এবং সংস্থাপিত হইয়াছে। অস্ত্রবল অপেক্ষা

বাক্যবল গুরুতর—সমরাপেক্ষা শিক্ষা অধিকতর ফলোপধায়িনী। খৃষ্ট ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম, বাক্যে প্রচারিত হয়—ইস্‌লামের ধর্ম্ম, শস্ত্র-সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীতে মুসলমান অল্পসংখ্যক—বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয়ানই অধিক।

পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। বহুকালান্তর তিন দেশে তিন জন মহাশুদ্ধাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে মঙ্গলময় এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই মহামন্ত্রের স্থূল মর্ম্ম, মনুষ্য সকলেই সমান। এই স্বর্গীয় মহাপবিত্র বাক্য ভূমণ্ডলে প্রচার করিয়া, তাঁহারা জগতে সভ্যতা এবং উন্নতির বীজ বপন করিয়াছিলেন। যখনই মনুষ্যজাতি দুর্দ্দশাপন্ন, অবনতির পথারূঢ় হইয়াছে, তখনই এক মহাত্মা মহাশব্দে কহিয়াছেন, 'তোমরা সকলেই সমান—পরস্পর সমান ব্যবহার কর।' তখনই দুর্দ্দশা ঘুচিয়া সুদশা হইয়াছে, অবনতি ঘুচিয়া উন্নতি হইয়াছে।

"প্রথম, শাক্য সিংহ বুদ্ধদেব। যখন বৈদিক ধর্ম্ম সঞ্জাত বৈষম্যে ভারতবর্ষ পীড়িত, তখন ইনি জন্ম গ্রহণ

করিয়া ভারতবর্ষ উদ্ধার করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালিক বর্ণ-বৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। অন্য বর্ণ অবস্থানুসারে বধ্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ শত অপরাধেও অবধ্য। ব্রাহ্মণে তোমার সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট করুক। তুমি ব্রাহ্মণের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া তাঁহার চরণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কর—কিন্তু শূদ্র অস্পৃশ্য, শূদ্রস্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত অব্যবহার্য্য। জীবনের জীবন যে বিদ্যা, তাহাতে তাহার অধিকার নাই। * *

"এই গুরুতর বর্ণ-বৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল। সকল উন্নতির মূল জ্ঞানোন্নতি। পশ্বাদিবৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ভিন্ন পৃথিবীর এমন কোন একটি সুখ তুমি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারিবে না, যাহার মূল জ্ঞানোন্নতি নহে। বর্ণ-বৈষম্যে জ্ঞানোন্নতির পথ রোধ হইল। শূদ্র জ্ঞানালোচনার অধিকারী নহে, একমাত্র ব্রাহ্মণ তাহার অধিকারী। ভারতবর্ষের

অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণেতর বর্ণ। অতএব অধিকাংশ লোক মূর্খ হইল। * *

"লোক বিষণ্ণ, ব্যস্ত, শঙ্কিত হইল। ব্রাহ্মণেরা লেখেন সকল কাজেই পাপ—সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত কঠিন। তবে কি বিপ্রেতর বর্ণের পাপ হইতে মুক্তি নাই—পারত্রিক সুখ কি এতই দুর্লভ? লোক কোথায় যাইবে? কি করিবে? এ ধর্ম্মশাস্ত্র পীড়া হইতে কে উদ্ধার করিবে? সর্ব্বসুখ নিরোধকারী ব্রাহ্মণের হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? ভারতবাসীকে কে জীবন দান করিবে?

"তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ অনন্তকাল স্থায়ী মহিমা বিস্তার পূর্ব্বক, ভারতাকাশে উদিত হইয়া, দিগন্ত প্রধাবিত রবে বলিলেন, 'আমি এ উদ্ধার করিব। আমি তোমাদিগের উদ্ধারের বীজ মন্ত্র বলিয়া দিতেছি, তোমরা সেই মন্ত্র সাধন কর। তোমরা সবেই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই সমান। সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণ-বৈষম্য মিথ্যা, যাগ যজ্ঞ মিথ্যা। বেদ

মিথ্যা, স্বত্র মিথ্যা, ঐহিক সুখ মিথ্যা। কে রাজা, কে প্রজা, সব মিথ্যা। ধর্ম্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলেই সত্য ধর্ম্ম পালন কর। * *

"দ্বিতীয় সাম্যাবতার যীশুখৃষ্ট। * * তিনি বলিয়াছিলেন, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। সকল মনুষ্যই ঈশ্বর সমক্ষে তুল্য। বরং যে পীড়িত, দুঃখী, কাতর, সেই ঈশ্বরের অধিক প্রিয়।" * *

তার পর যে স্বার্থত্যাগী নিষ্কাম মহাবীরের গুরুতর আঘাতে ফরাসী রাজ্য ও রাজ্যশাসনপ্রণালী ভগ্নমূল হইল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই মহাপুরুষ রুসোকে তৃতীয় সাম্যাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রুসোর সাম্যনীতির আমি আর কোনও উল্লেখ করিলাম না। যাঁহার Le contrat Social গ্রন্থ পড়িয়া ফরাসীগণ ক্ষিপ্ত হইয়া রাজাকে মারিতে খড়্গ উঠাইয়াছিল, তাঁহার বা তাঁহার গ্রন্থোল্লিখিত সাম্য-নীতির কোনও পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি না।

আমার বিবেচনায় বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, সকল বিষয়ে সাম্যনীতি অবলম্বিত হইতে পারে না—

ঈশ্বরেরও তা' ঈপ্সিত নয়। বিপর্য্যয় না ঘটিলে অবতারহইতে পারে না—প্রজা না থাকিলে রাজা হইতে পারে না। দুঃখ না থাকিলে সুখ থাকিতে পারে না।

বহুবিবাহ।

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয়। তারানাথ তর্ক বাচস্পতি প্রমুখ কয়েক জন পণ্ডিত বলিলেন, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তিকা সমালোচনা-কালে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম ঃ—*

"বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জ্জনীয়, এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এ

* বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা।

দেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, এ দেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বলিবে, 'বহুবিবাহ অতি সুপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে।' * *

"এই বাঙ্গালায় এক কোটী আশী লক্ষ হিন্দু বাস করে; ইহার মধ্যে আঠারশত জন ব্যক্তিও যে অধিবেদনপরায়ণ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে এক জনও অধিবেদনপরায়ণ কি না সন্দেহ। এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন কমিতেছে, স্বতই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না—কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না—আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে।

"কিন্তু এই বহুবিবাহরূপ রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ষু হইলেও বধ্য। আমরা দেখি-

য়াছি, এক এক জন বীরপুরুষ, মৃতসর্প বা মৃত কুক্কুর দেখিলেই তাহার উপর দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যান, কি জানি যদি ভাল করিয়া না মরিয়া থাকে। আমা-দিগের বিবেচনায় ইঁহারা বড় সাবধান ও পরোপ-কারী। যিনি এই মমূর্ষু রাক্ষসের মত্যুকালে দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সগ্দতি প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

"যে কয়েকটি কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি।

১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন।

২। বহুবিবাহ এদেশে স্বতই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভা-বনা; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।

৩। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তথাপি ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোন ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না।

৪। আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবা-রণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ, আইনের আবশ্যকতা আছে ইহা স্থির হয়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।"

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা গুলি বলিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা দেখিতেছি, বহু-বিবাহ স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিয়াছে, ক্বচিৎ কখন শুনিতে পাই, কোনও কুলীনব্রাহ্মণ পাঁচ সাতটি বিবাহ করিয়াছেন। তবে কেহ কেহ সখ্ করিয়া পুত্রার্থে অথবা রিপুচরিতার্থ করিবার জন্য দুইটা বিবাহ করেন। কিন্তু সে দৃষ্টান্ত বিরল। আইন সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইল না—অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হইল না, বহুবিবাহরূপ রাক্ষস বাঙ্গালা হইতে বিদূরিত হইল। কিন্তু বহু দূর যায় নাই—যাইতে যাইতেও এক একবার পিছনে ফিরিয়া দেখিতেছে।

স্ত্রী-শিক্ষা।

:*:—

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়া গিয়াছেন *, নিম্নে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"সকলেই এখন স্বীকার করেন, কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল। কিন্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে না? যাঁহারা, পুত্রটি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই কন্যাটী কথামালা সমাপ্ত করিলেই চরিতার্থ হন। কন্যাটিও কেন যে পুত্রের ন্যায় এম, এ পাশ করিবে না, এ প্রশ্ন বারেকমাত্রও মনে স্থান দেন না।

"বাস্তবিক বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বলিলেও হয়, স্ত্রীগণকে পুরুষের মত লেখাপড়া শিখাইবার উপায়

---

* বঙ্গদর্শন—চতুর্থ খণ্ড।

নাই। বঙ্গবাসিগণ যদি স্ত্রীশিক্ষায় যথার্থ অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইত।

"সেই উপায় দ্বিবিধ। প্রথম, স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক্ বিদ্যালয়—দ্বিতীয় পুরুষ-বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণের শিক্ষা।

"দ্বিতীয়টির নাম মাত্রে বঙ্গবাসিগণ জ্বলিয়া উঠিবেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহে মনে বিবেচনা করিবেন যে, পুরুষের বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই কন্যাগণ বারাঙ্গনাবৎ আচরণ করিবে। মেয়েগুলাত অধঃপাতে যাইবেই; বেশীর ভাগ ছেলেগুলাও যথেচ্ছাচারী হইবে।

" * * *

"স্ত্রী-শিক্ষা বিধেয় কি না? বোধ হয় সকলেই বলিবেন—'বিধেয় বটে'।

"তার পর জিজ্ঞাসা কেন বিধেয়? কেহ বলিবেন না যে চাকরীর জন্য। বোধ হয় এতদ্দেশীয় সচরাচর সুশিক্ষিত লোকে উত্তর দিবেন, যে স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা জ্ঞানোপার্জ্জন এবং বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখা পড়া শিখান উচিত।"

আমি যদি এক্ষণে স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে যাই, তাহা হইলে অনেকেই আমার উপর খড়্গহস্ত হইবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে দেশের মেয়ের বিবাহকাল আট হইতে বার বৎসর, সে দেশের মেয়ে কখন্ বিদ্যাশিক্ষা করিবে? সে কি স্বামীর সঙ্গে বই বগলে করিয়া বিদ্যালয়ে যাইবে?—না, ছেলে কোলে করিয়া, অথবা বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীর ঘাড়ে, ছেলে ও সংসার ফেলিয়া কালেজে যাইবে?

আর এক কথা; আমাদের দেশের বালিকার এগার বৎসর বয়সে যে সব স্ত্রীলক্ষণ প্রকাশ পায়, শীতপ্রধান দেশের মেয়েদের আঠার বৎসর বয়সেও তা' প্রকাশ পায় না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মেয়েরা আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, অথবা বিবাহকাল পর্য্যন্ত কালেজে যাইতে পারেন; কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা তা' পারে না। আগে আমাদের দেশের স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হউক—বাল্য-বিবাহ রহিত হউক—শীত প্রধান দেশের মেয়েদের ন্যায় স্ত্রীলক্ষণ অধিক বয়সে প্রকটিত হউক; তার পর আমরা মেয়েদের

কালেজে পাঠাইব। যতদিন না তা' হয়, ততদিন আমাদের মেয়েরা যেমন শ্বাশুড়ী ও স্বামীর নিকট রামায়ণ মহাভারত, অথবা নাটক নভেল পড়িয়া আসিতেছে, তেমনই পড়িতে থাকুক—এম, এ পাশে কাজ নাই।

বিধবা-বিবাহ।*

—*—

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রায়ঃ—

"বিধবা-বিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্রস্বভাববিশিষ্টা স্নেহময়ী

* বঙ্গদর্শন—চতুর্থখণ্ড—৩০৬ পৃষ্ঠা।

সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না।
কিন্তু যদি কোন বিধবা হিন্দুই হউন, অথবা যে জাতীয়া
হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃ পরিণয়ে ইচ্ছাবতী
হয়েন তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি
পুরুষ পত্নীবিয়োগেরপর পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী
হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর
অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্ব্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী।
এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, 'যদি' পুরুষ পুনর্ব্বিবাহে
অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণী; কিন্তু পুরুষেরই
কি স্ত্রী-বিয়োগান্তে দ্বিতীয়বার বিবাহ উচিত? উচিত,
অনুচিত স্বতন্ত্র কথা; ইহাতে ঔচিত্যানৈচিত্য কিছুই
নাই। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে যে,
যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্য্যমাত্রই প্রবৃত্তি
অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নী-বিযুক্ত পতি
এবং পতি-বিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃ পরিণয়ে
উভয়ই অধিকারী বটে।

"অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে, কিন্তু
এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এ দেশে সচরাচর স্বীকৃত

হয় নাই। যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্য্যে পরিণত করেন না। যিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের ভয়। তবেই এই নীতি সমাজে প্রবেশ করে নাই। অন্যান্য সাম্যাত্মক নীতি সমাজে প্রবিষ্ট না হওয়ার কারণ বুঝা যায়, বিধানের কর্ত্তা পুরুষ জাতি সে সকলের প্রচলনে আপনাদিগকে অনিষ্টগ্রস্ত বোধ করেন, কিন্তু এই নীতি এ সমাজে কেন প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা তত সহজে বুঝা যায় না। ইহা আয়াসসাধ্য নহে, কাহারও অনিষ্টকর নহে, এবং অনেকের সুখবৃদ্ধিকর। তথাপি ইহা সমাজে পরিগৃহীত হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তাই বোধ হয়।

"আর একটি কথা আছে। অনেকে মনে করেন,

যে চির বৈধব্য বন্ধনে, হিন্দু মহিলাদিগের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে। হিন্দু স্ত্রীমাত্রেই জানেন যে, তাঁহার এই এক স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই সকল সুখ যাইবে, অতএব তিনি স্বামীর প্রতি অনন্ত ভক্তিমতী, এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এই জন্যই হিন্দুগৃহে দাম্পত্যসুখের এত আধিক্য। কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে মৃতভার্য্য পুরুষের চির-পত্নীহীনতা বিধান করা না হয় কেন? তুমি মরিলে তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, তোমারও আর গতি হইবে না। যদি এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হও। এবং দাম্পত্য সুখ গার্হস্থ্য সুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন?

"তুমি বিধানকর্ত্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ

দৌরাত্ম্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে, এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর, এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ বৈষম্য।"

বৈষম্য ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র আর কোনও যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। সমাজের ভয়ের কথা, ইঙ্গিতে একটু বলিয়া গিয়াছেন। আমরাও বলি, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও, সমাজ যতদিন না তাহার অনুমোদন করে, ততদিন বিধবাবিবাহ বাঙ্গলায় বা ভারতবর্ষে চলিবে না।

বঙ্গদর্শন

১২৭৭ সাল হইতে বঙ্কিমচন্দ্র একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে ১২৭৮ সালের শেষ-ভাগে সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া লইয়া এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। বিজ্ঞাপনে কয়েক জন লেখকের নাম ছিল; যথা—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র।
" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
" জগদীশনাথ রায়।
" তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
" কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।
" রামদাস সেন।
এবং " অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

১২৭৯ সালের বৈশাখ হইতে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। ছাপা হইতে লাগিল, ভবানীপুরের সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে। প্রকাশক হইলেন, খৃষ্টান ব্রজমাধব বসু।

প্রথম সংখ্যা এক সহস্র ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে আটটি প্রবন্ধ ছিল যথা,—

(১) পত্র-সূচনা।
(২) ভারত-কলঙ্ক।
(৩) কামিনী কুসুম।
(৪) বিষবৃক্ষ।
(৫) আমরা বড় লোক।

(৬) সঙ্গীত।

(৭) ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল।

এই আটটি প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চারিটি লিখিলেন। পত্রসূচনাটি অতি সুন্দর, নিম্নে প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয়, কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদের রচনা-পাঠে বিমুখ। ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখকমাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য, নয় ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি?

সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুল জবাব কেন দিব ?

ইংরাজি-ভক্তদিগের এইরূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের 'ভাষায়' যেরূপ শ্রদ্ধা তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা 'বিষয়ী লোক' তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহিপড়া আর নিমন্ত্রণ রাখিবার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ পৌরকন্যা, এবং কোন কোন নিষ্কর্ম্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছে আদর পায়। কদাচিৎ দুই এক জন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

"লেখা পড়ার কথা দূরে থাক্, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যা-

লোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্‌চার, এড্রেস, প্রোসিডিংস, সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতে হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

* * *

এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক ‘উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন, এবং মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু ঐ নিয়মাধীন, জীবনের পরিমাণ ঐ অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। কাল-

স্রোতে এ সকল জলবুদ্বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কাল-স্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদস্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে, অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।”

চারি বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি শেষ সংখ্যায় শেষ পাতায় লিখিলেন;—

“চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্র-সূচনায় কতক-গুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম; কতকগুলি অব্যক্ত ছিল। যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা অব্যক্ত ছিল. এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।

এ সম্বাদে কেহ সন্তুষ্ট কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। যদি কেহ বঙ্গদর্শনের এমত বন্ধু থাকেন, যে বঙ্গদর্শনের

লোপ তাঁহার কষ্টদায়ক হইবে, তাঁহার প্রতি আমার এই নিবেদন যে, যখন আমি বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন আমি এমত সঙ্কল্প করি নাই, যে যতদিন বাঁচিব, আমি এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব।

"বঙ্গদর্শনের লোপ দেখিয়া যাঁহারা আনন্দিত হইবেন, তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সংবাদ শুনাইতে বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে না, এমত অঙ্গীকার করিতেছি না।

চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল।"

প্রথম বৎসর বঙ্গদর্শন কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়; তা'র পর ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শন আফিস কাঁটালপাড়ায় উঠিয়া যায়, এবং তথা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে।

১২৮২ সাল পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শন পরিচালিত হয়। ১২৮৪ সাল হইতে সঞ্জীবচন্দ্র উহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। ১২৯০ সালের মাঘ মাসে বঙ্গদর্শন উঠিয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা নীচে দিলাম।

(১) বিষবৃক্ষ—১২৭৯ সালের বৈশাখে আরম্ভ হইয়া ঐ সালের চৈত্রে শেষ হয়।

(২) ইন্দিরা—১২৭৯ সালের চৈত্র।

(৩) যুগলাঙ্গুরীয়—১২৮০ সালের বৈশাখ।

(৪) চন্দ্রশেখর—১২৮০ সালের আশ্বিনে আরম্ভ হইয়া ১২৮১ সালের ভাদ্রে শেষ হয়।

(৫) কমলাকান্ত—১২৮০ সালের ভাদ্রে আরম্ভ হইয়া ১২৮২ সালের বৈশাখে শেষ হয়।

(৬) রজনী—১২৮১ সালের আশ্বিনে আরম্ভ হইয়া ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণে শেষ হয়।

(৭) রাধারাণী—১২৮২ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।

(৮) কৃষ্ণকান্তের উইল—১২৮২ সালের পৌষে আরম্ভ হইয়া ১২৮৪ সালের মাঘে শেষ হয়।

(৯) কমলাকান্তের পত্র—১২৮৪ সালের পৌষ, ফাল্গুন ও ১২৮৫ সালের শ্রাবণ।

(১০) রাজসিংহ—১২৮৪ সালের চৈত্রে আরম্ভ হয়। বঙ্গদর্শনে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই।

(১১) মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত—১২৮৮ সালের আশ্বিন।

(১২) আনন্দমঠ—১২৮৭ সালের চৈত্রে আরব্ধ হইয়া ১২৮৮ সালে শেষ।

(১৩) দেবী চৌধুরাণী—১২৮৯ সালের পৌষে আরম্ভ হইয়া ১২৯০ সালের মাঘ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে; বঙ্গদর্শনে আর সম্পূর্ণ হয় নাই।

১২৭৯ সালের বৈশাখে বঙ্গদর্শনের গ্রাহক প্রায় এক হাজার হইয়াছিল। শ্রাবণে বাড়িয়া প্রায় দেড় হাজার হয়। ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণে ক্রমে ক্রমে

বাড়িয়া প্রায় দুই হাজার গ্রাহক হয়। ১২৮২ সালের মাঘ মাসে গ্রাহক-সংখ্যা কমিয়া কিঞ্চিদধিক ষোল শত হয়।

বঙ্গদর্শন উঠিয়া যাইবার দুইটি কারণ দেখা যায়। একটি, আত্মীয়-বিরোধ! দ্বিতীয়টি, প্রবন্ধ-লেখকদের দক্ষিণার দাবী। যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবন্ধের মূল্যস্বরূপ অর্থ প্রার্থনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ কিনিতে অসম্মত হইয়া কাগজ তুলিয়া দিলেন।

বঙ্গদর্শন যে সময় প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ ১২৮০ সালের কিছু পূর্ব্বে বা পরে নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রগুলি বর্ত্তমান ছিল :—

আর্য্যদর্শন, বান্ধব, অবকাশ-সহচরী, বাঙ্গালী, হিতবোধ, সরোজিনী, মিত্রপ্রকাশ, সাহিত্যমুকুর, পূর্ণশশী, অবলাবান্ধব, কুমুদিনী, আর্য্যপ্রবর, বামাবোধিনীপত্রিকা, ভ্রমর, বসন্তক, হালিসহর-পত্রিকা, বঙ্গমিহির,

হেমলতা, কাঁচড়াপাড়া-প্রকাশিকা, হিন্দুবিলাস, বিশ্ব-দর্শন, মাসিক-প্রকাশিকা, তমলুক-পত্রিকা, রহস্যসন্দর্ভ, সহোদর, ইত্যাদি।

এতগুলি কাগজের মধ্যে শুধু বামাবোধিনী পত্রিকা আজও জীবিত আছে।

পুস্তকাবলী

—(০)—

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থনিচয়ের নাম সকলেই জানেন; কিন্তু কোন্ কোন্ গ্রন্থ কোন্ কোন্ সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন না। আমি নিম্নে একটি তালিকা দিলাম। তাহাতে কোন্ কোন্ সংস্করণ কোন্ কোন্ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও লিপিবদ্ধ করিতে যত্নবান্ হইলাম। কিন্তু আমার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তালিকা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। সকল সংস্করণের তারিখ সংগ্রহ করিতে পারি-

লাম না। পুরাতন পুস্তকও কোথাও খুঁজিয়া পাই-
লাম না। যতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে
একে একে পরিচয় দিলাম।

(১) দুর্গেশনন্দিনী।

প্রথম সংস্করণ—১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ।

তৃতীয় ঐ—৩রা মে ১৮৬৯।

পঞ্চম সংস্করণ—১৫ই জুলাই ১৮৭৪—ছাপা হইল, এক সহস্র পুস্তক।

ষষ্ঠ সংস্করণ—১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬—ছাপা হইল, দুই সহস্র।

সপ্তম সংস্করণ—১লা অক্টোবর ১৮৭৯—ছাপা হইল, পনর শত।

নবম সংস্করণ—১০ই জুন ১৮৮৩—ছাপা হইল, এক সহস্র।

একাদশ সংস্করণ—১৫ই মার্চ্চ ১৮৮৮।

---

(২) কপালকুণ্ডলা।

প্রথম সংস্করণ		১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ।
দ্বিতীয়	ঐ	১৫ই এপ্রেল ১৮৭০।
তৃতীয়	ঐ	১৫ই অগষ্ট ১৮৭৪।
চতুর্থ	ঐ	১০ই মে ১৮৭৮।
পঞ্চম	ঐ	২৮এ জুন ১৮৮১।
সপ্তম	ঐ	২৫এ ডিসেম্বর ১৮৮৮।

(৩) মৃণালিনী।

প্রথম সংস্করণ		১০ই নভেম্বর ১৮৬৯।
তৃতীয়	ঐ	২২এ নভেম্বর ১৮৭৪।
চতুর্থ	ঐ	২০এ জুন ১৮৭৮।
পঞ্চম	ঐ	২৮এ জুলাই ১৮৮০।

ছাপা হইল, পাঁচ শত।

ষষ্ঠ	ঐ	১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১

ছাপা হইল, এক সহস্র।

সপ্তম	ঐ	২৯এ অগষ্ট ১৮৮৩।

(৪) বিষবৃক্ষ।

প্রথম সংস্করণ		১লা জুন ১৮৭৩।
দ্বিতীয়	ঐ	২৯এ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫।
তৃতীয়	ঐ	জুন ১৮৮০।
চতুর্থ	ঐ	১২৮৮ বঙ্গাব্দ।
ষষ্ঠ	ঐ	৪ঠা এপ্রেল ১৮৮৭।
সপ্তম	ঐ	২৫এ ফেব্রুয়ারি ১৮৯০।

---

(৫) লোকরহস্য।

প্রথম সংস্করণ ২৬এ নভেম্বর ১৮৭৪।

---

(৬) বিজ্ঞানরহস্য।

প্রথম সংস্করণ ১৯এ এপ্রেল ১৮৭৫।

---

(৭) ইন্দিরা।

প্রথম সংস্করণ— ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ।

চতুর্থ	ঐ	৬ই জুন ১৮৮৬।
পঞ্চম	ঐ	৩০ জুলাই ১৮৯৩।

[বর্ত্তমান আকারে পরিবর্দ্ধিত]

(৮) যুগলাঙ্গুরীয়।

প্রথম সংস্করণ		১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ।
চতুর্থ	ঐ	২১এ জুন ১৮৮৬।
পঞ্চম	ঐ	২৬এ মে ১৮৯৩।

(৯) রাধারাণী।

প্রথম সংস্করণ		১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।
তৃতীয় সংস্করণ		১৫ই জুন ১৮৮৬।
চতুর্থ	ঐ	২৬এ মে ১৮৯৩।

(১০) চন্দ্রশেখর।

প্রথম সংস্করণ		১লা জুন ১৮৭৫।
দ্বিতীয়	ঐ	১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪।

(১১) কমলাকান্তের দপ্তর।

প্রথম সংস্করণ—২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬—ছাপা হইল, দুই হাজার।

[কমলাকান্ত নাম দিয়া একটা পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়।]

দ্বিতীয় সংস্করণ ২৭এ জুলাই ১৮৯১।

[ঢেঁকি নামধেয় একটা নূতন প্রবন্ধ ইহাতে সংযোজিত হয়।]

---

(১২) বিবিধ সমালোচন।

প্রথম সংস্করণ ১৯এ জুলাই ১৮৭৬। ছাপা হইল, পাঁচ শত।

---

(১৩) রজনী

প্রথম সংস্করণ ২রা জুন ১৮৭৭।

দ্বিতীয় সংস্করণ ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮১।

---

(১৪) উপকথা।

(অর্থাৎ ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী)।

প্রথম সংস্করণ ২৪এ নবেম্বর ১৮৭৭।

দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ১৮৮১।

[রেজিষ্টারির তারিখ ১৯এ জানুয়ারি ১৮৮২]

---

(১৫) কবিতা-পুস্তক।

প্রথম সংস্করণ ৮ই অগষ্ট ১৮৭৮।

দ্বিতীয় ঐ ১লা অক্টোবর ১৮৯১।

[নামান্তরিত হইয়া 'গদ্য পদ্য বা কবিতা-পুস্তক' হইল]

ছাপা হইল, পাঁচ শত।

---

(১৬) কৃষ্ণকান্তের উইল।

প্রথম সংস্করণ ২৯এ আগষ্ট ১৮৭৮।

দ্বিতীয় ঐ ১৮৮২।

চতুর্থ ঐ ৩০এ নবেম্বর ১৮৯২।

---

(১৭) প্রবন্ধ-পুস্তক।

প্রথম সংস্করণ ২৭এ এপ্রেল ১৮৭৯।

[১১টি প্রবন্ধ]—ছাপা হইল, পাঁচ শত।

---

(১৮) রাজসিংহ।

প্রথম সংস্করণ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৮৮২।

চতুর্থ ঐ ১০ই অগষ্ট ১৮৯৩।

[বর্ত্তমান আকারে পরিবর্দ্ধিত]

---

(১৯) আনন্দমঠ।

প্রথম সংস্করণ ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৮২।

দ্বিতীয় সংস্করণ ২০এ জুলাই ১৮৮৩।

তৃতীয় ঐ ১৫ই এপ্রেল ১৮৮৬।

চতুর্থ ঐ ২০এ ডিসেম্বর ১৮৮৬—

ছাপা হইল দুই সহস্র।

পঞ্চম ঐ ২১এ নভেম্বর ১৮৯২।

---

(২০) দেবী চৌধুরাণী।

প্রথম সংস্করণ ২০এ মে ১৮৮৪।

চতুর্থ ঐ ২৬এ জানুয়ারি ১৮৮৭।

[এই সংস্করণটা তৃতীয় কি চতুর্থ, তাহা ঠিক বলিতে পারি না।]

পঞ্চম সংস্করণ ২৫এ ডিসেম্বর ১৮৮৮।

---

(২১) মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত।

প্রথম সংস্করণ ১৮৮৪।

---

(২২) কৃষ্ণচরিত্র।

প্রথম সংস্করণ ১২ই অগষ্ট ১৮৮৬।

দ্বিতীয় ঐ ১১ই অগষ্ট ১৮৯২।

---

(২৩) সীতারাম।

প্রথম সংস্করণ ৪ঠা মার্চ্চ ১৮৮৭।

দ্বিতীয় ঐ ৩১এ ডিসেম্বর ১৮৮৮।

---

(২৪) বিবিধ প্রবন্ধ।

প্রথম সংস্করণ ৭ই জুলাই ১৮৮৭।
[illegible] ২৫এ মে ১৮৯২—

ছাপা হইল পাঁচ শত।

---

(২৫) ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রথম সংস্করণ ১৭ই মে ১৮৮৮।

ছাপা হইল দুই সহস্র।

---

(২৬) Bengali Selections—

[for the Entrance Examination, 1895.]

প্রথম সংস্করণ ১৭ই জানুয়ারি ১৮৯২।

ছাপা হইল পঁচিশ শত।

(২৭) সঞ্জীবনী-সুধা।

প্রথম সংস্করণ ৩১এ মে ১৮৯৩।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর উপরি-উক্ত পুস্তকাদির যে সকল সংস্করণ হইয়াছিল, তাহা দেখাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া বিবেচনা করিলাম না।

যে সকল স্থলে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা নির্দ্দেশ করি নাই, সে সকল স্থলে এক সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অনূদিত পুস্তকের তালিকা।

(১) কপালকুণ্ডলা—এইচ, এ, ডি, ফিলিপ্‌স্‌ কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অনূদিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রোফেসার ক্লেম কর্ত্তৃক জর্ম্মণ ভাষায় অনূদিত হয়।

(২) বিষবৃক্ষ—Poison Tree নাম দিয়া শ্রীমতী মিরিয়ম নাইট ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেন।

(৩) কৃষ্ণকান্তের উইল—উপরোক্ত মহিলা কর্ত্তৃক ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হয়।

(৪) দুর্গেশনন্দিনী—বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেন।

(৫) যুগলাঙ্গুরীয়—স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হয়। [রাখাল বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা]

(৬) চন্দ্রশেখর—সন্তোষের জমীদার সুপণ্ডিত বাবু মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হয়।

(৭) আনন্দমঠ—বাবু নরেশ চন্দ্র সেন এম, এ, বি, এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হয়।

এতদ্ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং দুইখানি পুস্তকের ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছিলেন। একখানি বিষবৃক্ষ, অপর খানি দেবীচৌধুরাণী। প্রথমখানি লাট-মহিষীকে দিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দ্বিতীয়খানি অপহৃত হইয়াছে। একখানি পুস্তকাকারে বাঁধান খাতায় বঙ্কিমচন্দ্র অতি যত্নের সহিত অনুবাদটি স্বহস্তে

লিখিয়াছিলেন। যে খাতায় তিনি খসড়া করিয়াছিলেন, সে খাতা আজও আছে। কিন্তু ভাল খাতাখানি খোয়া গিয়াছে। শুনিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর যখন সকলে শোককাতর, তখন এই ভাল খাতাখানি ও অন্যান্য কাগজপত্র অপহৃত হইয়াছে। পূজ-নীয়া খুড়ীমাতার নিকট শুনিতে পাই, তিনি সে অমূল্য দ্রব্যগুলির পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন।

পরিত্যক্ত অংশ।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থনিচয় প্রত্যেক সংস্করণে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে অংশগুলি প্রথম সংস্করণে ছিল, এবং পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হই-য়াছে, সে অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার বাসনা আছে। কিন্তু সকল পুস্তকের পরিত্যক্ত অংশ দেখাইতে গেলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা। পাঁচ ছয়-খানি পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকিব।

আনন্দমঠ।

—০—

প্রথম সংস্করণ—পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শান্তি। আচ্ছা, তুমি যাও, আমি স্থান না পাই, গাছতলায় থাকিব।

এই বলিয়া গোবর্দ্ধনকে বিদায় দিয়া শান্তি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া জীবানন্দের অধিকৃত কৃষ্ণাজিন বিস্তারণ পূর্ব্বক, তদুপরি শয়ন করিল।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ ঠাকুর প্রত্যাগত হইলেন। হরিণচর্ম্মের উপর মানুষ শুইয়া আছে, ক্ষীণ প্রদীপালোকে অতটা ঠাওর হইল না। জীবানন্দ তাহারই উপরে উপবেশন করিতে গেলেন। উপবেশন করিতে গিয়া শান্তির হাঁটুর উপর বসিলেন। হাঁটু অকস্মাৎ উচু হইয়া জীবানন্দকে ফেলিয়া দিল।

জীবানন্দের একটু লাগিল। জীবানন্দ উঠিয়া একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কে হে তুমি বেল্লিক ?"

শান্তি। আমি বেল্লিক না, তুমি বেল্লিক। মানুষের হাঁটুর উপর কি বসবার জায়গা ?

জীব। তা কে জানে যে তুমি আমার ঘরে চুরি করিয়া শুইয়া আছ ?

শান্তি। তোমার ঘর কিসের ?

জীব। কার ঘর ?

শান্তি। আমার ঘর।

জীব। মন্দ নয়, কে হে তুমি ?

শান্তি। তোমার বনাই।

জীব। তুমি আমার হও না হও, আমি তোমার বোধ হইতেছে। তোমার গলার সঙ্গে আমার ব্রাহ্মণীর গলার একটু সাদৃশ্য আছে।

শান্তি। বহুদিন তোমার ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার একাত্মভাব ছিল, সেই জন্য বোধ হয় গলার আওয়াজ এক রকম হয়ে গেছে।

জীব। তোর যে বড় জোর জোর কথা দেখ্‌তে

পাই? মঠের ভিতর না হতো এক ঘুষোয় দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিতুম।

শান্তি। দাঁত ভেঙ্গেছে অনেক সাঙাত। কাল রাজনগরে কটা দাঁত ভেঙ্গেছিলে, হিসাব দাও দেখি। বড়াইয়ে কাজ নেই, আমি এখানে ঘুমুই। তোমরা সন্তানের দল, লেজ গুটিয়ে, বামুন ঠাকুরুণদের আঁচলের ভিতর লুকোওগে।

এখন জীবানন্দ ঠাকুর কিছু ফাঁপরে পড়িলেন। মঠের ভিতর সন্তানে সন্তানে মারামারি করা সত্যানন্দের নিষেধ। কিন্তু এরও বড় মুখের দৌড়, দু ঘা না দিলেও নয়। রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। অথচ গলার আওয়াজটা মধ্যে মধ্যে বড় মিঠা লাগিতেছে, যেন কি মনে হয়, যেন কে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া ডাকিতেছে, আর বলিতেছে, এলেই ঠ্যাঙে লাঠী মার্‌বো। জীবানন্দের উঠিতেও ইচ্ছা করিতেছিল না, বসিতেও পারেন না। ফাঁপরে পড়িয়া বলিলেন, "মহাশয়, এ ঘর আমার, চিরকাল ভোগদখল করিতেছি, আপনি বাহিরে যান।"

শান্তি। এ ঘর আমার, চিরকাল ভোগ দখল করিতেছি, আপনি বাহিরে যান।

জীব। মঠের ভিতর মারামারি করিতে নাই বলিয়াই লাথি মারিয়া তোমায় নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিই নাই, কিন্তু এখনি মহারাজের অনুমতি আনিয়া তোমায় তাড়াইয়া দিতে পারি।

শান্তি। আমি মহারাজের অনুমতি আনিয়াই তোমায় তাড়াইয়া দিতেছি। তুমি দূর হও।

জীব। তাহা হইলে এ ঘর তোমার। মহারাজকে কেবল জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি; আগে বল, তোমার নাম কি?

শান্তি। আমার নাম নবীনানন্দ গোস্বামী, তোমার নাম কি?

জীব। আমার নাম জীবানন্দ গোস্বামী।

শান্তি। তুমিই জীবানন্দ গোস্বামী। তাই এমন?

জীব। তাই কেমন?

শান্তি। লোকে বলে, আমি কি করবো?

জীব। লোকে কি বলে?

শান্তি। তা' আমার বল্‌তে ভয়ই কি? লোকে বলে জীবানন্দ ঠাকুর বড় গণ্ডমূর্খ।

জীব। গণ্ডমূর্খ, আর কি বলে?

শান্তি। মোটা বুদ্ধি।

জীব। আর কি বলে'?

শান্তি। যুদ্ধে কাপুরুষ।

জীবানন্দের সর্ব্ব শরীর রাগে গর গর করিতে লাগিল, বলিলেন, "আর কিছু আছে?"

শান্তি। আছে অনেক কথা—নিমাই বলে আপনার একটি ভগিনী আছে।

জীব। তুমি বড় বেল্লিক হে—

শান্তি। তুমি ভল্লুক হে।

জীব। তুমি উল্লুক, অর্ব্বাচীন, নাস্তিক, বিধর্ম্মী, ভণ্ড, পামর!

শান্তি। তুমি—যলায় বায়াবোচীচঃ,—তুমি স্তশ্চ্ভিশ্চ্শাৎ—তুমি ষ্টু ভিষ্টু্যদাস্তটোঃ।

জীব। বের শালা এখান থেকে—তোর দাড়ি ছিঁড়িব।

শান্তি তখন গণিল প্রমাদ! দাড়ি ধরিলেই মুস্কিল। পরচুলো খসিয়া পড়িবে। শান্তি সহসা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নে তৎপর হইল।

জীবানন্দ পিছু পিছু ছুটিল। মনে মনে ইচ্ছা, ভণ্ডটা মঠের বাহিরে গেলে দুই ঘা দিব। শান্তি যাই হউক স্ত্রীলোক—দৌড়ধাপে অনভ্যস্ত। জীবানন্দ এ সকল কাজে সুশিক্ষিত। শীঘ্র গিয়া শান্তিকে ধরিল, এবং তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া প্রহার করিবে বলিয়া তাহাকে কায়দা করিয়া জাপ্‌টাইয়া ধরিতে গেল। স্পর্শমাত্রেই জীবানন্দ চমকিয়া শান্তিকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু শান্তি বাহু দ্বারা জীবানন্দের গলা জড়াইয়া ধরিল।

জীবানন্দ বলিল,"একি! তুমি যে স্ত্রীলোক! ছাড়! ছাড়! ছাড়!" কিন্তু শান্তি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "ওগো, তোমরা দেখ গো! এক জন গোঁসাই জোর করিয়া স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিতেছে।"

জীবানন্দ তাহার মুখে হাত দিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ!

সর্ব্বনাশ! অমন কথা মুখে এনো না। ছাড়! ছাড়! আমার ঘাট হয়েছে, ছাড়!"

শান্তি ছাড়ে না; আরও চেঁচায়, শান্তির কাছে জোর করিয়া ছাড়ানও সহজ নয়। জীবানন্দ যোড়হাত করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার পায়ে পড়ি, ছাড়।" শেষ স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে অরণ্য পরিপূরিত হইয়া গেল।

এ দিকে মঠের গোঁসাইরা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার হইতেছে শুনিয়া, অনেকে ধুনুচির ভিতর প্রদীপ জ্বালিয়া লাঠি সোঁটা লইয়া বাহির হইলেন। দেখিয়া জীবানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল। শান্তি বলিল, "অত কাঁপিতেছ কেন? তুমি ত বড় ভীত পুরুষ! আবার লোকে তোমাকে বলে মহাবীর?"

গোঁসাইরা আলো লইয়া নিকটবর্ত্তী হইল দেখিয়া জীবানন্দ সকাতরে বলিলেন, "আমি অতিশয় কাপুরুষ, তুমি আমায় ছাড়, আমি পলাই।"

শান্তি। জোর করিয়া ছাড়াও না।

জীবানন্দ লজ্জায় স্বীকার করিতে পারিলেন না যে

তিনি স্ত্রীলোকের জোরে পারিতেছেন না। বলিলেন, "তুমি বড় পাপিষ্ঠা।"

শান্তি তখন মুচ্‌কি হাসিয়া বিলোল কটাক্ষ ক্ষেপণ করিয়া বলিল, "প্রাণাধিক, আমি তোমার প্রতি অতিশয় আসক্ত। তোমার দাসী হইব বলিয়াই এখানে আসিয়াছি, আমায় গ্রহণ করিবে, স্বীকার কর, ছাড়িয়া দিতেছি।"

জীব। দূর হ পাপিষ্ঠা! দূর হ পাপিষ্ঠা! অমন কথা আমাকে কাণে শুনিতে নাই।

শান্তি। আমি পাপিষ্ঠা, তাতে সন্দেহ নাই; নইলে স্ত্রী-জাতি হইয়া পুরুষের কাছে প্রেম ভিক্ষা চাইতে যাইব কেন—আমার কথাটি রাখিবে? ছাড়িয়া দিতেছি।

জীব। ছি! ছি! ছি! আমি ব্রহ্মচারী—আমাকে অমন কথা বলিতে নাই—তুমি আমার—

শান্তি সভয়ে বলিল, "চুপ কর! চুপ কর! চুপ কর! আমি শান্তি।"

এই বলিয়া শান্তি জীবানন্দকে ছাড়িয়া তাঁহার

পায়ের ধূলা মাথায় লইল। পরে যোড়হাত করিয়া বলিল, "প্রভু! অপরাধ নিও না। কিন্তু ছি! পুরুষ মানুষের ভালবাসার ভাণ করাকে ধিক! আমাকে চিনিতেই পারিলে না!"

তখন জীবানন্দের মনে সকল কথা প্রস্ফুট হইল। শান্তি নইলে এ কার্য্য আর কার? শান্তি নইলে এ রঙ্গ আর কে জানে? শান্তি নইলে কার বাহুতে এত বল? তখন আনন্দিত হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া জীবানন্দ কি বলিতে যাইতেছিলেন—কিন্তু অবকাশ পাইলেন না, গোঁসাইয়েরা আসিয়া পড়িয়াছিল। ধীরানন্দ আগে আগে। ধীরানন্দ এই সময়ে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোলমাল কিসের?"

জীবানন্দ ফাঁপরে পড়িলেন, কি উত্তর দিবেন? শান্তি সেই সময়ে তাঁহাকে চুপি চুপি বলিল, "কেমন বলিয়া দিই—তুমি আমায় ধরিয়াছিলে?"

এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া শান্তি ধীরানন্দের কথার উত্তর দিল—বলিল, "গোলমাল—একটা স্ত্রীলোকে চেঁচাইতেছিল। 'আমার সতীত্ব নষ্ট করিল! আমার

সতীত্ব নষ্ট করিল' বলিয়া চেঁচাইতেছিল। কিন্তু কই? জীবানন্দ ঠাকুর এত খুঁজিলেন, আমি এত খুঁজিলাম, দেখিতে পাইলাম না। এই বনটার ভিতর আপনারা একবার দেখুন দেখি—ও দিকে শব্দ শুনিয়াছিলাম।"

গোঁসাইদিগকে শান্তি অরণ্যের নিবিড় অংশ দেখাইয়া দিল। জীবানন্দ শান্তিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৈষ্ণবদিগকে এত দুঃখ দিয়া কি ফল? ও বনে গেলে কি ওরা ফিরিবে? সাপেই খাক্ কি বাঘেই খাক্।"

শান্তি। যখন বৈষ্ণব স্ত্রীলোকের নাম শুনেছে, তখন একটু কষ্ট না পেলে ফিরিবে না। তা না হয়, ফিরাইতেছি।

এই বলিয়া শান্তি গোঁসাইজিদের ডাকিয়া বলিলেন, "আপনারা একটু সতর্ক থাকিবেন। কি জানি ভৌতিক মায়াও হইতে পারে।"

শুনিয়া এক জন গোঁসাই বলিল, "তাই সম্ভব। নহিলে স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিবে?"

গোঁসাইয়েরা সকলেই এই মতে মত দিল, ভৌতিক মায়া স্থির করিয়া সকলেই মঠে ফিরিল, জীবানন্দ বলিল, "এসো আমরা এইখানে বসি—এ ব্যাপারটা আমাকে বুঝাইয়া বল—তুমি এখানে কেন—কি প্রকারে আসিলে—এ বেশই বা কেন? এত রঙ্গই বা কোথায় শিখিলে?"

শান্তি বলিল, "আমি কেন আসিলাম?—তোমার জন্য আসিয়াছি। কি প্রকারে আসিলাম?—হাঁটিয়া। এ বেশ কেন?—আমার সখ্। আর এত রঙ্গ শিখিলাম কোথায়?—একটি পুরুষ মানুষের কাছে। সব তোমায় ভাঙ্গিয়া বলিব। কিন্তু এখানে বনে বসিব কেন? চল তোমার কুঞ্জে যাই।"

জীব। আমার কুঞ্জ কোথায়?

শান্তি। মঠে।

জীব। সেখানে স্ত্রীলোক যাইতে আসিতে নিষেধ।

শান্তি। আমি কি স্ত্রীলোক?

জীব। আমি মহারাজের নিয়ম লঙ্ঘন করিব না।

শান্তি। আমার প্রতি মহারাজের অনুমতি আছে। কুঞ্জেই চল, সব বলিতেছি। বিশেষ ঘরের ভিতর না গেলে আমার দাড়ি খুলিব না। দাড়ি না খুলিলে তুমি পোড়ার মুখ চিনিতে পারিবে না। ছিঃ! পুরুষ এমন!

উপরে যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পঞ্চম সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরিত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় ভালই করিয়াছিলেন। আমরা শান্তিকে অধিকতর শান্ত ও সংযত দেখিলাম। কিন্তু বিপুল কবিত্বরস হইতে বঞ্চিত হইলাম। সেক্ষপীয়ার প্রণীত Merchant of Venice-র এক স্থানে (Act V. scene 1) Portia-র মুখ হইতে এইরূপে একটা কথা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। মূল সংস্করণে ছিল ;— I will never come in your bed until I see the ring. প্রথম অংশ অশ্লীল বোধে Clarendon series এ পরিবর্ত্তিত হইল ; লিখিত হইল, "I will never be your wife."

আনন্দমঠে আরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দুই একটি প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিলাম ঃ—

উপক্রমণিকা—প্রথম পাতা শেষ ছত্র।

বঙ্গদর্শনে আছে—

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল, "প্রিয়জনের প্রাণ সর্ব্বস্ব।" এই শেষ ছত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণে লিখিলেন—"ভক্তি।"

ভক্তি কথাটি তদবধি আর পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

প্রথম সংস্করণের পুস্তক-শেষে যে চারি ছত্র লিখিত ছিল, তাহা পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমি নিম্নে সেই ছত্র কয়টি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল, বিষ্ণুমণ্ডপ জনশূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ, উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।"

স্বর্গীয় বাবু চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চন্দ্রশেখর।

চন্দ্রশেখর বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২৮১ সালের ভাদ্র মাসে চন্দ্রশেখর উক্ত পত্রিকায় সম্পূর্ণ হয়। তার পর যখন ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে চন্দ্রশেখর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল, তখন দেখা গেল, চন্দ্রশেখর নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছে। আবার পরবর্ত্তী সংস্করণে এই নূতন কলেবরের উপর নানা বর্ণের রং দেওয়া হইল।

প্রথম সংস্করণ—উপক্রমণিকা—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয় না বল। ষোল বৎসরের নায়ক---আট বৎসরের নায়িকা! (হাসিতে হয় তোমরা হাসিও—আপত্তি নাই। আমি জানি, অঙ্কুরেও বৃক্ষের গুণ আছে। জন্মাবধি মানব-হৃদয়ের ধর্ম্ম স্নেহশালিতা।) বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।

বন্ধনীর ভিতরের অংশ প্রথম সংস্করণে ছিল, পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে ভীমা পুষ্করিণী ছিল—শৈবালিনী, লরেন্স ফষ্টর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছিল। পরবর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থারম্ভে দলনী বেগমকে আনা হইল; দ্বিতীয় স্থান, শৈবলিনী প্রভৃতিকে দেওয়া হইল।

প্রথম সংস্করণে দ্বিতীয় খণ্ডে "ভ্রাতার স্নেহ" বলিয়া একটা পরিচ্ছেদ ছিল, পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। তা' ছাড়া আরও কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে; অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"এই বলিয়া দলনী বেগম বেগে পুরী হইতে বহির্গতা হইয়া গেলেন।

গুরগণ খাঁ বিহ্বলের ন্যায় বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন।

দলনী বিবি আবার ফিরিয়া আসিলেন

গুরগণ খাঁর পদতলে পতিত হইলেন, বলিলেন, "আমি মুখরা বালিকা—কি বলিতে কি বলিলাম—আমার উপর রাগ করিবেন না। নবাবের অনিষ্ট

ঘটিলে আমি নিশ্চিত প্রাণত্যাগ করিব। আমায় রক্ষা করুন—ভগিনী বধ করিবেন না। আমায় রক্ষা করুন। যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হউন।”

ভগিনীর কাতরোক্তি শুনিয়া সেনাপতি কহিলেন, “যুদ্ধের কোন সূচনা এখনও হয় নাই। তুমি কেন অনর্থক কাতর হইতেছে? যুদ্ধ কোথায়?”

দলনী কহিলেন, “আপনি তবে নৌকা ছাড়িয়া দিউন।”

গুরগণ খাঁ কহিলেন, “সে নবাবের ইচ্ছা।”

দলনী দেখিলেন, সকল কথা বৃথা হইল। ভগ্নাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন। গমনকালে বলিলেন, “আপনি সাবধান থাকিবেন। আমাকে আপনার শত্রু করিবেন না। আত্মরক্ষার্থ আমি আপনার শত্রুতা করিতে পারি।

* * *

এক জন শস্ত্রবাহক উপস্থিত হইল। গুরগণ খাঁ আজ্ঞা করিলেন, “শীঘ্র ঘোড়া লইয়া আইস।”

গুরগণ খাঁর অশ্বালয়ে সর্ব্বদা অশ্ব সজ্জিত থাকিত।

তখনই সজ্জিত অশ্ব সম্মুখে আনীত হইল, তদুপরি আরোহণ করিয়া গুরগণ খাঁ অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া দলনীর পূর্ব্বেই দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"কেহ রাত্রে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে?"

প্রহরী চিনিয়া অভিবাদন করিল। কহিল, "হুজুরের হুকুম।"

গুরগণ খাঁ কহিলেন, "আচ্ছা! আমার হুকুম আর তাহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না। বদলির সময়ে এ কথা প্রহরীকে বুঝাইয়া দিও।"

'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রহরী সেলাম করিল। গুরগণ খাঁ ফিরিলেন।

যাইবার সময় পথিমধ্যে গুরগণ খাঁ দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়া গিয়াছিলেন। চিনিয়াছিলেন। দ্রুতবেগে তাহাদিগের পার্শ্ব দিয়া অশ্ব ধাবিত করিয়াছিলেন, রাত্রে তদবস্থায় কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। এখন দুর্গদ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আবার সেই দুই জন স্ত্রীলোকের সম্মুখীন হইলেন। তখন অশ্ব থামা-

ইলেন। বলিলেন, "বেগম সাহেব, তোমার সঙ্গে কে ?" বলা বাহুল্য যে ঐ দুইটি স্ত্রীলোকের মধ্যে একটি দলনী—পদব্রজে দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন।

দলনী 'বেগম সাহেব' সম্বোধন শুনিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিল,—তাহার হৃদয়ের শোণিত শুকাইয়া গেল—কিন্তু তখনই ভ্রাতাকে চিনিতে পারিল—উত্তর করিল, "আমার সঙ্গে কুল্‌সম্—পথিমধ্যে বিপদ্ ঘটাইতেছেন কেন ?"

গুরগণ খাঁ কহিল, "তোমাদের দুর্গপ্রবেশ আমি নিষেধ করিয়া আসিয়াছি।"

শুনিয়া দলনী ক্রমে ক্রমে, ছিন্ন বল্লীবৎ ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। চক্ষু দিয়া ধারা বহিতে লাগিল। বলিলেন,"ভ্রাতঃ আমার দাঁড়াইবার স্থান রাখিলে না ?"

গুরগণ খাঁ বলিলেন, "আমার গৃহে আইস। আমি তোমাকে উপযুক্ত স্থানে রাখিব। আমার কোন অনুচরের গৃহে তোমার স্থান করিয়া দিব।"

দলনী বলিল, "তুমি যাও। গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে আমার স্থান হইবে।

তৃতীয় খণ্ডে অগাধ জলে সাঁতারের কথা সকলেরই স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা। প্রতাপ জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল নিশিতে জাহ্নবীজলে সাঁতার কাটিতে কাটিতে শৈবলিনীকে শপথ করাইতেছেন। প্রতাপ বলিতেছেন,—"শপথ কর, যে এ জন্মে আমি তোমার ভ্রাতা—তুমি আমার ভগিনী। তুমি আমার কন্যাতুল্যা—আমি তোমার পিতৃতুল্য—তোমার সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ নাই। এ জন্মে তুমি আমাকে অন্য চক্ষে দেখিবে না—অন্য চক্ষে ভাবিবে না। শপথ কর।"

এ শপথের কথা প্রথম সংস্করণে আছে, পরবর্ত্তী সংস্করণে নাই।

প্রথম সংস্করণে একটা পরিশিষ্ট ছিল, পরে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমি নিম্নে সে পরিচ্ছেদটি উদ্ধৃত করিলাম;—

পরিশিষ্ট।

লরেন্স ফষ্টর, নবারের তাম্বুর বাহিরে আসিয়া কি করিবেন, কোথা যাইবেন, কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, যবন এবং ইংরেজ উভয়েই তাঁহার শত্রু। বিহ্বলের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি ইংরাজ সেনা একদল যবনকে প্রহার করিয়া তাড়াইতে তাড়াইতে লইয়া যাইতেছিল। ফষ্টর এক জন মৃত যবনের বন্দুক কুড়াইয়া লইয়া সেই ইংরেজদিগের সঙ্গে মিশিলেন। কিন্তু পরিচ্ছদে ধরা পড়িলেন। সেই রেজিমেণ্টের পোষাক তাঁহার পরা ছিল না।

সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? পোষাক পর নাই কেন?"

ফষ্টর বলিল, "আমি লরেন্স ফষ্টর, মুসলমানেরা আমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল।"

সার্জেণ্ট বলিল, "দুই জন ইহাকে সেনাপতির নিকট লইয়া যাও। সেনাপতির আজ্ঞা আছে, বন্দী কেহ হস্তগত হইলে তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে।" যুদ্ধা-

বসানে লরেন্স ফষ্টর, সেনাপতির নিকটে আনীত হইলেন। সেনাপতি দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "জানি। লরেন্স ফষ্টর পলাতক, রাজবিদ্রোহী—যবন-সেনামধ্যে পদগ্রহণ করিয়াছে; উহাকে ফাঁসি দেওয়া যাইবে।"

বিচারান্তে যুদ্ধের পরে রীতিমত বিচার হইয়া ফষ্টরের ফাঁসি হইল।

চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া গৃহে আসিলেন। সুন্দরী শৈবলিনীর সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিয়াই জানিল যে শৈবলিনী রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। আহ্লাদে, সুন্দরী চন্দ্রশেখরকে সবিশেষ কহিল। আহ্লাদে চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীকে আলিঙ্গন করিতে প্রায় সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি সেই দিনই পুনর্ব্বার সংসার পাতিয়া, শৈবলিনীকে গ্রহণ করিলেন। রমানন্দ স্বামী আসিলে একটা লৌকিক প্রায়শ্চিত্ত করিবেন স্থির করিলেন।

রমানন্দ স্বামী প্রতাপের মৃত্যুসংবাদ লইয়া আসিলেন। কেন প্রতাপ মরিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলেন

না। চন্দ্রশেখর কিয়দ্দিবস প্রতাপের শোকে এত অধীর হইয়া রহিলেন যে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের কথা বিস্মৃত হইয়া রহিলেন। রমানন্দ স্বামী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

নবাব কাসেম আলি খাঁ উদয়নালা হইতে মুঙ্গেরে পলাইলেন। তথায় জগৎশেঠদিগকে গঙ্গাজলে নিমগ্ন করিয়া বধ করিলেন। এবং যে সকল ইংরেজ বন্দী ছিল, তাহাদিগকে সমরুর হস্তে বধ করাইলেন। এই সকল দুষ্কার্য্য করিয়া, মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পাটনা যাত্রা করিলেন।

গুরগণ্ খাঁ অতি চতুর। তিনি নবাবের আদেশ-ক্রমে উদয়নালা যাইবার জন্য, নবাবের পশ্চাৎ যাত্রা করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু উদয়নালা পর্য্যন্ত যান নাই—নবাবের অগ্রেই ফিরিয়াছিলেন, ভাব গতিক বুঝিয়া নবাবের সহিত যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, এরূপ কৌশল করিতেন। কিন্তু এক্ষণে নবাবের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইলেন। পথিমধ্যে নবাব, সৈন্যদিগকে

ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা বিদ্রোহের ছল করিয়া গুরগণ খাঁকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

তাহার পরে নবাবের অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিল, তাহা ইতিহাসে লিখিত আছে। বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পুরুষোত্তমের যাত্রী হইয়াছিলেন, —বাঙ্গালার শেষ যবন রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ফকিরি গ্রহণ করিলেন।

কুল্‌সম্‌ যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের ভৃত্যবর্গের সহিত পলায়ন করিয়াছিল। কাসেম আলি ফকিরি গ্রহণ করিলে, সে মীর জাফরের অবরোধে নিযুক্ত হইল। দলনীকে কখনও ভুলিল না।"

ইন্দিরা।

—*০*—

"ইন্দিরা" ১২৮০ সালে পুস্তকাকারে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাহার আকার অতি ক্ষুদ্র। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার মুদ্রাঙ্কণের সময় "ইন্দিরা," "উপ-

কথার” অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। চতুর্থবারে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইল। পঞ্চমবারে “ইন্দিরা” বিপুলাকার ধারণ করিল। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের মূল্য ছিল চারি আনা—পঞ্চম সংস্করণে মূল্য হইল দেড় টাকা। এই অনুপাতে আকারও বাড়িল। পনরটি নূতন পরিচ্ছেদ এই বর্দ্ধিত সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইল।

পুস্তকখানি নূতন কলেবর ধারণ করিলেও মূল আখ্যানাংশের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আগে র-বাবু ও সুভাষিণী ছিল না; তাহারা আসিল; সঙ্গে সঙ্গে হারাণীও নূতন বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া আসিল।

প্রথম বারের মুদ্রিত গ্রন্থের যে যে অংশ পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ—

“হারাণী নামে রামরাম দত্তের এক জন পরিচারিকা ছিল। আমার সঙ্গে তাহার বড় ভাব—সেও দাসী, আমিও দাসী—না হইবে কেন? আমি তাহাকে বলিলাম, “ঝি, আমার জন্মের শোধ একবার উপকার

কর। ঐ বাবুটী কখন যাইবেন, আমাকে শীঘ্র খবর আনিয়া দে।"

হারাণী মৃদু হাসিল। বলিল, "ছি দিদি ঠাকরুণ! তোমার এ রোগ আছে, তা জানিতাম না।"

আমিও হাসিলাম। বলিলাম, "মানুষের সকল দিন সমান যায় না। এখন তুই গুরুমহাশয়গিরি রাখ— আমার এ উপকার করবি কি না বল্।"

হারাণী বলিল, "তোমার জন্য এ কাজ আমি করিব, কিন্তু আর কারো জন্য হইলে করিতাম না।"

হারাণীর নীতিশিক্ষা এইরূপ।

হারাণী স্বীকৃতা হইয়া গেল, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ততক্ষণ আমি কাটামাছের মত ছট্ ফট্ করিতে লাগিলাম্। চারিদণ্ড পরে হারাণী ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "বাবুর অসুখ করিয়াছে—বাবু এ বেলা যাইতে পারিলেন না—আমি তাঁহার বিছানা লইতে আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "কি জানি যদি অপরাহ্নে চলিয়া যান,—তুই একটু নির্জ্জন পাইলেই তাঁহাকে বলিস্

যে আমাদের রাঁধুনী ঠাকুরাণী বলিয়া পাঠাইলেন যে, 'এ বেলা আপনার খাওয়া ভাল হয় নাই, রাত্রি থাকিয়া খাইয়া যাইবেন। কিন্তু রাঁধুনীর নিমন্ত্রণ, কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিবেন না। কোনও ছল করিয়া থাকিবেন।' হারাণী আবার হাসিয়া বলিল, "ছি!" কিন্তু দৌত্য স্বীকৃত হইয়া গেল। হারাণী অপরাহ্নে আসিয়া আমাকে বলিল, "তুমি যাহা বলিয়াছিলে তাহা বলিয়াছি। বাবুটি মানুষ ভাল নহেন—রাজি হইয়াছেন।"

শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু মনে মনে তাঁহাকে একটু নিন্দা করিলাম। আমি চিনিয়াছিলাম যে, তিনি আমার স্বামী, এই জন্য যাহা করিতেছিলাম, তাহাতে আমার বিবেচনায় দোষ ছিল না। কিন্তু তিনি যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এমত কোনও মতেই সম্ভবে না। আমি তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম—এ জন্য আমার প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি আমাকে একাদশ বৎসরের বালিকা দেখিয়াছিলেন মাত্র। তিনি আমাকে চিনিতে

পারিয়াছেন, এমত কোনও লক্ষণও দেখি নাই। অতএব তিনি আমাকে পরস্ত্রী জানিয়া যে আমার প্রণয়াশায় লুব্ধ হইলেন, শুনিয়া মনে মনে নিন্দা করিলাম। কিন্তু তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী—তাঁহার মন্দ ভাবা আমার অকর্ত্তব্য বলিয়া সে কথার আর আলোচনা করিলাম না। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কখন দিন পাই, তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব।

অবস্থিতি করিবার জন্য তাঁহাকে ছল খুঁজিয়া বেড়াইতে হইল না। তিনি কলিকাতায় কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। রামরাম দত্তের সঙ্গে তাঁহার দেনা পাওনা ছিল। সেই সূত্রেই তাঁহার সঙ্গে নূতন আত্মীয়তা। অপরাহ্ণে তিনি হারাণীর কথায় স্বীকৃত হইয়া রামরামের সঙ্গে পুনশ্চ সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, "যদি আসিয়াছি, তবে একবার হিসাবটা দেখিয়া গেলে ভাল হইত।" রামরাম বাবু বলিলেন, "ক্ষতি কি? কিন্তু কাগজপত্র সব আড়তে আছে, আনিতে

পাঠাই। আসিতে রাত্র হইবে। যদি অনুগ্রহ করিয়া কাল প্রাতে একবার পদার্পণ করেন—কিম্বা অদ্য অবস্থিতি করেন, তবেই হইতে পারে।" তিনি উত্তর করিলেন, "তাহার বিচিত্র কি? এ আমারই ঘর। একবারে কাল প্রাতেই যাইব।"

[পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদের ভূরিভাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমি নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।]

"আমি মাতাকে বলিলাম, "আমি আসিয়াছি, এ কথা তাঁহাকে জানাইও না। আমি এতদিন ঘরে ছিলাম না, কি জানি তিনি যদি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হন, তবে আসিবেন না। অন্য কোন ছলে এখানে তাঁহাকে আনাও। তিনি এখানে আসিলে আমি সন্দেহ মিটাইব।"

মাতা এ কথা পিতাকে বলিলে তিনি সম্মত হইলেন। পত্রে লিখিলেন, "আমি উইল করিব। তুমি আমার জামাতা এবং পরম আত্মীয় আর সদ্বিবেচক। অতএব তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উইল করিব। তুমি পত্রপাঠ এখানে আসিবে।" তিনি পত্রপাঠ

আসিলেন। তিনি এখানে আসিলে পিতা তাঁহাকে যথার্থ কথা জানাইলেন।

শুনিয়া স্বামী মৌনাবলম্বন করিলেন। পরে বলিলেন, "আপনি পূজ্য ব্যক্তি। যে ছলেই হউক এখানে আসিয়া যে আপনার দর্শন লাভ করিলাম, ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু আপনার কন্যা এতদিন গৃহে ছিলেন না— কোথায় কি চরিত্রে কাহার গৃহে ছিলেন, তাহা কেহ জানে না। অতএব তাহাকে আমি গ্রহণ করিব না।"

পিতা মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইলেন। এ কথা মাতাকে বলিলেন, মা আমাকে বলিলেন। আমি সমবয়স্কদিগকে বলিলাম, "তোমরা উঁহাদিগকে চিন্তা করিতে মানা কর। তাঁকে একবার অন্তঃপুরে আন—তাহা হইলেই আমি উঁহাকে গ্রহণ করাইব।"

কিন্তু অন্তঃপুরে আসিতে কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না; বলিলেন, "আমি সে স্ত্রীকে গ্রহণ করিব না, তাহাকে সম্ভাষণও করিব না।" শেষে মাতার রোদন ও সমবয়স্কদিগের ব্যঙ্গের জ্বালায় সন্ধ্যার পর অন্তঃপুরে জল খাইতে আসিলেন।

তিনি জলযোগ করিতে আসনে বসিলেন। কেহ তাঁহার নিকট দাঁড়াইল না—সকলেই সরিয়া গেল। তিনি অন্যমনে, মুখ নত করিয়া, আহার করিতেছিলেন, এমত সময়ে আমি নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁ দেখ্, কামিনী, তুই আজও কি কচি খুকী যে আমার ঘাড়ের উপর পড়িস্?"

কামিনী আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম।

আমি বলিলাম, "আমি কামিনী নই, কে বল, তবে ছাড়িব।"

আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এ কি এ?"

আমি তাঁহার চক্ষু ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইলাম, বলিলাম, "চতুরচূড়ামণি! আমার নাম ইন্দিরা—আমি হরমোহন দত্তের কন্যা, এই বাড়ীতে থাকি। আপনাকে প্রাতঃপ্রণাম—আপনার কুমুদিনীর মঙ্গল ত?

তিনি অবাক হইলেন। আমাকে দেখিয়াই যে তাঁহার আহ্লাদ হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম, বলি-

লেন, "এ আবার কোন্ রঙ্গ কুমুদিনি? তুমি কোথা হইতে?"

আমি বলিলাম, "কুমুদিনী আমার আর একটি নাম। তুমি বড় গোবর গণেশ, তাই এত দিন আমাকে চিনিতে পার নাই। কিন্তু তোমাকে যখন রামরাম দত্তের বাড়ী ভোজন করিতে দেখিয়াছিলাম, আমি তখনই তোমাকে চিনিয়াছিলাম। নচেৎ সে দিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম না। প্রাণাধিক—আমি কুলটা নহি।"

তিনি একটু আত্মবিস্মৃতের মত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এতদিন এত ছলনা করিয়াছিলে কেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি প্রথম সাক্ষাতের দিনে বলিয়াছিলে যে, তোমার স্ত্রী পাইলেও গ্রহণ করিবে না। নচেৎ সেই দিনই পরিচয় দিতাম।" দানপত্রখানি আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছিলাম। তাহা খুলিয়া দেখাইয়া বলিলাম,"সেই রাত্রেই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, হয় তুমি আমায় গ্রহণ করিবে, নচেৎ

আমি প্রাণত্যাগ করিব। সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই এইখানি লেখাইয়া লইয়াছি। কিন্তু ইহা আমি ভাল করি নাই। তোমার সঙ্গে শঠতা করিয়াছি। তোমার অভিরুচি হয়, আমায় গ্রহণ কর; না অভিরুচি হয়, আমি তোমার উঠান ঝাঁটি দিয়া খাইব—তাহা হইলেও তোমাকে দেখিতে পাইব, দানপত্র আমি এই নষ্ট করিলাম।"

এই বলিয়া সেই দানপত্র তাঁহার সম্মুখে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিলাম।

তিনি গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তোমায় ত্যাগ করিলে আমি প্রাণে মরিব। তুমি আমার গৃহে গৃহিণী হইবে চল।"

মৃণালিনী।

মৃণালিনীর প্রথম দুই পরিচ্ছেদ সপ্তম বা অষ্টম সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমি সেই দুই পরিচ্ছেদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রঙ্গভূমি।

মহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি তুর্কস্থানীয় কুতর-উদ্দীন যুধিষ্ঠির ও পৃথ্বীরাজের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন। দিল্লী, কান্যকুব্জ, মগধাদি প্রাচীন সাম্রাজ্য সকল যবন করকবলিত হইয়াছে। অশোক বা হর্ষবর্দ্ধন, বিক্রমাদিত্য বা শিলাদিত্য ইহাঁদের পরিত্যক্ত ছত্রতলে যবনমুণ্ড আশ্রিত হইয়াছে। যবনের শ্বেতছত্রে সকলের গৌরব ছায়ান্ধকারব্যাপ্ত করিয়াছে।

বঙ্গীয় ৬০৬ অব্দে যবন কর্ত্তৃক মগধ জয় হইল। প্রভূত রত্নরাশি সঞ্চিত করিয়া বিজয়ী সেনাপতি

বখ্‌তিয়ার খিলিজি রাজপ্রতিনিধির চরণে উপঢৌকন প্রদান করিলেন।

কুতব-উদ্দীন প্রসন্ন হইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজিকে পূর্ব্বভারতের আধিপত্যে নিযুক্ত করিলেন। গৌরবে বখ্‌তিয়ার খিলিজি রাজ-প্রতিনিধির সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন।

কেবল ইহাই নহে, বিজয়ী সেনাপতির সম্মানার্থে কুতব-উদ্দিন মহাসমারোহ পূর্ব্বক উৎসবাদির জন্য দিনাবধারিত করিলেন।

উৎসববাসর আগত হইল। প্রভাতাবধি “রায় পিথোরার” প্রস্তরময় দুর্গের প্রাঙ্গণভূমি জনাকীর্ণ হইতে লাগিল। সশস্ত্রে, শত শত সিন্ধুনদপারবাসী শ্মশ্রুল যোদ্ধৃবর্গ রঙ্গাঙ্গনের চারিপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল; তাহাদিগের করস্থিত উন্নতফলক বর্শার অগ্রভাগে প্রাতঃসূর্য্যকিরণ জ্বলিতে লাগিল। মালাসংবদ্ধ কুসুমদামের ন্যায় তাহাদিগের বিচিত্র উষ্ণীষশ্রেণী শোভা পাইতে লাগিল। তৎপশ্চাতে দাস, শিল্পী প্রভৃতি অপর মুসলমানেরা বিবিধ বেশভূষা করিয়া

দণ্ডায়মান হইল। যে দুই এক জন হিন্দু কৌতূহলের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া, সাহসে ভর করিয়া রঙ্গদর্শনে আসিয়াছিল, তাহারা তৎপশ্চাতে স্থান পাইল, অথবা স্থান পাইল না, কেন না, যবনদিগের বেত্রাঘাত-পীড়িত এবং ভীত হইয়া অনেককে পলায়ন করিতে হইল।

রাজপ্রতিনিধি সদলে সমাগত হইয়া রঙ্গাঙ্গনের শিরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন রহস্য আরম্ভ হইল। প্রথমে মল্লদিগের যুদ্ধ, পরে খড়্গী, শূলী, ধানুকী, সশস্ত্র অশ্বারোহীর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরে মত্ত সেনামাতঙ্গ সকল মাহুতসহিত আনীত হইয়া নানাবিধ ক্রীড়াকৌশল দেখাইতে লাগিল। দর্শকেরা মধ্যে মধ্যে একতানমনে ক্রীড়া সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে আপন আপন মন্তব্য সকল পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এক স্থানে কয়েকটি বর্ষীয়ান্ মুসলমান একত্র হইয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন।

এক জন কহিল, "সত্য সত্যই কি পারিবে?"

অপর উত্তর করিল, "না পারিবে কেন? ঈশ্বর

যাহাকে সদয়, সে কি না পারে? রোস্তম পাহাড় বিদীর্ণ করিয়াছিল, তবে বখ্‌তিয়ার যুদ্ধে একটা হাতী মারিতে পারিবে না?"

তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "তথাপি উহার ঐ ত বানরের ন্যায় শরীর, এ শরীর লইয়া মত্তহস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে সাহস করা পাগলের কাজ।"

প্রথম প্রস্তাবকর্ত্তা কহিল, "বোধ হয়, খিলিজি-পুত্র এক্ষণে তাহা বুঝিয়াছে; সেই জন্য এখনও অগ্রসর হইতেছে না।"

আর এক ব্যক্তি কহিল, "আরে, বুঝিতেছ না, বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুর জন্য পাঁচ জন ষড়যন্ত্র করিয়া এই এক উপায় করিয়াছে। বেহার জয় করিয়া বখ্‌তিয়ারের বড় দম্ভ হইয়াছে। আর রাজপ্রসাদ সকলই তিনি একক ভোগ করিতেছেন। এই জন্য পাঁচ জনে বলিল যে, বখ্‌তিয়ার অমানুষ বলবান্, চাহি কি মত্ত হাতী একা মারিতে পারে। কুতব-উদ্দীন তাহা দেখিতে চাহিলেন। বখ্‌তিয়ার দম্ভে লঘু হইতে পারিলেন না, সুতরাং অগত্যা স্বীকার করিয়াছেন।"

এই বলিতে বলিতে রঙ্গাঙ্গনমধ্যে তুমুল কোলাহল-ধ্বনি সংঘোষিত হইল। দ্রষ্টৃবর্গ সভয়চক্ষে দেখিলেন, পর্ব্বতাকার, শ্রাবণের দিগন্তব্যাপী জলদাকার, এক মত্ত মাতঙ্গ মাহুতকর্ত্তৃক আনীত হইয়া, রঙ্গাঙ্গনমধ্যে দুলিতে দুলিতে প্রবেশ করিল। তাহার মুহুর্মুহুঃ শুণ্ডাস্ফালন, মুহুর্মুহুঃ বিপুল কর্ণতাড়ন, এবং বিশাল বঙ্কিম দন্তদ্বয়ের অমলশ্বেত স্থির শোভা দেখিয়া দর্শকেরা সভয়ে পশ্চাদ্গত হইয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাদপসারী দর্শকদিগের বস্ত্রমর্ম্মরে, ভয়সূচক বাক্যে, এবং পদধ্বনিতে কিয়ৎক্ষণ রঙ্গাঙ্গনমধ্যে অস্ফুট কলরব হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যে সে কলরব নিবৃত্ত হইল।

কৌতূহলের আতিশয্যে সেই জনাকীর্ণ স্থল একেবারে শব্দহীন হইল। সকলে রুদ্ধনিশ্বাসে বখ্‌তিয়ার খিলিজির রঙ্গপ্রবেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন বখ্‌তিয়ার খিলিজিও রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া গজরাজের সম্মুখীন হইয়া দেখা দিলেন। যাহারা পূর্ব্বে তাঁহাকে চিনিত না, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, অপিচ বিরক্ত হইল।

তাঁহার শরীরে বৈর-লক্ষণ কিছুই ছিল না। তাঁহার দেহের আয়তন অতি ক্ষুদ্র, গঠন অতি কদর্য্য। শরীরের সকল স্থানই দোষবিশিষ্ট। তাঁহার বাহুযুগল বিশেষ কুরূপশালিত্বের কারণ হইয়াছিল। "আজানু-লম্বিত বাহু" সুলক্ষণ হইলে হইতে পারে, কিন্তু দেখিতে কদর্য্য সন্দেহ নাই। বখ্‌তিয়ারের বাহুযুগল জানুর অধোভাগ পর্য্যন্ত লম্বিত, সুতরাং আরণ্যনরের সহিত তাঁহার দৃশ্যগত সাদৃশ্য লক্ষিত হইত। তাঁহাকে দেখিয়া এক জন মুসলমান আর এক জনকে কহিল, "ইনিই বেহার জয় করিয়াছেন? এইশরীরে এত বল?"

এক জন অস্ত্রধারী হিন্দু যুবা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল, "পবননন্দন হনু কলিকালে মর্কটরূপ ধারণ করিয়াছেন।"

যবন কহিল, "তুই কি বলিস্ রে কাফের?"

হিন্দু পুনরপি কহিল,"পবননন্দন কলিতে মর্কটরূপ ধারণ করিয়াছেন।"

যবন কহিল, "আমি তোর কথা বুঝিতে পারি-তেছি না, তুই তীর-ধনু লইয়া আসিয়াছিস্ কেন?"

হিন্দু কহিল, "আমি বাল্যকালে তীর-ধনু লইয়া খেলা করিতাম। সেই অবধি অভ্যাসদোষে তীর-ধনু আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।"

যবন কহিল, "হিন্দুদিগের সে অভ্যাসদোষ ক্রমে ঘুচিতেছে। এ খেলায় আর এখন কাফেরের সুখ নাই। সুভান এল্লা! এ কি?"

এই বলিয়া যবন রঙ্গভূমি প্রতি অনিমেষ-লোচনে চাহিয়া রহিল। বখ্‌তিয়ার নিজ দীর্ঘভুজে এক শাণিত কুঠার ধারণ করিয়া বারণরাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু বারণ তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া ইতস্ততঃ সমযোগ্য প্রতিযোগীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। ক্ষুদ্রকায় এক জন মনুষ্য যে তাহার রণাকাঙ্ক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা তাহার হস্তিবুদ্ধিতে উপজিল না। বখ্‌তিয়ার মাহুতকে অনুজ্ঞা করিলেন যে, হস্তীকে তাড়াইয়া আমার উপর দাও। মাহুত গজশরীরে চরণাঙ্গুলি-সঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত করিয়া বখ্‌তিয়ারকে আক্রমণ করিল। বখ্‌তিয়ার নিমেষমধ্যে করিশুণ্ডপ্রক্ষেপ হইতে ব্যবহিত হইয়া শুণ্ডোপরি তীব্র

কুঠারাঘাত করিল। যূথপতি ব্যথায় ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং ক্রোধে পতনশীল পর্ব্বতবৎ বেগে প্রহারকারীর প্রতি ধাবমান হইল। কুঠারাঘাতে সে বেগরোধের কোন সম্ভাবনা রহিল না। দ্রষ্টৃবর্গ সকলে দেখিল যে, পলকমধ্যে বখ্‌তিয়ার কর্দ্দম-পিণ্ডবৎ দলিত হইবেন। সকলে বাহূত্তোলন করিয়া "পলাও পলাও" শব্দ করিতে লাগিল। কিন্তু বখ্‌তিয়ার মগধ জয় করিয়া আসিয়া রঙ্গভূমে পলায়নতৎপর হইবেন কি প্রকারে? তিনি তদপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া হস্তিপদতলে প্রাণত্যাগ মনে মনে স্বীকার করিলেন।

করিরাজ আত্মবেগভরে তাঁহার পৃষ্ঠের উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল; একেবারে বখ্‌তিয়ারকে দলিত করিবার মানসে নিজ বিশাল চরণ উত্তোলন করিল; কিন্তু তাহা বখ্‌তিয়ারের স্কন্ধে স্থাপিত হইতে না হইতেই ক্ষয়িত মূল অট্টালিকার ন্যায়, সশব্দে রজ উৎকীর্ণ করিয়া অকস্মাৎ যূথপতি ভূতলে পড়িয়া গেল। অমনি তাহার মৃত্যু হইল।

যাহারা সবিশেষ দেখিতে না পাইল, তাহারা বিবেচনা করিল যে, বখ্‌তিয়ার খিলিজি কোন কৌশলে হস্তীর বধসাধন করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ মুসলমান-মণ্ডলীমধ্যে ঘোরতর জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। কিন্তু অন্যে দেখিতে পাইল যে, হস্তীর গ্রীবার উপর একটী তীর বিদ্ধ রহিয়াছে। কুতবউদ্দীন বিস্মিত হইয়া সবিশেষ জানিবার জন্য মৃত গজের নিকট আসিলেন, এবং স্বীয় অস্ত্রবিদ্যার প্রভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, এই শরবেধই হস্তীর মৃত্যুর একমাত্র কারণ; বুঝিলেন যে, শর অসাধারণ বাহুবলে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্থূল হস্তিচর্ম্ম, তৎপরে হস্তিগ্রীবার বিপুল মাংসরাশি 'ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক বিদ্ধ করিয়াছে। শরনিক্ষেপকারীর আরও এক অপূর্ব্ব নৈপুণ্য লক্ষণ দেখিলেন। গ্রীবার যে স্থানে মস্তিষ্ক এবং' মেরুদণ্ডমধ্যস্থ মজ্জার সংযোগ হইয়াছে, সেই স্থানেই তীর প্রবিদ্ধ হইয়াছে। তথায় সূচীমাত্র প্রবিষ্ট হইলে জীবের প্রাণ বিনষ্ট হয়—পলক-মাত্রও বিলম্ব হয় না। এই স্থানে শর বিদ্ধ না হইলে কখনই বখ্‌তিয়ারের রক্ষা সিদ্ধ হইত না। কুতব-

উদ্দীন আরও দেখিলেন, তীরের গঠন সাধারণ হইতে ভিন্ন। তাহার ফলক অতি দীর্ঘ, সূক্ষ্ম, এবং একটী বিশেষ চিহ্নে অঙ্কিত। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে ব্যক্তি এই শরত্যাগ করিয়াছিল, সে অসাধারণ বাহুবলশালী; তাহার শিক্ষা বিচিত্র, এবং হস্ত অতি লঘুগতি।

কুতব-উদ্দীন গজঘাতী প্রহরণ হস্তে গ্রহণ করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন যে, "এ তীর কে ত্যাগ করিয়াছিল?"

কেহ উত্তর দিল না। কুতব-উদ্দীন পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ তীর কে ত্যাগ করিয়াছিল?"

যে যবন জনৈক হিন্দু শস্ত্রধারীকে তাড়না করিয়াছিল, সে এইবার কহিল, "জাঁহাপনা! এক জন কাফের এই স্থানেই দাঁড়াইয়া তীর মারিয়াছিল দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাকে আর দেখিতেছি না।"

কুতব-উদ্দীন ভ্রূকুটী করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিমনা হইয়া রহিলেন; পরে কহিলেন, "বখতিয়ার খিলিজি মত্ত-হস্তী যুদ্ধে বধ করিয়াছেন, তোমরা তাঁহার প্রশংসা

কর। কোন কাফের তাঁহার গৌরবের লাঘব জন্মাই-বার অভিলাষে অথবা তাঁহার প্রাণসংহার জন্য এই তীরক্ষেপ করিয়া থাকিবে। আমি তাহার সন্ধান করিয়া সমুচিত দণ্ডবিধান করিব। তোমরা সকলে গৃহে গিয়া আজিকার দিন আনন্দে যাপন করিও।"

ইহা শুনিয়া দর্শকগণ ধন্যবাদপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে উদ্‌যুক্ত হইল। ইত্যবসরে কুতবউদ্দীন এক জন পারিষদ্‌কে হস্তস্থিত তীর প্রদান করিয়া তাহার কর্ণে কর্ণে উপদেশ দিলেন; "যাহার নিকট এইরূপ তীর দেখিবে, তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। অনেক সন্ধান কর।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গজহস্তা।

কুতবউদ্দীন, দেওয়ানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বখ্‌তিয়ার খিলিজি এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গ লইয়া কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, এমত সময়ে কয়েক জন সৈনিক

পূর্ব্বপরিচিত হিন্দুযুবাকে সশস্ত্র ধৃত করিয়া আনয়ন করিল।

রক্ষিগণ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া যুবাকে রাজপ্রতিনিধি-সমক্ষে উপস্থিত করিলে, কুতবউদ্দীন বিশেষ মনোযোগ-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যুবকের অবয়বও নিরীক্ষণযোগ্য। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের ন্যূন। শরীর ঈষন্মাত্র দীর্ঘ, এবং অনতি-স্থূল ও বলব্যঞ্জক। মস্তক যেরূপ পরিমিত হইলে শরী-রের উপযোগী হইত, তদপেক্ষা বৃহৎ, এবং তাহার গঠন অতি রমণীয়। ললাট প্রশস্ত বটে, কিন্তু অল্পবয়ঃপ্রযুক্ত অতি বৃহৎ, তাহার মধ্যদেশে "রাজদণ্ড" নামে পরিচিত শিরা প্রকটিত। ভ্রূযুগল সূক্ষ্ম, তরললোম, তত্তলস্থ অস্থি কিছু উন্নত। চক্ষুঃ বিশেষ আয়ত নহে, কিন্তু অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য-গুণে আয়ত বলিয়া বোধ হইত। নাসা মুখের উপযোগী; অত্যন্ত দীর্ঘ নহে, কিন্তু অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র, সর্ব্বদা পরস্পরে সংশ্লিষ্ট; পার্শ্বভাগে অস্পষ্ট মণ্ডলার্দ্ধ রেখায় বেষ্টিত। ওষ্ঠে ও চিবুকে কোমল নবীন রোমাবলী শোভা পাইতেছিল। অঙ্গের গঠন,

বলসূচক হইলেও কর্কশতাশূন্য। বর্ণ প্রায় সম্পূর্ণ গৌর। অঙ্গে কবচ, মস্তকে উষ্ণীষ, পৃষ্ঠে তূণীর লম্বিত, করে ধনুঃ, কটিবন্ধে অসি।

কুতব-উদ্দীন যুবাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া যুবা ভ্রূকুটী করিলেন, এবং কুতবকে কহিলেন, "আপনার কি আজ্ঞা?"

শুনিয়া কুতব হাসিলেন; বলিলেন, "তুমি কি শরত্যাগে আমার হস্তী বধ করিয়াছ?"

যুবা। করিয়াছি।

কু। কেন তুমি আমার হাতী মারিলে?

যুবা। না মারিলে হাতী আপনার সেনাপতিকে মারিত।

ইহা শুনিয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বলিলেন, "হাতী আমার কি করিত?"

যুবা। চরণে দলিত করিত।

বখ্‌তি। আমার কুঠার কি জন্য ছিল?

যুবা। হস্তীকে পিপীলিকা-দংশনের ক্লেশানুভব করাইবার জন্য।

কুতব উদ্দীনের ওষ্ঠাধরপ্রান্তে অল্পমাত্র হাস্য প্রকটিত হইল।

সেনাপতি অপ্রতিভ হয়েন দেখিয়া কুতব-উদ্দীন তখন কহিলেন, "তুমি হিন্দু, মুসলমানের বল জান না। সেনাপতি অনায়াসে কুঠারাঘাতে হস্তী বধ করিত। তথাপি তুমি যে সেনাপতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তীরত্যাগ করিয়াছিলে—ইহাতে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাকে পুরস্কৃত করিব।" এই বলিয়া কুতব-উদ্দীন কোষাধ্যক্ষের প্রতি যুবাকে শতমুদ্রা দিতে অনুমতি করিলেন।

যুবা শুনিয়া কহিলেন, "যবনরাজ প্রতিনিধি! শুনিয়া লজ্জিত হইলাম। যবন সেনাপতির জীবনের মূল্য শত মুদ্রা ?"

কুতব-উদ্দীন কহিলেন, "তুমি রক্ষা না করিলে যে সেনাপতির জীবন বিনষ্ট হইত, এমত নহে। তথাপি সেনাপতির মর্য্যাদানুসারে দান উচিত বটে। তোমাকে সহস্র মুদ্রা দিতে অনুমতি করিলাম।"

যুবা। যবনের বদান্যতায় অতি সন্তুষ্ট হইলাম।

আমিও আপনাকে প্রতিপুরস্কৃত করিব। যমুনাতীরে আমার বাসগৃহ, সেই পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এক জন লোক দিলে, আমি আপনার পুরস্কার পাঠাইব। যদি রত্ন অপেক্ষা মুদ্রায় আপনার আদর অধিক হয়, তবে আমার প্রদত্ত রত্ন বিক্রয় করিবেন। দিল্লীর শ্রেষ্ঠীরা তদ্বিনিময়ে আপনাকে লক্ষ মুদ্রা দিবে।

কুতব-উদ্দীন কহিলেন, "হইতে পারে, তুমি ধনী। এজন্য সহস্র মুদ্রা তোমার গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু তোমার বাক্য সম্মানসূচক নহে—তুমি সদভিপ্রেত কার্য্যে উদ্যত হইয়াছিলে বলিয়া অনেক ক্ষমা করিয়াছি—অধিক ক্ষমা করিব না। আমি যে তোমার রাজার প্রতিনিধি, তাহা তুমি কি বিস্মৃত হইলে?"

যুবা। আমার রাজার প্রতিনিধি ম্লেচ্ছ নহে।

কুতব-উদ্দীন সকোপ-কটাক্ষে কহিলেন, "তবে কে তোমার রাজা? কোন্ দেশে তোমার বাস?"

যুবা। মগধে আমার বাস।

কুত। মগধ এ বখ্তিয়ার কর্তৃক যবন-রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

যুবা। মগধ দস্যুকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াছে।

কুত। দস্যু কে?

যুবা। বখ্‌তিয়ার খিলিজি।

কুতব-উদ্দীনের চক্ষে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। কহিলেন, "তোমার মৃত্যু উপস্থিত।"

যুবা হাসিয়া কহিলেন, "দস্যুহস্তে?"

কুত। আমার আজ্ঞায় তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। আমি যবন-সম্রাটের প্রতিনিধি।

যুবা। আপনি যবন-দস্যুর ক্রীতদাস।

কুতব-উদ্দীন ক্রোধে কম্পিত হইলেন। কিন্তু নিঃসহায় যুবকের সাহস দেখিয়াও বিস্মিত হইলেন। কুতব-উদ্দীন রক্ষিবর্গকে আজ্ঞা করিলেন, "ইহাকে বন্ধন করিয়া বধ কর।"

বখতিয়ার খিলিজি ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, পরে কুতবকে বিনয় করিয়া কহিলেন, "প্রভো! এই হিন্দু বাতুল, নচেৎ অনর্থক কেন মৃত্যুকামনা করিবে? ইহাকে বধ করাতে অপৌরুষ।"

যুবা বখ্‌তিয়ারের মনের ভাব বুঝিয়া হাসিলেন;

বলিলেন, "খিলিজি সাহেব! বুঝিলাম, আপনি অকৃতজ্ঞ নহেন। আমি হস্তিচরণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছি বলিয়া আপনি আমার প্রাণ রক্ষার জন্য যত্ন করিতেছেন; কিন্তু নিবৃত্ত হউন। আমি আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় হস্তিবধ করি নাই। আপনাকে এক দিন স্বহস্তে বধ করিব বলিয়া আপনাকে হস্তিচরণ হইতে রক্ষা করিয়াছি।"

রাজপ্রতিনিধি এবং সেনাপতি উভয়ে উভয়ের মুখাবলোকন করিলেন। খিলিজি কহিলেন, "তুমি নিশ্চয় বাতুল। আপনি প্রাণ হারাইতে বসিয়াছ, অন্যে রক্ষা করিতে গেলে তাহারও প্রতিবন্ধক হইতেছ। ভাল, আমাকে স্বহস্তে বধ করিবার এত সাধ কেন?"

যুব। কেন? তুমি আমার পিতৃরাজ্যাপহরণ করিয়াছ। আমি মগধরাজ পুত্র। যুদ্ধকালে হেমচন্দ্র মগধে থাকিলে তাহা যবনদস্যু জয় করিতে পারিত না। অপহারী দস্যুর প্রতি রাজদণ্ড বিধান করিব।

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, "এখন বাঁচিলে ত?"

কুতব-উদ্দিন কহিলেন, "তোমার যে পরিচয় দিতেছ এবং তোমার যেরূপ স্পর্দ্ধা, তাহাতে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। তুমি এক্ষণে কারাগারে বাস করিবে। পশ্চাৎ তোমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবে। রক্ষিগণ এখন ইহাকে কারাগারে লইয়া যাও।"

রক্ষিগণ হেমচন্দ্রকে বেষ্টিত করিয়া চলিল। কুতব উদ্দীন তখন বখ্‌তিয়ারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সাহেব, এই হিন্দুকে কি ভাবিতেছেন?"

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, "অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ। যদি কখন হিন্দুসেনা পুনর্ব্বার সমবেত হয়, তবে এ ব্যক্তি সকলকে অগ্নিময় করিবে।"

কুত। সুতরাং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পূর্ব্বেই নির্ব্বাণ করা কর্ত্তব্য।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, ইত্যবসরে দুর্গমধ্যে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। ক্ষণপরে পুররক্ষিগণ আসিয়া সংবাদ দিল, "বন্দী পলাইয়াছে।"

কুতব-উদ্দীন ভ্রূভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে পলাইল?"

রক্ষিগণ কহিল, "দুর্গমধ্যে একজন যবন একটা অশ্ব লইয়া ফিরাইতেছিল। আমরা বিবেচনা করিলাম যে, কোন সৈনিকের অশ্ব। আমরা ঘোটকের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। তাহার নিকটে আসিবামাত্র বন্দী চকিতের ন্যায় লম্ফ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিল এবং অশ্বে কশাঘাত করিয়া বায়ুবেগে দুর্গদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

কুত। তোমরা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে না কেন?

রক্ষী। আমরা অশ্ব আনিতে আনিতে সে দৃষ্টি-পথের অতীত হইল।

কুত। তীর মারিলে না কেন?

রক্ষী। মারিয়াছিলাম। তাহার কবচে ঠেকিয়া তীর সকল মাটীতে পড়িল।

কুত। যে যবন অশ্ব লইয়া ফিরাইতেছিল, সে কোথায়?

রক্ষী। প্রথমে আমরা বন্দীর প্রতিই মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। পশ্চাৎ অশ্বপালের সন্ধান করায় তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

বিষবৃক্ষ।

—ঃ*ঃ—

এই পুস্তকের বিশেষ কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বঙ্গদর্শনে যে অবস্থায় বিষবৃক্ষ প্রকাশিত হইয়াছিল, শেষ সংস্করণেও বিষবৃক্ষের প্রায় তদ্রূপ অবস্থা রহিয়া গিয়াছে। দুই এক স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিত্যক্ত অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শুনে কীচক মেরে উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী।—ইহার পরে ঃ—

আর একজন কোথা হইতে গায়িল ঃ—

আমার নাম হীরা মালিনী,
মাতাল হয়ে বাচাল হলো, দেখিতে
নারি আমি ধনী।

দেবেন্দ্র জড়ীভূত কণ্ঠে বলিলেন, "বা! তুমি ধনী কে? ভূত না প্রেতিনী?"

তখন ঠুন! ঠুন ঝনাৎ! প্রেতিনী আসিয়া বাবুর কাছে বসিল। প্রেতিনীর ঢাকাই সাড়ী পরা, হাতে বাজু বালা, কালো চুড়ি; গলায় চিক, কণ্ঠমালা; কানে ঝুমকা, কাঁকালে গোট; পায়ে ছয় গাছা মল। গায়ে আতর গোলাবের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে। দেবেন্দ্র প্রেতিনীর মুখের কাছে আলো ধরিলেন। চিনিতে পারিলেন না। চুপি চুপি মনের ঝোঁকে বলিলেন, "বাবা কোন্ গাছ থেকে?" শেষে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "পারলেম্ না বাপ্!" * * *

হীরা স্বচ্ছন্দে দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছ, বৈষ্ণবী দিদি?"

তখন মাতাল বলিল, "বৈষ্ণবী দিদি! ও বাবা! ও গাঁয়ের দত্ত বাড়ীর পেত্নী নাকি?"

এই বলিয়া আবার আলো স্ত্রীলোকের মুখের কাছে লইয়া গেল। বলিল, "তারপর মালিনী মাসী—কি মনে কোরে?"

হীরা বলিল, "মনে করে আর কি? দত্তের বাড়ী

এক ডাকাতে দিনে ডাকাতি করিয়া এসেছে, তাই ডাকাত ধরতে এয়েছি।”

শুনিয়া বাবু গান ধরিলেন।

“আমার আঁটা ঘরে সিঁধ মেরেছে,
কোন্ ডাকাতের এ ডাকাতি।
যৌবনের জেলখানাতে রাখ্‌বো
তারে দিবারাতি॥
মন বাক্‌শ তার লজ্জা তালা,
কল কোরে তার ভাঙ্গলো ডালা,
লুটে নিলে প্রেমনিধি তার,
ভাঙ্গা বাক্‌শে মেরে নাতি॥

তা, ডাকাতি করতে গিয়ে থাকি, গিয়েছি বাপ— কিন্তু হীরা মতির জন্যে নয়, কেবল ফুলটা ফলটা খুঁজি।”

হীরা। কি ফুল—কুন্দ?

দে। Hurrah! কুন্দ কলি!—Three cheers for কুন্দনন্দিনী! বন্দ্যতে মন্দ জাতিকং! কুন্দনন্দি-ন্দি-ন্দিনী!

বলিয়াই গীত।—

কুন্দকলি মন্দ বলি নিন্দে করে কাল ভ্রমরা—

তবে—ঘেঁচুবনের মেঠো মালিনী মাসি, কি মনে কোরে?

হী। কুন্দনন্দিনীর কাছ থেকে।

দে। Hurrah! Hurrah! for কুন্দনন্দিনী। বল, বলত, বলত কি বলিয়া পাঠ্‌য়েছে? না হবে কেন? আজ তিন বৎসরের পীরিত।

হীরা বিস্মিত হইল। আরও বিশেষ শুনিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিলঃ—"এতদিনের পীরিত তাহা জান্‌তেম না। প্রথম পীরিত হলো কেমন করে?"

দে। আরে, ভারি নাকি শক্ত কথা! তারার সহিত বন্ধুতা থাকাতে তাকে বলিলাম, বউ দেখা—তা' সে বউ দেখালে। সেই অবধি পীরিত। কিন্তু এক গেলাস খাও বাপ্‌ সুধু মুখে আর ভাল লাগে না।

দেবেন্দ্র তখন এক পাত্র ব্রাণ্ডি হীরার হাতে দিল। হীরা তাহা হাতে করিয়া আবার নামাইয়া রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর?"

দে। তারপর তোমাদের গিন্নীর জ্বালায় দিন কত দেখা শুনা হয় নাই। তারপর এখন বৈষ্ণবী হয়ে যাতায়াত করিতেছি। ছুঁড়ি বড় ভয় তরাসে; কিছুতে কথা কয় না। তবে আজি যে রকম ফুশ্‌লে এয়েছি, তাতে ছাড়ায় না—না হবে কেন—আমি দেবেন্দ্র।—অহং দেবেন্দ্র বাবু—হেউ! শিখে হো ছল ভেলা নট নাগর—তারপর মালিনী মাসি? কি বলিয়া পাঠ্‌য়েছে? ভাল আছ ত, মালিনী মাসি? প্রাতঃ প্রণাম।

হীরা প্রায়াবরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে দেবেন্দ্রের এই সকল কথা বাহির হইতে শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। পরে হাসি সম্বরণ করিয়া বলিল, "রাত্রি ঢের হইল্ল, এখন প্রণাম হই।" এই বলিয়া হীরা মৃদু হাসি হাসিয়া, দণ্ডবৎ হইয়া, প্রস্থান করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

(অনাথিনী)

"ও সূর্য্যমুখি! রাক্ষসি! ওঠ! দেখ আপনার কীর্ত্তি দেখ! অনাথিনীকে ফেরাও।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে

পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত।

শ্রীমতী মিরিয়ম নাইট, "বিষবৃক্ষ" ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

বিষবৃক্ষ ইংরাজিতে হইল, "Poison Tree"— মহাপণ্ডিত Edwin Arnold, Poison treeর একটা ভূমিকা লিখিয়া বলিয়াছিলেন,—"I soon found that what was begun as a literary task became a real and singular pleasure, by reason of the author's vivid narrative, his skill in delineating character, and, beyond all, the striking and faithful pictures of Indian life with which his tale is filled. * * Five years ago, Sir William Herschel, of the Bengal Civil Service, had the intention of translating this Bisha Briksha ;, but surren-

dered the task, with the author's full consent, to Mrs. Knight. * *

"The author of the "Poison Tree" is Babu Bankim Chandra Chatterjee of superior intellectual acquisitions, who ranks unquestionably as the first living writer of fiction in his Presidency. * * It will be confessed, I think, that the reputation of Bankim Babu is well deserved, and that Bengal has here produced a writer of true genius, whose vivacious invention, dramatic force, and purity of aim, promise well for the new age of Indian vernacular literature."

"Among Bengali authors no one held a higher place in his own line than the late Bankim Chandra Chatterji. He rendered good service in a number of districts;

while in charge of the Khulna Snb-division he helped very largely in suppressing river dacoities and establishing peace and order in the eastern canals." *

"Like Madhusudan Dutt, Bankim Chandra Chatterji was ridiculed for his new departure from the high ways of prose-writing in Bengal. Critics are ready-made, and not a few of them condemned in bitter language his style, his composition, the plot of his story, and the audacity of his conceptions. But Bankim Chandra outlived all cynical criticism, and succeeded in inaugarating a new era of prose literature in Bengal—" Pillai—Representative Indians—Page 76.

* Buckland's Bengal under the Lieutenant Governors. Page 1078.

"His Durgeshanandini was the first, and is unquestionably the best, novel in Bengal. The Kapalkundala, though equally good, is not so well spoken of by native readers. The style is essentially Babu Bankim's own; and we meet with the same witticisms, the sly hits, and the same displeasing combination of the grave with the ludicrous. The characters are all what we should expect to see in real life; and the vivid descriptions of scenery, natural and artificial, always our author's *forte*, are so telling that scarcely any Bengali novelist of the present day except, perhaps, the writer of *Bangadhipparajaya* can hope to match him in the line—" Calcutta Review, Vol. LVII.

"We have now before us an historical prose romance (Durgeshanandini) by a Bengali author, which rejecting all the mythological times, has fixed its scene in the days of the great Emperor Akbar, and, without a single marvel of magic or metampsychosis, seeks its sole interest in human passion and life's daily struggles with adverse circumstances. The book has already reached its fourth edition, and we may therefore fairly consider it as the successful inaugurator of a new kind of literature in Bengal. He (Bankim Chandra) has since written several novels in Bengali ; but the one which we have taken as our subject is the most successful with his countrymen ; and we think it is well worthy some notice in England, as the

first attempt to transplant into India our own historical novel.—"Professor Cowell—Macmillan's Magazine, Vol XXV. Page 455.

ইংলণ্ডের বিখ্যাত পত্র Punch বিষবৃক্ষের অনুবাদ পড়িয়া ১৮৮৫ সালের ৩রা জানুয়ারির কাগজে লিখিয়াছেন :—

"THE POISON TREE."

You ought to read the Poison Tree
'Tis Fisher Unwin's copyright—
By Bankim Chandra Chatterjee!

'Tis taken from the Bengali,
Translated well by Mrs. Knight—
You ought to read the Poison Tree.

'Tis published in one vol.—not three—
A story quaint and apposite;
By Bankim Chandra Chatterjee

As Mr. Edwin Arnold he—
A learned preface doth indite;
You ought to read the Poison Tree.

Though bored by novels you may be—
Don't miss this tale, by oversight,
By Bankim Chandra Chatterjee.

'Twill whet, this novel—noveltee,
The novel reader's appetite.
You ought to read the Poison Tree
By Bankim Chandra Chatterjee.

শ্রীমতী মিরিয়ম নাইট, কৃষ্ণকান্তের উইলেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন। Oxford Universityর মহাযশস্বী Blumhardt সাহেব, সেই অনুবাদের একটা ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। ভূমিকাটুকু অতি সুন্দর। কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"Bankim Chandra Chatterjee was un-

questionably the greatest novelist that India has ever produced. No other writer has done so much to improve the style, and to raise the tone of Bengali literature. His severe criticisms on the worthless and ephemeral productions of so many of his fellow countrymen, his fearless exposure of the faults and shortcomings of Hindu social life, and of the evils arising from a corrupt and superstitious form of Hindu religion, have brought about a complete revolution in the history of Bengali literature.

"He was himself a vigorous author. His works display a wonderful power of description and delineation of human life and character, which render them so deeply interesting aad instructive.

"Towards the close of his life Bankim Chandra appeared as an advocate of a reformed system of Hindu religion, and a teacher of the sublime philosophy of the Bhagavadgita.

"Bankim Chandra was also an able exponent of intellectual and scientific research. He was himself a perfect master of the English language, as well as of Sanskrit."

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার মূল্যবান পুস্তকে (Literature of Bengal) লিখিয়াছেন ;—

"Bankim Chandra Chatterji is in prose what Madhu Sudan Dutt is in verse,—the founder of a new style—the exponent of a new idea. In creative imaginations, in gorgeous description, in power to conceive and in skill to describe, Madhu Sudan and

Bankim Chandra stand apart from the other writers of the century; they are the first, the second is nowhere. And if the poet's conceptions are more lofty and more sublime, the novelist's conceptions are more varied, have more of human interest, and appeal more touchingly to our softer emotions. The palm must be given to the poet who has bodied forth beings of heaven and earth and the lower regions in gorgeous verse which sprang into existence like an echo to his ideas; but the reader, after he has traversed the universe on the wings of the mighty poet, will descend with a sense of pleasure to the homely scenes of the novelist, peopled with figures and faces so true and life-like, so sparkling and animated, so rich in their variety and

beauty, that they seem to be a world by themselves, created by the will of the great enchanter !"

R. W. Fraser. L, L, B. তাঁহার Literary history of India পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"Bankim Chandra Chatterji is the first great creative genius modern India has produced. For the Western reader his novels are a revelation of the inward spirit of Indian life and thought.

"As a creative artist he soars to heights unattained by Tulsi Das, the first true dramatic genius India saw. To claim him solely as a product of Western influence would be to neglect the heritage he held ready to his han l from the poetry of his own country.

"The English reader must not be surprised if, in the novels of the greatest novelist India has seen, there is much of Eastern form, much of poetic fancy and spiritual mysticism alien to a Western craving for objective realism. Bankim Chandra Chatterji, with all the insight of Eastern poetic genius, with all the artistic delicacy of touch so easily attained by the subtle deftness of a high-caste native of India, or a Pierre Loti, weaves a fine-spun drama of life, fashioning his characters and painting their surroundings with the same gentle touch, as though his fingers worked amid the frail petals of some flower, or moved along the lines of fine silk, to frame therewith a texture as unsubstantial as the dreamy fancies

with which all life is woven, as warp and woof.

* * *

"The novel (Kapalkundala) throughout moves steadily to its purpose. There is no over-elaboration, no undue working after effect; everywhere there are signs of the work of an artist whose hand falters not as he chisels out his lines with classic grace. The force that moves the whole with emotion, and gives to it its subtle spell, is the mystic form of Eastern thought that clearly shows the new forms that lie ready for inspiring a new school of fiction with fresh life. Outside the "Mariage de Loti" there is nothing comparable to the "Kapalkundala" in the history of Western fiction, although the novelist himself,

and many of his native admirers, see grounds for comparing the works of BankimBabu with those of Sir Walter Scott, probably because they are outwardly historical.

"In Nagendra's love for Kunda the novelist declares that he wished to depict the fleeting love of passion, as sung by Kalidasa, Byron, and Jaya Deva, and in his love for Surjyamukhi, the deep love which sacrifices one's own happiness for the love of another, as sung by Shakespeare, Valmiki, and Madame de Stael.

"He leaves us in doubt whether he is depicting life as it throbbed around him, or whether he has hemmed in his characters with a surrounding of Eastern mysticism and romantic reserve born of Western conventionality."

উক্ত পুস্তকের আর এক স্থানে Fraser সাহেব বলিয়া গিয়াছেন :—

Men such as Rammohan Roy, Keshab Chandra Sen, Madhusudan Dutt, Bankim Chandra Chatterji, Kasi Nath Trimbak Telang are no bastard bantlings of a Western civilisation; they were creative geniuses worthy to be reckoned in the history of India with such men of old as Kalidas, Chaitanya, Jayadeva, Tulsi Das and Sankaracharjya and destined in the future to shine clear as the first glowing sparks sent out in the fiery furnace where new and old were fusing."

বাঙ্গালা ভাষার ক্রমিক বিকাশ।

—:*:—

বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি-স্থান কোথায়? যে বঙ্গ-ভাষা আজি সাহিত্য-সম্পদে গৌরবশালিনী, বিবিধ ভাব-সম্ভারে সুভূষিতা, সে বঙ্গভাষার জননী কে? সংস্কৃত ভাষাই এই বঙ্গভাষার জননী। কিন্তু কেবল সংস্কৃত নহে, প্রাকৃতকেও বঙ্গভাষার জননী বলিতে হয়। সাধারণতঃ বঙ্গভাষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়,—বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও চলিত বাঙ্গালা। সংস্কৃত হইতে বিশুদ্ধ বাঙ্গালার এবং প্রাকৃত হইতে চলিত বাঙ্গালার উৎপত্তি। যখন 'কার্য্য' বলা যায়, তখন উহা সংস্কৃতপ্রসূত, আর যখন 'কাজ' বলা যায়, তখন উহাকে প্রাকৃত 'কজ্জ' শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বুঝা যায়। এইরূপ 'কর্ণ' সংস্কৃত, আবার 'কাণ' প্রাকৃত 'কন্নে'র রূপান্তর।

অনেকে বলেন, লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব-সেনের সময় হইতেই দেবনাগর অক্ষর রূপান্তরিত হইয়া

বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের বয়ঃক্রম প্রায় ৭০০ বৎসর।

আবার শুনিতে পাই, নেপালে একখানি পুস্তক আছে, তাহা বঙ্গাক্ষরে লিখিত। ঐ গ্রন্থ প্রায় ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। বাঙ্গালী প্রচারকগণ বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারার্থ নেপালে গিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই উপদেশাবলী ও কার্য্যকলাপ উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তাহা হইলে বঙ্গাক্ষরের বয়স আরও অনেক বেশী হইবেক।

বাঙ্গালী কবি।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী।

জয়দেব।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

পঞ্চদশ শতাব্দী।

কাশীরাম ও কৃত্তিবাস।

ষোড়শ শতাব্দী।

রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, কৃষ্ণদাস, রঘুনাথ দাস, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, প্রেমদাস, বলরাম দাস, গৌরী দাস, নরহরি সরকার ও মাধব।

সপ্তদশ শতাব্দী।

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ দাস, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

অষ্টাদশ শতাব্দী।

রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন, ভারতচন্দ্র রায়, রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), রাম বসু, হরু ঠাকুর ও নিতাই দাস।

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশশতাব্দীতে বঙ্গভাষার অবস্থা।

১৮০১ সালের বাঙ্গালা পদ্যের নমুনা ঃ—[লিপি-মালা, রাম বসু প্রণীত।]

মানব সৃজন বিধি করিল যখন।
সেই কালে ষড়রিপু কৈল নিয়োজন।
অতএব ভুলভ্রান্তি আছে সর্ব্ব জনে।
মানব লক্ষণ বসু রামরাম ভনে।
শতাদিত্য বসু বর্ষ পশুশ্রেষ্ঠ মাস।
পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ।

গদ্যের নমুনা ঃ—[উক্ত পুস্তক ; কাষ্ঠের অক্ষরে মুদ্রিত।]

"সম্প্রতি শিরসী দেশাধিপ নষ্টতা করিয়া আরঙ্গের নালার বাঁধাল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন তাহার প্রত্যুপকারে এখানকার লোক গিয়াছে দমন হইবেক তাহাতে কি হয় আপনকার ও অঞ্চল ঐ বাঁধালে রক্ষা পায় তাহাতে বিশেষ মনোযোগ করিবেন। এখান দিয়া যে আনুগত্য হইতে পারে ত্রুটি হইবেক না। ইচ্ছা আপনি

যাইয়া তোমার ও অঞ্চল যাহাতে রক্ষা পায় তাহা করি কিন্তু এখানে আর আর অনেক অনেক লোক ওখানকার সহিত বিপক্ষতা করিয়া নষ্টতা করিতে উদ্যত তাহারদের দমন নহিলে ওখানকার উপর বিপত্তি হওনের আটক হইতে পারে না। এই হইল তাহার বাধক তথাচ ক্রটি হইল না। কয়েক হাজার সেনা-সমেত রাজা নবকুমার আপনকার আনুগত্য নিমিত্ত প্রেরিত হইল ইহা দিয়া ক্রটি হইবেক না। আর আর নিগূঢ় প্রসঙ্গ অনেক যাহা অলিখ্য তাহা ইনি পৌচিয়া আপনকার সুগোচর করিবেন। কোন বিষয় ভাবনা করিবা না ইহা দিয়া অনেক অনুগত্য হইবেক আমিও এই লোকেরদিগের দমন করিয়া আপনকার ও অঞ্চলে অবশ্য আসিব ইহাতে সন্দেহ করিবা না ত্বরা প্রতুল করা যাইবেক।"

১৮০২ সালের বঙ্গভাষার নমুনা:—[বত্রিশ সিংহাসন, মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।]

"ঐ স্থানে এক পরম সুন্দরী স্ত্রী দিব্য সুন্দর এক পুরুষ থাকেন কিন্তু দুই জনের দুই মস্তক ছিন্ন হইয়া

পৃথক আছে মস্তকের সমীপে এক প্রস্তরে কথোকগুলি অক্ষর লেখা আছে যে উত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপনার মস্তক ছেদন করিয়া বলি দিবে তবে এই স্ত্রী পুরুষের জীব ন্যাস হবে। এই সকল দেখিয়া ধনদত্তের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। তৎপর ধনদত্ত তীর্থদর্শন করিয়া আপন গৃহে আইলেন। এক দিবস ধনদত্ত কথা-প্রসঙ্গে রাজার সমীপে এ সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার কাছে নিবেদন করিলেন। রাজা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন ধনদত্ত সেই স্থানে আমার সহিত চল। এই পরামর্শ করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য ধনদত্তকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গেলেন। রাজা আপনি সাক্ষাতে সমস্ত দেখিয়া বিচার করিলেন পরের যৎকিঞ্চিৎ উপকারের নিমিত্তে উত্তম লোকে প্রাণপণ করে আমি প্রাণ দিলে ইহারা স্ত্রীপুরুষ দুই জনে জীবত শরীর হইবে, রাজা সরোবরে স্নান করিয়া দেবীর সাক্ষাতে আপন মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত। ইতিমধ্যে দেবী প্রসন্না হইয়া রাজার হস্ত ধরিলেন কহিলেন হে রাজা তুমি উত্তম পুরুষ তোমাকে সন্তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর।"

১৮১৪ সালের বাঙ্গালা ভাষা ;—[পুরুষপরীক্ষা, হর প্রসাদ কর প্রণীত]

"জয়ন্তী নগরীতে ধীরবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজ যোগ্যতাতে ধন উপার্জ্জন করিয়া নির্ভীক ও বহুপুত্রযুক্ত হইয়া সুখে কালযাপন করেন।"

১৮২০ সালের বাঙ্গালা ভাষা ;—[পত্র-কৌমুদী]

"ঐ সকল পাঠশালার বালকেতে উঠান পরিপূর্ণ, আর বালকেরা এন্তাহাম দিবার নিমিত্তে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া বেড়াইতেছে আমার এমত বোধ হইল, কিছু কাল আমি এই আমোদ দেখিতেছিলাম, ইতিমধ্যে সাহেব ও মুছলমান ও বাঙ্গালি লোকেরা গাড়ী ও পালকিতে চড়িয়া আইলেন; তাহারদিগকে শ্রীযুত বাবু গোপী মোহন দেবের লোকেরা সমাদর করিয়া বড় দালানের মধ্যে বসাইলেন, এবং যে যে কেতাব বালকেরা শিখিয়া থাকে নীতিকথা ও দিগ্দর্শন প্রভৃতি ছোট বড় এই সকল কেতাবে পরিপূর্ণ এক মেজ দালানের মধ্যে ছিল।"

১৮২৬ সালের বাঙ্গালা ভাষা ;—[বহুদর্শন, নীলরত্ন হালদার প্রণীত]

"দ্বিতীয়তো যে সকল ব্যক্তি বিষয়িরূপে খ্যাত এবং যাঁহারদিগের সময় বিষয়ানুষ্ঠানে ভুক্ত হওনে এ সকল বহু ভাষার সারোদ্ধার করণে অনবকাশ ও তন্নিমিত্তে প্রস্তাব্য বক্তব্য সভ্য শৌভ্য ভব্য করণে আয়াস বোধে হতাশ কিম্বা যে সকল ভাগ্যবান লোকের সন্তান সর্ব্বদা সুখানুরক্ত প্রযুক্ত পরিশ্রমের শঙ্কাতঙ্কায় শাস্ত্ররূপ সমুদ্রে মগ্ন হওনে ভগ্নোদ্যম—"

১৮৩৩ সালের বাঙ্গালা ভাষা ;—[প্রবোধচন্দ্রিকা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক রচিত]

"মরণোত্তর কেবা কার পতি কেবা কার পত্নী। জীব জীবেতেই বাঁচে তোর যে পতি ছিল সেই কি জীব আর কি জীব নাই এত দিন কি ঐ জীবকে উপজীব্য করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলি ইদানী অন্য জনোপজীবনে জীবিত কাল যাপন কর কেহ কি কাহার স্বামী বলিয়া চূণের ফোটা দেওয়া হইয়া আছে। আমরা চতুষ্পদ পশুজাতি বিশেষতঃ

আমাদের কাহার সহিত কি সম্পর্ক লজ্জাই বা কাহা হইতে। ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয় বা কি বেদ শাস্ত্র চাতুর্বর্ণ্যাধিকারিক আমরা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাবহির্ভূত বাহ্যলোক।”

১৮৩৬ সালের কবিতা;—বাসবদত্তা, [মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।]

এথায় কামিনী সাজিয়া সাজ।
বসিয়া রসিকা সখীর মাঝ॥
নাগর না এল হইল নিশা।
ভাবে মৃগী যেন হারায়ে দিশা॥
কি হ'ল কি হ'ল ওলো সজনি।
নাথ কই এত হল রজনী॥
যা গো সখি তোরা অনেক যাও।
বারেক বন্ধুরে আনিয়া দাও।
তাহারে না হেরে বুক বিদরে।
কারে কব সই প্রাণ যে কি করে॥
হেদে মদনিকা চলিয়া গেল।
খেয়ে মোর মাথা কেন না এল॥

১৮৪৩ সালের বাঙ্গালা ভাষা,—[সমাচারচন্দ্রিকা, ২রা আষাঢ় ১২৫০]

"এক জন ভূম্যধিকারী ও ফলের বাগানের বন্ধক-লওনিয়া মহাজনেতে বিবাদ হইল। তাহাতে ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দখলে বাগান আছে ইহা হৃদ্বোধরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে জ্ঞান করিয়া বরেলীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার ভোগ দখলে তাহা থাকিতে হুকুম দিলেন।"

১৮৫২সালের বাঙ্গালা ভাষা ;—বাঙ্গালার ইতিহাস, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত]

"কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা ষাটি বৎসরের অধিক কাল নিরুপদ্রবে ছিলেন ; সুতরাং বিশেষ আস্থা না থাকাতে তাঁহাদের দুর্গ প্রায় এক প্রকার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ফলতঃ তাঁহারা আপনাদিগকে এমত নিঃশঙ্ক ভাবিয়াছিলেন যে, দুর্গপ্রাচীরের বহির্ভাগে বিংশতি ব্যামের মধ্যেও অনেক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। তৎকালে দুর্গমধ্যে এক শত সত্তর জন মাত্র সৈন্য ছিল; তন্মধ্যে কেবল ষাটি জন ইউ-

রোপীয়। বারুদ পুরাতন ও নিস্তেজঃ; কামান সকল মরিচাধরা।"

১৮৫২ সালের ভিন্নজাতীয় বাঙ্গালা ভাষা,—[বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, অক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত।]

"এক্ষণে আমারদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতেছেন, স্বদেশের দুরবস্থা দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের তন্নিরাকরণার্থে লোকদিগকে ভৌতিক শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত।"

১৮৫৭ সালের বাঙ্গালা ভাষা;—[চরিতাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, মহাত্মা বিদ্যাসাগর প্রণীত।]

"একদিন একটি স্ত্রীলোক সিমসনের নিকট কোন বিষয় গণাইতে আসিয়াছিল। ঐ গণনাতে চণ্ড নামাইবার আবশ্যকতা ছিল। সিমসন এই অভিপ্রায়ে এক ব্যক্তিকে বিকট বেশ ধারণ করাইয়া নিকটবর্ত্তী খড়ের গাদার পাশে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, চণ্ডকে আহ্বান করিলেই ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইবেক।"

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে অমর মধুসূদন দত্তের "তিলোত্তমা-সম্ভব" কাব্য ও নাটককার দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" প্রকাশিত হয়। পর বৎসর বঙ্গবিশ্রুত "মেঘনাদ-বধ মহাকাব্য" প্রকাশিত হয়। সে সকল পুস্তক বঙ্গের ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। তাহাদের নূতন পরিচয় অনাবশ্যক।

অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে পড়িয়া বঙ্গভাষা নূতন রূপ ধারণ করিল। আমরা যে ভাষায় এক্ষণে লিখিতেছি, যে ভাষার অনুকরণ করিবার জন্য আমরা প্রয়াস পাইতেছি, সে ভাষা বঙ্কিমের সৃষ্টি। কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম্মসঙ্কীর্ত্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহা বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাতে স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্ব-সভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের

কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।" *

আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "মাতৃভাষার বন্ধ্যা-দশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালীর যে কি মহৎ, কি চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন, সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয়, তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই।" *

সে দুর্ভাগ্য আজও আমাদের উপস্থিত হয় নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম-চন্দ্রের স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য আর কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

---

* সাধনা

বঙ্কিমচন্দ্র—বিশ্লেষণ।

——•ঃ(*)ঃ•——

বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে পড়িতে শিখিয়া কে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ পড়ে নাই? কে তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ নয়? তবে আমি কেন নূতন করিয়া তাঁহার পরিচয় দিতে যাই? যে অনলে অনেকে হাত পুড়াইয়াছেন, আমি কেন সে অনল স্পর্শ করিতে অগ্রসর হই?

"বিষবৃক্ষে"র এক স্থানে আছে;—"দেখ নগেন্দ্র, তুমি গবাক্ষ মুক্ত করিয়াছ, ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ আসিয়া তোমার শয্যাগৃহে প্রবেশ করিতেছে; কুন্দ মনে করিতেছে, কি পুণ্য করিলে পতঙ্গ-জন্ম হয়। 'কুন্দ! পতঙ্গ যে পুড়িয়া মরে। কুন্দ তাই চায়।"

আমিও তাই চাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করিতে গিয়া অনেকেই পুড়িয়াছেন; আমিও তাঁহাদের মত পুড়িতে চাই। পুড়িবার অধিকারও কি আমার নাই?

বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হয়; যথা—

সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্র ;

কবি বঙ্কিমচন্দ্র ;

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ;

ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্র ;

স্বদেশ-ভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ;

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র ; এবং

ধর্ম্মোপদেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র ;

আমি অতি সংক্ষেপে সকল বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়া যাইব।

সমাজ-সংস্কারক।

সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উদ্যম—বিষবৃক্ষ ; দ্বিতীয় উদ্যম—সাম্য ও লোকরহস্য ; তৃতীয় উদ্যম—দেবী চৌধুরাণীর কিয়দংশ ও কমলাকান্তের কয়েকটি প্রবন্ধ।

সকল উদ্যমই ব্যর্থ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়,—বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের বিশেষ কোনও উপকার করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, বহু-বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, সকল বিষয়েই তিনি কিছু না

কিছু বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কোনও বিষয়েই তাঁহার হৃদয় ছিল না। তিনি সমাজকে বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সমাজের জন্য কখনও চোখের জল ফেলেন নাই। ফেলিলেও যে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, এমন বোধ হয় না। অচল ভূধর তুল্য হিন্দুসমাজকে কেহ যে একদিনে নড়াইতে পারিবেন, এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্দ্ধ-শতাব্দীব্যাপী রোদনেও দেশে বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তিত হইল না। তবে মহাপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা একদিন না একদিন ফল প্রদান করিবে।

সমাজ-সংস্কারক ও ভাবময় বঙ্কিম।

সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ভাবময় বঙ্কিম-চন্দ্রের দুই এক স্থানে সঙ্ঘর্ষণ ঘটিয়াছে। বিষবৃক্ষ হইতে তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

সূর্য্যমুখী আদর্শ হিন্দু-স্ত্রী অথবা Westernised রমণী কি না, তাহা জানিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু দেখিব, সূর্য্যমুখী স্বামীকে ভালবাসে কি না—সে নগেন্দ্রের ভালবাসার সম্পূর্ণ

যোগ্য কি না। দেখিলাম, সূর্য্যমুখী প্রেমময়ী। সে প্রেমে একটু আধটু স্বার্থ থাকিতে পারে, কিন্তু সে প্রেম অনন্ত—সে প্রেম গভীর। সূর্য্যমুখীর রূপ আছে, গুণ আছে, প্রেম আছে,—সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের ভালবাসার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্রী।

এমন সময় কুন্দনন্দিনী তাহার অতুলনীয় রূপরাশি লইয়া নগেন্দ্রনাথের সংসারে আসিল। সূর্য্যমুখীর চেয়েও কুন্দ সুন্দরী; কেন না, সূর্য্যমুখীর বয়স ছাব্বিশ, কুন্দর বয়স তের। নগেন্দ্রের মতে তের বৎসরই স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের সময়। রূপ-প্রিয় কামান্ধ নগেন্দ্রনাথ তের বছরের কুন্দকে পাইয়া ছাব্বিশ বছরের সূর্য্যমুখীকে ভুলিলেন।

না ভুলিলে সমাজ-সংস্কারক বিধবা-বিবাহ সংঘটন করিতে পারেন না—না ভুলিলে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে দণ্ড উদ্যত করিতে পারেন না। নগেন্দ্রনাথ ভুলিলেন—কুন্দর রূপ দেখিয়া সূর্য্যমুখীকে ভুলিলেন।

কুন্দ উপযুক্ত পাত্রীও বটে। যে অবস্থায় বিধবার বিবাহ হইতে পারে, কুন্দতে সে অবস্থা সম্যক্ বর্ত্তমান।

বহুবিবাহ যদি কোনও অবস্থায় মার্জ্জনীয় হওয়া সম্ভব হয়, তবে নগেন্দ্রনাথের উন্মত্তাবস্থায় মার্জ্জনীয় হইতে পারে। অবস্থাটি বেশ করিয়া সৃষ্টি করিয়া সংস্কারক পাত্রীকেও বেশ করিয়া সাজাইলেন। তাহাকে রূপ, যৌবন, গুণ, নগেন্দ্রনাথের প্রতি অতুল ভালবাসা দিয়া মনোমত করিয়া গড়িলেন। অবশেষে বাল্যবিধবার বিবাহ ঘটাইলেন।

বিবাহ দিয়া সংস্কারক একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "দেখ, আমি কেমন বিধবার বিবাহ দিয়াছি। নগেন্দ্র ও কুন্দ কত সুখী! একটা বিধবাকে চির-জীবনের দুঃখ হইতে রক্ষা করিয়া আমি কত পুণ্য সঞ্চয় করিলাম।"

বলিয়াই সংস্কারক সমাজের দিকে রোষকষায়িত লোচনে চাহিয়া বলিলেন, "কিন্তু সাবধান! নগেন্দ্র-নাথের মত দুই বিবাহ করিও না। যদি কর, এক স্ত্রীকে বিনাশ করিব।"

"কা'কে বিনাশ করিবে?—কুন্দকে, না সূর্য্য-মুখীকে?"

সংস্কারক উত্তর করিলেন, "সূর্য্যমুখীকে।"

"সূর্য্যমুখীর অপরাধ ?"

সংস্কারক বলিলেন, "তার অপরাধ থাকুক, বা না থাকুক, আমি কুন্দকে মারিতে পারিব না। সে বাল-বিধবার আমি সবে বিবাহ দিয়াছি; সূর্য্যমুখীর স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাকে চিরসুখী করিয়া সমাজকে দেখাইব, বিধবা-বিবাহে অধর্ম্ম নাই, অশান্তি নাই।"

ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্র অমনই গর্জ্জিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "সাধ্য কি তোমার, তুমি সূর্য্যমুখীকে মার! সর্ব্বগুণময়ী নিরপরাধা সূর্য্যমুখীকে যেমন করিয়া পারি, আবার ঘরে আনিব—আবার তাহাকে পাটরাণী করিব। তোমার সমাজ-সংস্কার অতলজলে ডুবিয়া যাক্—আমি সূর্য্যমুখীর নয়ন-কোণে অশ্রুকণা দেখিতে পারিব না।"

সংস্কারক-ব। ছি ছি! ভাবে বিভোর হইলে চলিবে না। সূর্য্যমুখীকে মার—বিধবা-বিবাহের জয় পরিকীর্ত্তিত হউক—বহুবিবাহের পরিণাম জগতে দেখুক।

ভাবময়-ব। যদি কাহাকেও মরিতে হয়, তবে কুন্দ মরুক; ইন্দ্রাণীতুল্যা সূর্য্যমুখীকে—নগেন্দ্রনাথের জীবন-সঙ্গিনী সূর্য্যমুখীকে কিছুতেই মারিতে দিব না।

সংস্কারক-ব। কুন্দ কিরূপে মরিবে?

ভাবময়-ব। বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করুক।

সংস্কারক-ব। সূর্য্যমুখী কেন আত্মহত্যা করুক না।

ভাবময়-ব। সূর্য্যমুখী বিবাহিতা—ধার্ম্মিকা, সে আত্মহত্যা করিয়া পাপ অর্জ্জন করিতে পারে না।

সংস্কারক-ব। কুন্দই কি আত্মহত্যা করিতে পারে?

ভাবময়-ব। পারে; যে নবযৌবনে বিধবা হইয়া,—হিন্দু রমণীর আজন্মপুষ্ট সংস্কার লইয়া, প্রথম স্বামীর সাহচর্য্য ও অনুরাগ স্বল্পকাল মধ্যে বিস্মৃত হইয়া, ভালবাসার খাতিরে সংযম হারাইয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে, সে আত্মহত্যা করিয়া দ্বিতীয় পাপও অর্জ্জন করিতে পারে।

সংস্কারক-ব। গোড়ায় কি মতলব ছিল, ভুলে গেলে? বিধবাকে গড়িলে বিবাহ দিতে—সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন করিতে, এখন এ কি করিতেছ?

ভাবময়-ব। মতলব, উদ্দেশ্য রসাতলে যাউক, আমি সূর্য্যমুখীর প্রাণে ব্যথা দিতে পারিব না।

আমরা পরিণাম দেখিলাম—ভাবময় বঙ্কিমের কত প্রবল শক্তি তাহাও দেখিলাম। সংস্কারক চিরদিন ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিতে পরাজিত।

কবি বঙ্কিম।

ছন্দ মিলাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র খুব কম কবিতাই লিখিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই বাল্যকালে। কিন্তু ছন্দ মিলাইতে পারিলেই যে কবি হয়, এমন কোনও কথা নাই। কবিত্ব,—চিত্র বা চরিত্র-অঙ্কনে,—কবিত্ব, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে। আমরা সেই 'দর্পণানুরূপ' বারুণী পুষ্করিণী চোখের সাম্‌নে দেখিতে পাইতেছি। ভোমরার সেই কালোরূপ—সে অভিমান-

ভরা সরলতা—সে গর্ব্ব, সে পতিভক্তি দুইটি কথায় স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। ভ্রমর লিখিয়াছেন, "যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি।" ভ্রমর বলিয়াছে,—তোমার বিশ্বাসেই আমার বিশ্বাস। এইখানেই ভ্রমরের চিত্র সম্পূর্ণ হইল।

প্রফুল্ল বলিল, "আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ান বৌয়ের। আমি একা তোমায় ভোগ-দখল করিব না।"

এই একটি কথায় প্রফুল্লের প্রকৃতি আমরা বুঝিতে পারিলাম।

সমুদ্র-সৈকতে বসিয়া আশ্রয়হীন নবকুমার দেখিলেন, "ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন; আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্ব্বত্র নীরব, কেবল কল্লোলিত সমুদ্র-গর্জ্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব।" এই স্বভাবানুকারিণী সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই

প্রকৃত কবিত্ব। প্রকৃতির ছায়া নবকুমারের হৃদয়ে—নবকুমারের হৃদয়ের প্রতিবিম্ব প্রকৃতির বুকে।

'পুষ্প-নাটকে' যুঁই বারিকণার অন্তর্দ্ধানে কাতর হইয়া বলিতেছে, "হায়! কোথা গেলে তুমি অমল, কোমল, স্বচ্ছ, সুন্দর, সূর্য্যপ্রতিভাত, রসময় জলকণা! এ হৃদয় স্নেহে ভরিয়া আবার শূন্য করিলে কেন জলকণা? একবার রূপ দেখাইয়া, স্নিগ্ধ করিয়া, কোথায় মিশিলে, কোথায় শুষিলে প্রাণাধিক? হায়, আমি কেন তোমার সঙ্গে গেলেম না, কেন তোমার সঙ্গে মরিলাম না? কেন অনাথ, অস্নিগ্ধ পুষ্প-দেহ লইয়া এ শূন্য প্রদেশে রহিলাম—"

আকুল বাসনার এ চিত্র কি সুন্দর! যিনি এমন সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে পারেন তিনি প্রকৃত কবি।

ঔপন্যাসিক ও ভাবময় বঙ্কিম।

পূর্ব্বে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি, সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে মধ্যে কিরূপ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার

দেখান উদ্দেশ্য, ঔপন্যাসিকের সহিত ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্রের কিরূপ সঙ্ঘর্ষণ ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসনিচয়ে কোনও plot নাই, বা তাঁহার উপন্যাস Idealistic—Realistic নহে, এ সব গুরুতর কথায় আমার কোনও প্রয়োজন নাই। আমি শুধু দ্বন্দ্বটুকু দেখাইব। দ্বন্দ্ব দেখাইতে হইলে পুস্তকবিশেষের সমালোচনা আবশ্যক। যত সংক্ষেপে সারিতে পারি, চেষ্টা করিব।

উপস্থিত আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস "সীতারামের" সমালোচনা করিয়া দ্বন্দ্বটুকু প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

গ্রন্থখানির প্রথমাংশ পড়িলেই বুঝা যায়, ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য, সীতারামকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যভ্রষ্ট করা। কিন্তু সীতারাম কোন্ অপরাধে রাজ্যভ্রষ্ট হইবে? সে বীর, স্বদেশপ্রেমিক, দেবদ্বিজে ভক্তিমান্, সত্যাশ্রয়ী, পরোপকারী—সে রাজ্যভ্রষ্ট হইতে পারে না। জগতে কেবল একটি মাত্র পাপ আছে, যে জন্য মনুষ্য রাজ্যভ্রষ্ট, লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইতে পারে।

সে পাপটি—রমণীর প্রতি অত্যাচার। ঔপন্যাসিক তাহা বুঝিলেন; বুঝিয়া জয়ন্তীর সৃষ্টি করিলেন।

জয়ন্তী, সীতারামের রূপযৌবনশালিনী অপ্রাপ্যা স্ত্রীর সহচরীরূপে আসিল। সেই স্ত্রী যখন অন্তর্হিতা, তখন সহচরী ধরা পড়িল। উন্মত্ত সীতারাম তাহাকে টানিয়া আনিয়া শাস্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ উন্মত্ততা মার্জ্জনীয়, কিন্তু অমানুষিক দণ্ডবিধান মার্জ্জনীয় নহে। স্ত্রীর জন্য আমি উন্মত্ত হইতে পারি, কিন্তু রমণীর উপর অত্যাচার করিতে পারি না।

এ অত্যাচার না হইলে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইতে পারে না; সুতরাং সীতারামের দ্বারা এ অত্যাচার করাইতেই হইবে। সীতারাম সিংহাসনে বসিয়া জয়ন্তীকে মঞ্চোপরি দাঁড় করাইলেন; এবং মেঘগম্ভীর কণ্ঠে চণ্ডালকে আদেশ করিলেন, "কাপড় কাড়িয়া নিয়া বেত লাগা।"

চৌত্রিশ শত বর্ষ পূর্ব্বে দুর্য্যোধনও এই রকম একটা আদেশ দিয়াছিলেন। বিস্তীর্ণ সভাতলে দাঁড়াইয়া আত্মীয়স্বজন-পরিবৃত দুর্য্যোধন আদেশ করিয়াছিলেন,

"যাজ্ঞসেনীকে বিবস্ত্রা কর।" যে মুহূর্ত্তে এই আদেশ-বাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে কৌরবরাজ্য-ধ্বংস সূচিত হইয়াছিল।

ব্যাসদেবের আগে মহাকবি বাল্মীকিও দেখাইয়া গিয়াছেন, রমণীর উপর অত্যাচার না হইলে রাবণ বিনষ্ট হইতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে রাবণ সীতার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে চিরজাগ্রত সনাতন ধর্ম্ম মেঘমন্দ্ররবে গর্জ্জিয়া বলিল, "রাবণ, এতদিনে তোমার ধ্বংসের সূচনা হইল।"

সেই গর্জ্জন বিশ্বময় আজও ধ্বনিত হইতেছে—সেই সনাতন সত্য আজও জাগ্রত রহিয়াছে। সেই গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি—"সীতারাম।" এই সীতারামই রাবণ, এই সীতারামই দুর্য্যোধন। সীতারাম তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আদেশ করিলেন,—"কাপড় কাড়িয়া নিয়া বেত লাগা।"

ঔপন্যাসিক বেশ সাজাইলেন; সীতারামের মুখ দিয়া উপযুক্ত দণ্ডাদেশ বাহির হইল। কথাটা পাছে আমরা না বুঝি, তাই ঔপন্যাসিক আমাদের চোখে

আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন,—যে কাজ সীতারামের তুল্য সর্ব্বগুণালঙ্কৃত নৃপতি সমাধান করিতে আদেশ করিতেছেন, সে কাজ এক জন নীচজাতীয় চণ্ডাল সম্পন্ন করিতে অসম্মত। উভয়ের কথাগুলি নিম্নে তুলিয়া দিলাম ঃ—

"——তখন চণ্ডাল পুনরপি রাজাজ্ঞা পাইয়া আবার বেত উঠাইয়া লইল—বেত উঁচু করিল—জয়ন্তীর মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল; বেত নামাইয়া রাজার পানে চাহিল—আবার জয়ন্তীর পানে চাহিল—শেষ বেত আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"কি!" বলিয়া রাজা বজ্রের ন্যায় শব্দ করিলেন।

চণ্ডাল বলিল, "মহারাজ! আমা হইতে হইবে না।"

রাজা বলিলেন, "তোমাকে শূলে যাইতে হইবে।"

চণ্ডাল যোড়হাত করিয়া বলিল, "মহারাজের হুকুমে তা' পারিব; এ পারিব না।"

ঔপন্যাসিকের অসামান্য কৌশল দেখিলাম। চণ্ডাল রক্ষা পাইবে—সীতারাম ধ্বংস হইবে। যে কাজ চণ্ডাল, চণ্ডাল হইয়াও করিতে পারিল না—সে

কাজ সীতারাম, হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা হইয়াও করিতে সমুদ্যত। সীতারাম দেখিলেন, কোন হিন্দু জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত করিবে না। তখন তিনি এক জন মুসলমান আনিতে আদেশ করিলেন। এখানে ঔপন্যাসিকের কার্য্য অতি চমৎকার ; কোথাও ভুল নাই, ত্রুটী নাই,—সব ঠিক, জয়ন্তীর আর রক্ষা নাই। চন্দ্রচূড় গাল খাইয়া পলাইয়াছেন—চণ্ডাল পলাইয়াছে। এবার নৃশংস কশাই আসিয়া বলিতেছে, "কাপ্ড়া উতার।"

জয়ন্তী সীতারামকে বন্য পশু বলিয়া গালি দিল।

সীতারাম আরও ক্রুদ্ধ হইয়া কশাইকে আদেশ করিলেন, "জবরদস্তী কাপড়া উতার লেও।"

উপায়বিহীনা জয়ন্তী তখন জগন্নাথকে ডাকিতে লাগিল। কশাই কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। ক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী চীৎকার করিয়া বলিল, "মহারাজ, এই পাপে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে—তোমার রাজ্য গেল।"

এ পর্য্যন্ত সব ঠিক—ঔপন্যাসিকের কোন ত্রুটী

নাই। তার পর সব গোল হইয়া গেল। কশাইয়ের এক হাতে উদ্যত বেত্রদণ্ড, অপর হস্তে জয়ন্তীর বস্ত্রাঞ্চল। নিরুপায় জয়ন্তী পশুবৎ সীতারামের সম্মুখে মঞ্চোপরি বসিয়া অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। জয়ন্তীর আর নিস্তার নাই। এমন সময় ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্র কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সকাতরে বলিলেন, "এ কি, সন্ন্যাসিনীর উপর—রমণীর উপর অত্যাচার! কোথায় আছ নন্দা?—কোথায় আছ সীতারামের সহধর্ম্মিণী? ছুটে এস—জয়ন্তীকে রক্ষা কর।"

ভাবময় বঙ্কিমের আহ্বানে নন্দা অমনি ছুটিয়া আসিল; ঔপন্যাসিক বঙ্কিম এতকাল ধরিয়া যে কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, ভাবময় বঙ্কিম মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা নষ্ট করিয়া দিলেন। ঔপন্যাসিক তবু একটু বুঝিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, "মহারাণি, তোমার ঠাঁই অন্তঃপুরে, এখানে নয়। অন্তঃপুরে যাও।"

ভাবময় বঙ্কিম সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া সীতারামের প্রতিনিধি কশাইয়ের উপর 'মার' 'মার' শব্দে পড়ি-

লেন। ঔপন্যাসিক আর কি করিবেন? তিনি পলাইলেন; তার পর ভাবময় বঙ্কিম একটু শান্ত হইলে বলিলেন, "তুমি এ কি করিলে? জয়ন্তীকে রক্ষা করিয়া যে সব নষ্ট করিলে! আমি কেমন করিয়া তবে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস করিব?"

ভাবময়-ব। সংসারে কি জয়ন্তী ছাড়া আর স্ত্রীলোক নাই?

ঔপন্যাসিক-ব। সহস্র সহস্র থাকিতে পারে, কিন্তু সে সব পতঙ্গ মাত্র। মহাকবি বাল্মীকিও তাই ভাবিয়াছিলেন, নতুবা রাবণ-ধ্বংসের নিমিত্ত জনক-নন্দিনীর সৃষ্টি করিতেন না।

ভাবময়-ব। তা' তুমি যা' হয় কর—আমি জয়ন্তীকে ছাড়িয়া দিব না।

নিরুপায় ঔপন্যাসিক তখন ফুটা কলসীর তলায় গালা আঁটিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—সুন্দরী সাধ্বী রমণীবৃন্দকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া সীতারামের চিত্তবিশ্রামে ফেলিতে লাগিলেন। কিন্তু ফুটা কলসীর ছিদ্র বন্ধ হইল না। মহাশক্তিশালী ঔপন্যাসিকও

তাহা বুঝিলেন। বুঝিয়া তিনি গালার উপর এক স্তর মাটী লাগাইলেন, এবং সতীত্ব-অপহৃতা ভানুমতী সাজিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আজ জানিলে বোধ হয় যে, সত্যই ধর্ম্ম আছে। আমরা কুলকন্যা, আমাদের কুলনাশ—ধর্ম্মনাশ করিয়াছ, মনে করিয়াছ কি তার প্রতিফল নাই?"

ফুটা কলসী সারিতে ঔপন্যাসিককে এইরূপে আয়োজন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সারিতে পারেন নাই; "সীতারামে"র ঔপন্যাসিকত্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমরা যদি সীতারামকে সর্ব্বগুণের আধার দেখিতাম—ক্রোধী ও প্রজাপীড়ক না দেখিতাম—উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র ও পত্নীপীড়ক না দেখিতাম, শুধু একটি পাপে কলঙ্কিত দেখিতাম, তাহা হইলে বুঝিতাম, ঔপন্যাসিকের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। সে একটি পাপ জয়ন্তীর উপর অত্যাচার। যে সর্ব্বগুণের আধার, সে কি রমণীর উপর অত্যাচার করিতে পারে? পারে—স্ত্রীর জন্য পারে। সীতারাম সেই অত্যাচার

করুক—সিংহাসনে বসিয়া জয়ন্তীকে বিবসনা করিয়া বেত্রাঘাত করুক; আমরা তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, সর্ব্বগুণসম্পন্ন সীতারাম কেন রাজ্যভ্রষ্ট হইল।

দশানন ও দুর্য্যোধন প্রজাপীড়ক ছিলেন না—স্ত্রী ধরিয়া আনিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিতেন না। তাঁহারা রাজকীয় গুণসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তবু তাঁহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন কেন? একটি পাপের জন্য।

সীতারাম সে পাপটি করিল না, অথচ রাজ্যভ্রষ্ট হইল। এইখানেই ঔপন্যাসিকত্ব বিনষ্ট হইয়াছে। বিনাশ কে করিল? ভাবময় বঙ্কিম।

স্বদেশ-ভক্ত বঙ্কিম।

একটি কথায় বুঝিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীমাত্রকেই ভালবাসিতেন। কথাটি মূল্যবান্—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?" *

বঙ্কিমচন্দ্র কি স্বদেশকে ভালবাসিতেন? তাঁহার স্বদেশপ্রীতি কি প্রকৃতই আন্তরিক? এ কথার উত্তর

* সীতারাম।

"আনন্দমঠে"র ছত্রে ছত্রে লিখিত রহিয়াছে। বিচ্ছেদ-শূন্য ছিদ্রশূন্য আলোক-প্রবেশের পথমাত্র শূন্য নিবিড় অন্ধকারময় অরণ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী বঙ্কিম-চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, * "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?"

বাঙ্গালার অন্ধকারময় অরণ্য, আকাশ প্লাবিত করিয়া উত্তর হইল, "তোমার পণ কি ?"

"পণ আমার জীবন-সর্ব্বস্ব।"

"জীবন তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে ? আর কি দিব ?"

"ভক্তি।"

এ ভক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের শিরায় শিরায় প্রবহমান ; নতুবা তিনি গায়িতে পারিতেন না,—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে !"

* আনন্দমঠ—উপক্রমণিকা।

বাঙ্গালার লতাটি পাতাটি পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়। সেই লতা পাতা দিয়া সাজাইয়া তিনি তাঁহার উপাস্য দেবীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন;—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিতযামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

কিন্তু এ ভক্তি নিষ্কাম নয়। নিষ্কাম ভক্তির কথা কমলাকান্তের মুখেও শুনিলাম না। তবে কোথায় শুনিতে পাইব? নিষ্কাম হইবার দিন আজও আমাদের আসে নাই। তবু কমলাকান্ত যাহা বলিতেছে, তাহা অতি সুন্দর। কমলাকান্ত বলিতেছে, "দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ

উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা! মা!' করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই মা আমার? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণের উদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয় প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা, এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ

এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানাপ্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"

এতদ্ভিন্ন, "বঙ্গদেশের কৃষক" "বাঙ্গালীর উৎপত্তি," "ভারত কলঙ্ক" প্রভৃতি অত্যুপাদেয় প্রবন্ধনিচয় বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিতেছে।

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র।

এক শত বর্ষের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের তুল্য সমালোচক বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই সমালোচকের আসন এক্ষণে শূন্য হইয়াছে বলিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ কত আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন;—

"বঙ্কিম যে দিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন, সে দিন হইতে এ পর্য্যন্ত আর সে আসন

পূর্ণ হইল না। এক্ষণকার অরাজকতার চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, সাহিত্য সিংহাসনে কে আমাদের রাজা ছিলেন, এবং তাঁহার অভাবে শাসনভার গ্রহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি কেহই উপস্থিত নাই।" *

বঙ্কিমচন্দ্র তীব্র সমালোচক ছিলেন। কখন কাহারও খাতির রাখিয়া কথা কহিতেন না, এজন্য তাঁহাকে সময় সময় গালি খাইতে হইয়াছে—লোকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছে, তবু তিনি কখন পথভ্রষ্ট হয়েন নাই। কি প্রকারে তাঁহাকে গালি খাইতে হইয়াছিল তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিব।

একখানি নাটক 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনার্থ প্রেরিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে এই নাটকখানির কিছু তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। যিনি নাটক লিখিয়াছিলেন, তিনি স্থির জানিতেন যে, তাঁহার নাটকখানি অত্যুপাদেয় গ্রন্থ বিশেষ। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা তাঁহার প্রীতিকর হইল না। যে ব্যক্তি তাঁহার

* সাধনা।

নাটকখানির অপ্রশংসা করিয়াছে, তাহাকে গালি দিবার অভিপ্রায়ে তিনি এক আত্মীয়ের শরণাগত হইলেন। এই আত্মীয়ের একখানি কাগজ ছিল। কাগজের নাম—'বসন্তক'। কাগজখানি দেশমধ্যে কিছু প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাহাতে ভাল ভাল ছবি থাকিত। বিলাতের 'পঞ্চ' কাগজ লোককে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া যে রকম কার্টুন (cartoon) দেয়, বসন্তকও সেই প্রকার ছবি দিয়া লোককে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন। বসন্তক-সম্পাদক রোরুদ্যমান আত্মীয়ের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া 'বসন্তকে' এক ছবি বাহির করিলেন। সাহিত্যক্ষেত্র নাম দিয়া তিনি একটি ক্ষেত্র আঁকিলেন। সেই ক্ষেত্রে একটি প্রকাণ্ডকায় ষণ্ড ও কয়েকটি ভেক অঙ্কিত হইল। ষাঁড়ের পার্শ্বদেশে লেখা হইল,—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আর একটি ক্ষুদ্র ভেকের বক্ষের উপর লিখিত হইল,—"বঙ্গদর্শন।" এইরূপে সমালোচক-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রকে কর্ত্তব্যানুরোধে গালি খাইতে হইয়াছিল।

সূক্ষ্মদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথ তাই বুঝি লিখিয়া-

ছিলেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল, এবং ক্ষুদ্র যে লেখক সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত, তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

"মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক-পদে আসীন ছিলেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষ্যা করিত। এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

"ছোট ছোট দংশনগুলি যে বঙ্কিমচন্দ্রকে লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই! তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল।" *

"উত্তর চরিত" সমালোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, কিরূপে গ্রন্থ সমালোচনা করিতে হয়। এরূপ সমালোচনা বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষায়

---

* সাধনা।

আর কখনও লিখিত হয় নাই। আমি তাহার কোন্ স্থানটা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব? কে বা সে সমালোচনা পড়েন নাই? অতএব আমি নিরস্ত হইলাম।

ধর্ম্মোপদেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র।

"কৃষ্ণচরিত্র" বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয় কীর্ত্তি। এই গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে শতবার মনে উদয় হইয়াছে, যিনি জেবউন্নিসার বিলাসমন্দির আঁকিয়াছেন—কমলমণির গালের কালিটুকু শ্রীশচন্দ্রের মুখে লাগাইয়া দিয়াছেন, তিনি কেমন করিয়া মহাভারত, পুরাণ মন্থন করিয়া এমন গভীর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিলেন?

কিন্তু এই পুস্তক লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছু গালি খাইতে হইয়াছিল। গালি খাইতে হইয়াছিল, দুই শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে। প্রথম একদল বলিলেন, "আমাদের পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নাস্তিক বঙ্কিম বাবুর হাতে পড়িয়া তোমার আমার মত মানুষ হইল।" আর একদল বলিলেন, "শঠ, বঞ্চক, পারদারিক কৃষ্ণকে বঙ্কিম বাবু আদর্শপুরুষ বলিলেন কি প্রকারে?" দুই দলই বঙ্কিমচন্দ্রের উপর বীতরাগ হইলেন।

কিন্তু তাঁহারা যদি একটু তলাইয়া দেখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ কোনও অপরাধ দেখিতে পাইতেন না। গ্রন্থারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; গ্রন্থমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অপবাদগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাঁহার অপরাধকি?

অপরাধ একটু আছে। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে একটু বিলাতী (Westernise) করিয়াছেন। আনুষ্ঠানিক হিন্দুদের ইহাতে আপত্তি হইতে পারে। কালীয়-দমন অথবা বস্ত্রহরণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিলে তাঁহাদের মনে ক্রোধ সঞ্জাত হওয়া সম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে আলোচনা করিবার বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের অবসর ছিল না। অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যুগানুযায়ী জ্ঞান তাঁহার ভিতরে সে সময় স্ফূর্তি পাইয়াছিল। দেশ তখন পাশ্চাত্যভাবে এরূপ বিভোর যে, সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিতে যাইয়াও বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দু আদর্শের কতকটা নীচে নামিতে হইয়াছিল। আমাদের মনে হয়, দেশবাসীকে আদর্শ আর্য্য জীবনে

ফিরাইবার ঐকান্তিক ইচ্ছাই তাঁহাকে এরূপ কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিল। বৈষ্ণব-সূচিত গোপীতত্ত্ব তিনি যদি সে সময় স্বীকার করিয়া লইতেন, তাহা হইলে তথাকথিত শিক্ষিতসমাজে তাঁহাকে নিশ্চয়ই অপদস্থ হইতে হইত। বঙ্কিমচন্দ্র, ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, তিনি যে তৎকালীন সমাজ-তত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে কারণেই হউক, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ঐ অংশটুকু বিশদভাবে আলোচনা করিতে সাহসী হন নাই—প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণধর্ম্ম শুধু বুঝাইলেই চলিবে না। যাহাতে সকলে গ্রহণ করিতে পারে, সে জন্যও একটু চেষ্টা করা চাই। সেই উদ্দেশ্যে আমি যদি শ্রীকৃষ্ণকে একটু westernise করি, তাহা হইলে বোধ হয় বিশেষ অপরাধ হয় না। ধর্ম্মটাকে একটু চিত্তাকর্ষক করিতে না পারিলে সে ধর্ম্ম জনপ্রিয় হইতে পারে না। যিশু খ্রীষ্টও তাই বুঝিয়াছিলেন; তাই তিনি মদ্যমাংসে স্বয়ং অনাসক্ত হইয়াও মদ্যমাংস খাইতে খ্রীষ্টানদিগকে

নিষেধ করিয়া যান নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় য়ুরোপীয়েরা খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি এতটা আস্থাবান্ হইতেন না।

মহম্মদও বুঝিয়াছিলেন, যে ধর্ম্ম চিত্তাকর্ষক নয়, সে ধর্ম্ম স্থায়ী হইতে পারে না। তাই তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তী কামিনীপ্রিয় আরবদিগকে চারিটি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি বহু-বিবাহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে ইসলাম ধর্ম্ম তাৎকালিক আরবদিগের এত চিত্তাকর্ষক হইত না।

শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মকে সেই হিসাবে চিত্তাকর্ষক করিতে হইলে জটিল অংশগুলিকে নিষ্কাশিত করিতে হয়। এই জন্যই সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের জটিল অংশগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ষোড়শ বৎসর বয়সের পর শ্রীকৃষ্ণকে আর পূর্ণ প্রেমময় পূর্ণব্রহ্মরূপে দেখিতে পাই না। তখন তিনি মথুরার সিংহাসনে উপবিষ্ট—তখন তিনি আদর্শ মনুষ্যরূপে সংসারধর্ম্মপালন ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিতেছেন। বঙ্কিম-

চন্দ্র যদি বিশ্বশিক্ষক শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত রূপ গোপন করিতেন—শ্রীকৃষ্ণকে পরদারনিরত, ক্রূর, প্রবঞ্চক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব কোথায় থাকিত?—মনুষ্যমাত্রেরই অনুকরণীয় আদর্শ পুরুষত্ব কোথায় দাঁড়াইত?

"ধর্ম্মতত্ত্ব' বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় কীর্ত্তি। তৃতীয় কীর্ত্তি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা। কিন্তু তিনি টীকা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য। চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণ হইলে আজ তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত।

নিশীথ-রাক্ষসীর কাহিনী।*

—০ঃ•ঃ০—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"ভাল, সারি, সত্য বল দেখি, তোমার বিশ্বাস কি ? ভূত আছে ?"

বরদা, ছোট ভাই সারদাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। সন্ধ্যার পর, টেবিলে দুই ভাই খাইতেছিল— একটু রোষ্ট মটন প্লেটে করিয়া, ছুরিকাঁটা দিয়া তৎসহিত খেলা করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ বরদা এই কথা কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল। সারদা প্রথমে উত্তর না করিয়া এক টুকরা রোষ্টে উত্তম করিয়া মাষ্টার্ড মাখাইয়া, বদনমধ্যে প্রেরণ পূর্ব্বক, আধখানা আলুকে

---

* এই ভূতের গল্পটি লিখিতে আরম্ভ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যু-শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গল্পটি আর সম্পূর্ণ হইতে পায় নাই। শুনিতে পাই, সাহিত্য-পত্রের জন্য এ গল্পটি লিখিত হইতেছিল। মৃত্যুর পর ইহা সুরেশ বাবুর নিকট প্রেরিত হয়। পরে আমি হেমচন্দ্র বাবুর নিকট পাইয়াছি।

তৎসহবাসে প্রেরণ করিয়া, একটু রুটী ভাঙ্গিয়া বাম হস্তে রক্ষা পূর্ব্বক, অগ্রজের মুখপানে চাহিতে চাহিতে চর্ব্বণ কার্য্য সমাপন করিল, পরে এতটুকু সেরি দিয়া, গলাটা ভিজাইয়া লইয়া, বলিল, "ভূত ? না।"

এই বলিয়া সারদাকৃষ্ণ সেন পরলোকগত এবং সুসিদ্ধ মেষশাবকের অবশিষ্টাংশকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। বরদাকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, "rather laconic."

সারদাকৃষ্ণের রসনার সহিত রসাল মেষমাংসের পুনরালাপ হইতেছিল, অতএব সহসা উত্তর করিল না। যথাবিহিত সময়ে, অবসর প্রাপণান্তর তিনি বলিলেন, "Laconic ? বরং একটা কথা বেশী বলিয়াছি, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে 'ভূত আছে'—আমি বলিলেই হইত "না।" আমি বলিয়াছি, "ভূত ? না।" "ভূত ?" কথাটা বেশী বলিয়াছি। কেবল তোমার খাতিরে।"

"অতএব তোমার ভ্রাতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ, এই স্বর্গপ্রাপ্ত চতুষ্পদের খণ্ডান্তর প্রসাদ দেওয়া গেল।" এই বলিয়া বরদা, আর কিছু মটন কাটিয়া ভ্রাতার

প্লেটে ফেলিয়া দিলেন। সারদা অবিচলিতচিত্তে, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিল।

তখন বরদা বলিল, "Seriously, সারি, ভূত আছে, বিশ্বাস কর না?"

সারি। না।/

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে পরের কথা।

-০ঃ*ঃ০-

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হইলে পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী Calcutta University Magazine পত্রে [Dated May 1, 1894] লিখিয়াছিলেন :—

"One of his (Bankim's) ancestors received the title of high nobility in the court of Ballal Sen. His title was confirmed by Ballal's distinguished son, king Lakshman Sen. One of Bankim's ancestors performed the difficult and now unknown sacrifice of *Abasatha*, hence the family was distinguished above all other brahman families in Bengal as *Abasathi*. This family is one of those

which never migrated to Vikrampur after the fall of Hindu monarchy in western Bengal. By the middle of the sixteenth century, when a great Chapter of Rarhyah bramhan nobility was held under the presidency of Devivara, the great re organiser, Bankim's ancestors were found so distinguished for their learning, piety and strict adherence to Hindu laws that they were placed in the highest of the thirty-six exogamus groups or *Mels* into which Devivara divided the *Kulin* brahmans of his time.

"Ishvara Gupta was so much charmed with his (Bankim's) poetical & prose compositions that he often paid him a visit at Kantalpara. In after life, Bankim Chandra used to relate to his friends the story of these visits with pride.

"At College Bankim Chandra was a voracious reader of history, and he always longed to be a distinguished historian. It is often observed that literary men are averse to mathematics, but this was not the case with our hero. He took to mathematics with as much zest as he took to literature. His English style was terse and vigorous, and was often characterised by his superior officers as pungent.

"For six months he officiated as an assistant Secretary to the Government of Bengal. He discharged the functions of that important office with distinguished ability, and received the highest enconiums from the Secretary, the late Mr. Macaulay.

"He was not always social, some people ‹ught he was positively rude, but he was all love, all admiration, in the company of his literary friends whatever their age and position in life."

মসী-যুদ্ধ।

১৮৮২ সালে হেষ্টি সাহেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একবার ঘোরতর মসী-যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধ ষ্টেট্‌সম্যান কাগজেই চলিয়াছিল। শোভাবাজার রাজবাটীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষ হইয়াছিল। মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ খুব জাঁকজমকে সম্পন্ন হইয়াছিল। বৃহৎ সভামণ্ডপে বাঙ্গালার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। এই সভায় ৪০০০ অধ্যাপক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। সেই সভাক্ষেত্রে গৃহবিগ্রহ গোপীনাথজীকে রৌপ্য সিংহাসনে সংস্থাপন করা হইয়াছিল। এই গোপীনাথজীউকে সভামধ্যে দেখিয়া হেষ্টি সাহেবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; ক্রোধ সংবরণে অক্ষম হইয়া তিনি হিন্দুদের ধর্ম্মের উপর তীব্র বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। হেষ্টি সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আক্ষেপ সহকারে বলিলেন, "যে সভায় এই বিগ্রহকে স্থাপন করা

হইয়াছে, সেই সভায় ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কিরূপে অবস্থান করিলেন ?" ক্রমে তাঁহার সুর চড়িয়া উঠিল। তিনি লিখিলেন,—

"No delicate mind can look into a *Shiva* temple without a shudder. The horrid and bloody *Kali*, with her protruding tongue, her necklace of skulls, and her girdle of giant hands, is fitted only to excite terror and despair. The elephant-headed, huge paunched Ganapati may excite the ridicule even of children, but can never draw forth their love. And to take the special example in point of the Krishna cult, what is at the best, with all its merry music and mincing movements, but the apotheosis of sensual desire and the idolatry o merely finite life."

হেষ্টি সাহেব এইরূপে গালি দিয়া হিন্দু ধর্ম্মটা যে তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইলেন। লিখিলেন,—

"But the fundamental position of the defender of idolatry is, •that it is an *Intellectual necessity* for the practical devotion of less cultivated minds.

The essential nature of deity is held to be so abstract and transcendent, that the ordinary worshipper can not apprehend it intellectually, and hence he must have put before him some visible representation of the Divine. This is the sheet anchor of the Hindu apologist to which he binds the whole system."

এইরূপে হিন্দু পৌত্তলিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া হেষ্টি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি কল্পনা-কুশল আর্য্যসন্তান বাঙ্গালী, বুদ্ধি-শক্তিতে কোল, ভীল, সাঁওতাল অপেক্ষা নিকৃষ্টতর?" এ কথার উত্তর তিনি নিজেই কিছু চিন্তার পর দিলেন, বলিলেন, "না, বাঙ্গালীরা কখন এত নীচ, এত স্থূলবুদ্ধি হইতে পারে না যে, তাহাদের হাতেগড়া মাটীর পুতুলের সাহায্য ব্যতীত তাহারা ঈশ্বরের ধ্যান বা উপাসনা করিতে অক্ষম।"

স্তোকটুকু দিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ধরিলেন;—বলিলেন,—

"What is Krishna, after all, but an imaginary embodiment of the sensuous feeling of the East?——"

শ্রীকৃষ্ণকে এক হাত বেশ লইয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মে আমাদের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা বলিতে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন; বলিলেন,—

"And this debasing idolatry produced, according to the painful testimony of native writers themselves, a mass of shrinking cowards, of unscrupulous deceivers, of bestial idlers, of filthy songsters, of degraded women, and of lustful men. * * It has encouraged and consecrated every conceivable form of licentiousness, falsehood, injustice, cruelty, robbery and murder. It has taught the millions every possible iniquity by the example of their gods. • * The Hindu alone still disgraces the nobility of the Aryan race by a Syrian worship of idols, inflaming him with lust under every green tree."

এতদপেক্ষা গুরুতর গালাগালি আর কেহ কখন কোন জাতিকে দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গালি দিয়া, ভারতবর্ষের অবনতি দর্শন করিয়া হেষ্টি সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সে নিশ্বাসেরও সঙ্গে সঙ্গে হলাহল। সাহেব লিখিলেন,—

"O Varat Barsa, the once fair daughter of the

morning, how hast thou fallen from thy throne of pride and become the mother of harlots and of the abominations of the earth !"

এ গালাগালি বঙ্কিমচন্দ্র সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ষ্টেট্‌সম্যানে একখানি পত্র লিখিলেন; সে পত্র খানির নকল নিয়ে দিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র পত্রনিম্নে নিজ নাম স্বাক্ষর করিলেন না—একটা কাল্পনিক নাম দিলেন। নামটি,—'রামচন্দ্র'। শেষ পত্র ছাড়া তিনি অন্যান্য সকল পত্রে 'রামচন্দ্র' বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

No. I (Ram Chandra's.)

"Will you allow me to suggest to Mr. Hastie who is so ambitious of earning distinction as a sort of Indian St. Paul, that it is fit that he should render himself better acquainted with the doctrines of the Hindu religion before he seeks to demolish them. As matters stand with him, his arguments are simply contemptible ; and I think the columns of the STATESMAN might have been more usefully occupied by advertisements about Doorga Puja Holiday goods than by trash which render the Champion of Christianity contemp-

tible in the eyes of idolaters. This may be harsh language, but the writer who mistakes Vedantism for Hindooism, and goes to Mr. Monier Williams for an exposition of that doctrine, hardly deserves better treatment. Mr. Hastie's attempt to storm the 'inner citadel' of the Hindoo religion forcibly reminds us of another equally heroic achievement —that of the redoubted knight of La Mancha before the windmill.

"Let Mr. Hastie take my advice, and obtain some knowledge of the Sanskrit Scriptures in the *original.* Let him study then critically all the systems of Hindu Philosophy—the *Bhagabat Gita*, the *Bhakti Sutra* of Sandilya, and such other works. Let him not study them under European scholars, for they cannot teach what they don't understand; the blind cannot lead the blind. Let him study them with a Hindoo, with one who *believes* in them. And then, if he should still entertain his present inclination, to enter on an apostolic career, let him hold forth at his pleasure, and if we do not promise to be convinced by him, we promise not to laugh at him. At present, arguments would be thrown away on him. There can be no controversy on a subject when one of the controversialists is in utter ignorance on the subject-matter of the

controversy; and if under such circumstances the 'Olympians only yawn,' and do not assert, Mr. Hastie has only to thank his own precipitate ignorance."

পত্রখানা পড়িয়া হেষ্টি সাহেব বুঝিলেন, তাঁহাকে এবার একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুঝিতে হইবে। তিনি এতদিন যে সকল হিন্দুদের সঙ্গে মসীযুদ্ধে ব্রত ছিলেন, তাহাদের তাচ্ছল্য করিয়া লিখিলেন,—

"I do not intend to ask space for a reply to any of the *special* criticisms of your numerous correspondents upon my letters, until they say something relevant and worthy of being dealt with. But I hope you will allow me to return grateful thanks to the valiant hero of the modern Brahmans, *Ram Chandra, Redivivus,* for the kind advice so bountifully tendered to me in your columns to-day, which I sincerely promise to put into practice, as soon as he shows that I have need of it. Your readers, who may be better acquainted with Sanskrit literature than he seems to be, will have already judged whether I confounded Vedantism with Hinduism."

হেষ্টি সাহেব ক্রমে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং রামচন্দ্রকে "superciliouss and self-confident" বলিয়া আখ্যাত করিলেন। তার পর রামচন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া স্পর্দ্ধাসহকারে লিখিলেন—

"I publicly challenge him to substantiate his allegation of the 'contemptible' inferiority of 'blind' European learning, by giving, without its aid, an intelligible explanation of the simple *Vedic* verse—"Chatustrinsadvajino devabandhorvankrirasvasya svadhitih sameti." * I give him the whole of the Durga Puja holidays even to discover the difficulty involved in the expression, and if he does find out so much, I will give him, and the other 4000 *Adhyapaks* to boot, who were present at the great *Shradh*, as many months as they like, to search through all the Sanskrit literature known to them, for an explanation."

সাতদিন যাইতে না যাইতে হেষ্টি আর একখানা পত্র লিখিলেন। তাহাতে লিখিলেন,—

"I am waiting patiently for a reply to my last letter from the learned *Ram Chandra* and the 4000

* চতুস্ত্রিংশদ্বাজিনো দেববন্ধোর্বংক্রীরশ্বস্য স্বধিতিঃ সমেতি।

Adhyapaks of the *Shradh.* It is really a challenge to all the Pundits of Bengal to show that they understand their own sacred literature, and are able to defend it at the bar of modern science. If none of them—not even the modern *Ram Chandar* himself—can come forward and bend this bow of a Western Janaka, let the champions of Hindu idolatry henceforth 'hide their diminished heads' before the more powerful scholars of Europe, and let the last abominations of that idolatry, even in these Durga Puja days, slink into utter darkness and shame."

এ পত্র ষ্টেট্‌সম্যানে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই রামচন্দ্রের পত্র লিখিত ও প্রেরিত হইল। তাঁহার পত্রের কিছু কিছু পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

No II. (Ram Chandra's).

"The courage and dash with which Mr. Hastie throws down the gauntlet I admire and acknowledge with a low *silaam* merely suggesting, in all humility, the necessity of further improvement in transliterating and transcribing Sanskrit texts.

* * *

"In plain language, as some irreverent heathen may be supposed to say, *Mr. Hastie loses temper.* That is an important point gained in favour of Hinduism. Mr. Hastie attacks, without any provocation, the proceedings in a solemn mourning ceremony held in the private dwelling house of one of the most respectable Hindu families in the country; attacks all the most respected members of native society; attacks their religion; attacks the religion of the nation. And all this without the slightest provocation, and from no other motive than a somewhat overflowing zeal in the cause of truth and of religion. And then, when an humble individual of the nation, whose religion he tramples upon, ventures upon a single retort, Mr. Hastie's temper is on fire and it explodes. The combatant who loses his temper in fight, is scarcely believed to be on the winning side. That is the point I score in favour of Hinduism. If this is the attitude which the Christian Missionary of the present day thinks it proper to assume fowards Hinduism, Hinduism has nothing to fear from his labours.

"I suggested to Mr. Hastie that before putting himself forward as the assailant of the Hindu religion he should study the Hindu scriptures

in the original, and under the guidance of those native scholars who believe in them. That Mr. Hastie does not choose to accept my advice does no harm to me or to my cause. It is no loss to the Hindu religion that its assailants do not choose to be better armed than they are. But beneath Mr. Hastie's scornful rejection of my advice lurk some errors which are not confined to him, but are shared by a large class of Europeans.

"* * * A brief consideration will convince Mr. Hastie and others who think with him, that no translation from the Sanskrit into a European language can truly or even approximately represent the original. Let the translator be the profoundest scholar in the world—let the translation be the most accurate that language can make it, still the translation will be, for practical purposes, very wide. The reason is obvious. You can translate a word by a word, but behind the word there is an idea, the thing which the word denotes, and this idea you can not translate, if it does not exist among the people in whose language you are translating.

* * *

"And who is best qualified to expound the ideas and conceptions which can not be translated—

the foreigner who has nothing corresponding to them in the whole range of his thoughts and experiences, or the native who was nurtured in them from his infancy? If obviously the latter, what is the meaning of this towering indignation at my suggestion that Mr. Hastie should resort to the latter for instruction? I added that he should take his lessons not merely from a Brahmin, but from a Brahmin who *believed* in them. * * * If Mr. Hastie thinks that he can comprehend the vast complicated labyrinth of Hindu religious belief without studying it in the original sources of knowledge, and in a spirit of patient, earnest, and reverential search after truth, he will meet with bitter disappointment. He will fail in arriving at a correct comprehension of Hinduism, as—I say it most emphatically—*as every other European who has made the attempt has failed.* And if he thinks that his eloquence alone will enable him to demolish the oldest and the most enduring of all religious systems without a correct knowledge of its doctrines—why, I can only wish for an Indian Cervantes to record his achievments.

Mr. Hastie has unnecessarily complicated the question by his protest on behalf of European

Sanskritists. No one questions their *scholarship*. I can assure him that men like Max Muller and Goldstucker, Colebrooke and Muir, Weber and Roth do not stand in need of a champion like Mr. Hastie. I yield to none in my profound respect for their learning, their ability, and the large-hearted philanthropy which leads them to devote themselves to pursuits from which my countrymen recoil in fear and despair. When, however, Mr. Hastie goes on to say that "both the Sanskrit language and Sanskrit literature are much better understood in Europe or America than they are in India," I decline to follow. It is, I believe, one of the most monstrous assertions ever made ; but what gives it importance is that not a few Europeans, and possibly some Anglicised natives—Hindus I can not call them—who do not mix with their own race, believe it to be true.

* * *

"The fundamental doctrines of the Hindu religion and its vast details are what no European scholar is competent to teach. This I did mean to say, and this I again positively assert. I will add, that there are many other things in Indian literature and Indian philosophy—other things than the religious doctrines—which no European scholar

understands, and no European scholar is competent to teach."

এ পত্রে এই পর্য্যন্ত লিখিয়া রামচন্দ্র লিখিলেন, "যদি হেষ্টি সাহেব নিতান্তই জেদ করেন, তাহা হইলে আমার প্রকৃত নাম শেষপত্রে সন্নিবেশিত করিব। আপাততঃ হেষ্টি সাহেবের অবগতির জন্য আমার নামের কার্ড পাঠাইলাম। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী একজন নগণ্য ব্যক্তি; ইহা দেখিয়া হয় ত তিনি হতাশ হইবেন; কিন্তু সে প্রতিদ্বন্দ্বী যে একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ, সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ থাকিবে না।"

এই পত্র পড়িয়াই হেষ্টি সাহেব লিখিলেন,—

"It was not without a certain "stern joy" that I discovered the valiant Ram Chandra marching out this morning, with a long column, to the defence of his ancient windmills; although I must confess, I am deeply disappointed to find that he is not the learned Shevaite priest and protagonist of local Hinduism, that I took him to be, when I singled him out as the strongest of all my assailants for a reply. * * *

"But when the mighty Ram Chandra, like a

Deus ex machina, in all the imposing pomp of a new *Avatar*, appeared on the scene, claiming all the wisdom of India for himself, and treating me with such contempt as would have been intolerable to a "black beetle", I deemed it quite in order to reply to him in somewhat of his own style."

এইরূপ লিখিয়া সাহেব বিশেষভাবে জানাইলেন যে, তাঁহার কোনরূপ ক্রোধের সঞ্চার হয় নাই। উপরিউক্ত পত্র লিখিবার সময় তাঁহার মনের ভাব এত প্রফুল্ল ছিল যে, সে রকম প্রফুল্লতা কদাচিৎ তিনি ইতিপূর্ব্বে অনুভব করিয়াছেন। ইহা বলিয়াই আবার লিখিলেন,—

"In my own confidential circle, his lucubrations are giving immense amusement, and, riddle or conundrum ; the more he writes on the subject of my challenge, the more he will amuse us."

—o—

এইবার রামচন্দ্র একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। পত্রখানি গভীর গবেষণাপূর্ণ। আমি কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তবে যে অংশ নিতান্ত

নিষ্প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলাম তাহাই পরিত্যাগ করিলাম।

No. III. (Ram Chandra's).

"I am sorry to have again kept Mr. Hastie and his "confidential circle" waiting for the promised amusement, but a Brahman's proper occupation during the Pujas is feasting, not controversy. Advised by Mr. Hastie that religious discussions contribute so abundantly to clerical mirth, I now hasten to treat him to a rather large measure of that commodity.

"Your readers may consider it somewhat superfluous that anybody should undertake to prove that those who profess a religion understand its doctrines better than those who do not profess it. I must do Mr. Hastie the justice to say that he has nowhere distinctly denied this. It is, however, really the absurd position Mr. Hastie has taken up. It is the logical outcome of that monstrous claim to omniscience, which certain Europeans—an extremely limited number happily—put forward for themselves. No knowledge is to them true knowledge unless it has passed through the sieve of European criticism. All coin is false coin unless

it bears the stamp of a Western mint. Existence is possible to nothing which is hid from their searching vision. Truth is not truth, but noisome error and rank falsehood, if it presumes to exist outside the pale of European cognizance."

ইহা বলিয়া রামচন্দ্র একটি গল্পের অবতারণা করিলেন। গল্পটি দেশ-প্রসিদ্ধ; এক জন জাহাজী গোরা পিপাসা ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া জনৈক ভারতবাসীর নিকট কিছু আহার্য্য প্রার্থনা করিল। দেশবাসী তাহাকে একটি নারিকেল দিয়া কি রূপে তাহা খাইতে হয় উপদেশ দিল। ক্ষুধার্ত্ত নাবিক পূর্ব্বে কখন নারিকেল দেখে নাই; সে দাঁত দিয়া ছোবড়া ছাড়াইয়া চিবাইতে লাগিল। ছোব্ড়ার স্বাদ সে পছন্দ করিল না। অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া নারিকেল ছুঁড়িয়া দাতার মাথায় মারিল।

এই গল্পের অবতারণা করিয়া রামচন্দ্র অবশেষে বলিলেন যে,—

"The sailor carried away with him an opinion of Indian fruits parallel to that of Mr. Hastie and others, who merely bite at the husk of Sanskrit

learning, but do not know their way to the kernel within."

* * *

"Let us lay aside all general reasoning, and come to a circumstance peculiar to India, which alone is of sufficient weight to decide the case in my favour. I refer to the existence, unheeded by, or unknown to, the European, of a vast mass of *traditionary and unwritten knowledge in India*, used to supplement, illustrate, or explain the written literature. It is generally understood now that even before the art of writing was known in India, there was already a bulky literature which had to be handed down from teacher to pupil by word of mouth. * * * Knowledge in India thus came to be in part recorded in a written literature, and in part handed down as unwritten and traditional. All who have studied under the older generation of *Bhattacharjyas* of the *Tols* know, as I have the good fortune to know, that of the wealth of learning which flowed from their lips, much had no record except in the memory of the professors. This was specially the case with artistic and scientific knowledge, where another motive—professional jealousy—came into play. Each discoverer, anxious to confine to himself and

his own circle the discovery at which he had arrived, never trusted it to writing, and satisfied himself with communicating it to his pupils in confidence. To this jealousy we owe that India has now utterly lost so many of her ancient arts and so much of her ancient sciences. Medical science is a conspicuous instance; and the native physician, trained in European schools, still fails to wrest from the jealousy of the *Kabiraj* treasures of knowledge which both regard as invaluable. Now all this unwritten and traditional knowledge, which is flesh and blood to the dry bones of the written literature, is wholly unavailable to the European scholar. The dry bones rattle in his hand, and as he knows how to rattle them well, they make a thundering noise in the ears of the civilised world. But the breathing form of old learning and the old civilisation is visible to native eyes only.

"I have no hesitation in admitting the decided superiority of the European enquirer in the fields of Vedic literature. To the Indian student Vedas are dead; he pays to them the same veneration which he pays to his dead ancestors, but he does not think that he has any further concern with them. They do not represent the living religion of India,

and the only interest that can be felt in them by any human being is merely the historical interest. That is all in all to the accomplished European scholar, but of little moment to the native student who has never displayed any gifts for history. This accounts not only for the superior Vedic learning of the European, but also for the far superior value of his contributions to Indian and Aryan history. In all other departments of learning there can be no comparison between the profound but unostentatious learning of the Pundit of the *Tols* with the shallow but showy acquisitions of the European professors. The rich and varied field of Indian philosophy the latter has trod but with a slight step. Into the subtle and profound Nyaya philosophy of the Bengal school, into that which formed the field on which Raghunath, Gadadhara, Jagadisa won their great and lasting triumphs of intellect, the pride and glory of the Bengali race, he has not obtained a glimpse. Of the great Vaishnava philosophy first formulated in that book of books—the Bhagavata Purana—and developed by a succession of brilliant thinkers, from Ramanuja to Jiva Goswami, he has no adequate conception. Nothing has so largely influenced the fate of some of the Indian peoples as the Tantras, and of Tan-

tra literature the European knows next to nothing. The secular poetry of ancient India he has studied, translated and commented upon, but has failed to comprehend. A single hour of study of the Sakuntala by a Bengali writer, Babu Chandra Nath Bose, is worth all that Europe had to say on Kalidasa, not excepting even Goethe's well known eulogy. Hindu law, the *Smriti*, is still the almost exclusive study of the Hindus themselves. The legends of the Hindu faith, which are to the European inexpressibly silly, he has hitherto honoured only with his laughter ; to the loving study of the author of *Pushpanjali* (also a Bengali writer, Babu Bhudeb Mukerji) they have yielded results not surpassed in loftiness and splendour by anything in European literature. And I might go on with this enumeration for columns together, but this ought to be enough.

"I have been somewhat taken by surprise to find in Mr. Hastie's letter that he expects to find in this letter of mine such "explanation and defence" of Hinduism as I may be able to offer. He forgets that the issues between us exclude the larger question of the merits of Hinduism, and that in my very first letter I told him that no controversy was possible with him at

present, because he did not possess the necessary qualifications.

"Hinduism does not consider itself placed on its defence. In the language of lawyers, there is not yet a properly framed charge against it. And at the bar of Christianity, which itself has to maintain a hard struggle for existence in its own home, Hinduism also pleads want of jurisdiction. But I admit Mr. Hastie's right to demand an exposition of their views from those who do not accept his own. * * *

"Hinduism, like every other fully developed religious system, consists of, *Firstly*, a doctrinal basis or the creed; *Secondly*, a worship or rites; and *Lastly*, of a code of morals more or less dependent upon the doctrinal basis. This is the whole field of study; but let it be well surveyed. The doctrinal basis will be found to consist in (*1*) *dogmas* formulated, explained and illustrated in a mass of philosophical literature*; and (2) legends, which form the legitimate subject of the Puranas, though these encyclopædic productions contain many things other than the legends. The value of the legends is inferior to that of the philosophy, in the depths of which are laid, broad and solid, the foundations of modern Hinduism. The whole

of Hindoo religious philosophy is probably post-Vedic, and serves to mark the era of separation between the ancient and modern religions of India. Each modern Hindu sect has now its own system of philosophy, but the more general conclusions of philosophy are common to all; and among all the dogmas, there is one in particular which has had more influence in shaping the destinies of India than any other. Kapila had the glory of first announcing it to the world, and the philosophy of Europe and Asia has not up to this day alighted upon a discovery grander or more fundamental than the profound distinction first made by him between matter and soul—between *Purusha* and *Prakriti*. In the hands of the eclectics, who are the real fathers of modern Hinduism, this great conception has taken its place as the backbone of their fabric. It runs through the whole world of Hindoo thought, shaping the legends, prescribing the rites, and running through even the secular literature. So long as the student of Hinduism keeps this great idea before him, he will find Hinduism a living organism which has *grown*, and not a collection of dead formulæ lumped together by finest craft.

"*Prakriti*, properly translated is Nature.

Modern science has shown what the Hindus always knew that the phenomena of nature are simply the manifestations of *Force.* They worship, therefore, Nature as *Force. Shakti* literally and ordinarily means force or energy. As destructive energy, force is *Kali*, hedeous and terrible, because destruction is hedeous and terrible. As constructive energy, force is the bright and resplendent *Durga.* The universal soul is also worshipped, but in three distinct aspects, corresponding to the three qualities ascribed to it by Hindu philosophy. These are known in English translations as Goodness, Passion, and Darkness. I translate them as Love, Power, and Justice. Love creates, Power preserves, Justice dooms. This is the Hindu idea of Brahma, Vishnu, and Siva. I cannot stop to discuss the relation of these gods to their Vedic predecessors of the same names. The new religion grew out of the old, those time-honoured names were retained, but were grouped under new ideas. The citadel had been stormed and battered down by the Buddhists and the Philosophers themselves; and had to be reconstructed out of the old materials, but on new and more solid foundations. Pantheism and Polytheism, philosophy and mysticism all lent a hand; and

out of this bold electicism rose the beautiful religion which I do not believe to be of Divine origin, but which I accept as the perfection of human wisdom.

The great Duality—Nature and Soul—presides over all. Let us now see how the same great conception shapes the Legends. It will be enough to take for this purpose the legends of Krishna, because they are the most important, but I have time only for the briefest explanation. Krishna is Soul, Radha is Nature. The Sankhya Philosophy—the school to which the great conception of Nature and Soul originally belongs but which in spite of its wealth of thought, is a gloomy pessimism—had laid down that supreme human bliss consisted in the dissociation of Soul from Nature. It had pronounced their connexion illegitimate; and the legend of Radha and Krishna retains the illegitimate connexion. Nevertheless, the Hindu worship this illicit union. He worships them, because with a truer insight than is given to a morose philosopher, he has perceived that in this Union of the Soul with Nature lies the source of all beauty, all truth, and all love. And this magnificent legend, the basis of the Hindu religion, of *love for all that exists*, is treated by its European critics as

the grossest and most revolting story of crime ever invented by the brain of man. So much for the intellectual superiority of Europe.

"I will next add an illustration to show how the same great conception runs through even the secular literature of ancient India. The Kumara Sambhava, the noblest philosophical poem to be found in any language, but, I regret to say, one of the least understood both in India and Europe, celebrates the Marriage of Nature with Soul, typified in Uma and Siva. In the hands of the great poet, the union is a legitimate one—a holy marriage. The poet could soar above both Philosopher and Puranist. I regret I have not space to explain or to do justice to Kalidasa's magnificent conception; the yearning of the physical and human for the moral and the divine, and the accomplishment of their union after purification through the sacrifice of earthly desires and the discipline of the heart. In that sacrifice, and in that discipline is to be found the poet's refutation of the philosopher. The sacrifice, the destruction of Kama, is narrated in a well-known passage, which still remains the loftiest in all Indian literature, and is unrivalled by any I have come across in the poetry of any other nations.

"I now pass on to the worship. Much of the Hindu ritual is mummery, admitted to be so by even the priests, and rejected with deserved contempt by educated Hindus. Mr. Hastie finds out, I hope, that the Hindu Idolatry, which is generally treated by the Christian Missionary as covering the whole field of Hinduism, is really a small fraction of it and comes under consideration as a subordinate part of this second division of our subject. Mr. Hastie will probably be startled to hear that idolatry, though a part of Hinduism, is not an essential part even of the popular worship. Idol worship is permitted, is even belauded in the Hindu Scriptures but it is not enjoined as *compulsory*. The daily worship of the Hindu—his Sandhya—his Ahnika,—is not idolatrous. The orthodox Brahman is bound to worship Vishnu and Shiva every day, but he is not bound to worship their images. He may worship their images if he choose, but if he does not so choose, the worship of the Invisible is accepted as sufficient. The majority of Brahmans, I believe, do not in the daily rites go beyond this worship of of the Invisible and the Unrepresented. A man may never have entered a temple and yet be an orthodox Hindu.

"And I must ask the student of Hinduism when he comes to study Hindu Idolatry, to forget the nonsense about dolls given to children. I decline to subscribe to what is simply childish, even though the authority produced is titled authority with a venerable look. The true explanation consists in the ever true relations of the Subjective Ideal to its Objective Reality. Man is by instinct a Poet and an Artist. The passionate yearnings of the heart for the Ideal in Beauty, in Power, and in Purity, must find an expression in the world of the Real. Hence proceed all poetry, and all art. Exactly in the same way the Ideal of the Divine in Man receives a Form from him, and the Form an Image. The existence of Idols is as justifiable as that of the tragedy of Hamlet or of the story of Prometheus. The *Religious* worship of idols is as justifiable as the *Intellectual* worship of Hamlet or Prometheus. The homage we owe to the ideal of the human realised in art is Admiration. The homage we owe to the ideal of the Divine realised in idolatry is Worship.

"Nor must the student fall into the error of thinking that the image is ever taken to be the God. The God is always believed, by every worshipper, to exist apart from the image. The image

is simply the visible and accessible medium through which I choose to send my homage to the throne of the Invisible and Inaccessible. Images of gods have in themselves no sanctity. They are daily sold in the bazaars as toys. The very images worshipped are made by impure workmen, sold in the bazaars, and are treated on exactly the same footing as other shopkeeper's wares. They do not acquire any sanctity till the *Prana Pratistha*, i. e., till I consent to worship it. The image is holy, not because the worshipper believes it to be his god—he believes in no such thing—but because he has made a compact with his own heart *for the sake of culture and discipline* to treat it as God's image. Like other contracts, this one, with the worshipper's own heart, he may terminate at his pleasure. When he terminates it, he ceases to worship the image and throws it away, as we have just thrown away by thousands, the images of Durga. He could not do this if for a moment he believed it to be his God.

"Our idols are hideous, say they. True, we wait for our sculptors. It is a question of art only. The Hindu pantheon has never been adequately represented in stone or clay, because India has produced no sculptors. The images we wor-

ship in Bengal are, as works of art, a disgrace to the nation. Wealthy Hindus should get their Krishnas and Radhas made in Europe.

"We come last of all to the ethics of the Hindu religion. Like all other complete codes of morality, the Hindu ethical system seeks to regulate the conduct of individuals, as well as the conduct of society. It is a System of Ethics as well as a Polity. The code of personal morality is as beautiful, if not more so, as any other in the world, not excepting the Christian; a degree of excellence which the Christian accounts for by supposing, like Mr. Hastie, that it must have been derived from Christian sources, very much after the logic of a little fellow I know, who insists that every man who drives in a carriage is his grandsire, on the ground that his grandsire drives in a carriage. The Social Polity is even more wonderful. It is the only system which has even succeeded in substituting the government of Moral Power in the place of that of Physical Power. It is the only system which has abolished War and the Military Power.

"If the profoundest European thinker of the nineteenth century had any acquaintance with India, he might have known that his dream of a

Positive Polity and an Intellectual Hierarchy had, thousands of years ago, been thought out and realised with a success transcending all his anticipations.

"Here, too, however, the student must distinguish between the Essentials of Hinduism and its Non-essential adjuncts. Much of the ethical portion is pure Ethics, and not Religion. The social polity is also non-essential. Caste, therefore, which is the most prominent feature of that polity, is non-essential. There have been and there still are many Hindu sects who discard caste distinctions. The Chaitanyaite Vaishnavas furnish an instance in point.

"Mr. Hastie may turn round upon me here and say, "You strip Hinduism of its rites, its idolatry, its caste; what do you then leave it?"—I leave *the kernel without the husk.*

"I have done. I hope Mr. Hastie now understands how I dispose of his challenge. The modern Rám Chandra turns away from the Western Janaka's bow without touching it even with the tip of his little finger. For, alas! the new Janaka has no Janaki to offer as the prize. Truth, the Janaki he seeks to win, must be wooed in another fashion. Methods of

disputation which find favour among pugnacious schoolboys gathered at a wedding feast are as unworthy of Mr. Hastie as they are of me. But if confession from me of inferiority to Western Scholars in Vedic learning will bring any comfort to Mr. Hastie, he will see that I have already made such confession on behalf of my countrymen, and I even more readily make it on my own behalf. I make no pretension to scholarship of any kind.

"I have to thank Mr. Hastie for his very kind offer to procure for my lucubrations the recognition of the great Sanskritists of Europe. I assure Mr. Hastie that he has mistaken his man. Happy that such recognition is already the fortunate lot of certain *distinguished* countrymen of mine, whom I somewhat reluctantly spare the humiliation of being mentioned by name in this connection. I hasten to assert Mr. Hastie that I am not ambitious of honours which I do not deserve and may not prize. As my card is already at Mr. Hastie's disposal, I may presume to tell him that the approbation of a whole people has consoled me during a quarter of a century, and may console me still, for the absence of laurels which more fitly grace the heads that wear them now. If Mr. Hastie

knows anything of Hinduism, he knows that the Hindu places the wreath round the full, not round the empty, vessel. I am sorry to have to say this, but Mr. Hastie's pointless jest carries an insinuation which can be met only in this way.

"In conclusion I have to thank you for allowing me the very unreasonable extent of space which I have taken up. I have also to express my deep commiseration for Mr. Hastie's bitter disappointment in finding that Ram Chandra was not the very great man from whose encounter he had expected to add fresh lustre to his rusty arms. There is, however, nothing like hope. Let him cheer up. A louder and shriller blast at the castle-gate of Hinduism may yet procure him the honour of an encounter with even—aye, even with the windmills."

পত্রখানা পড়িয়া হেষ্টি সাহেব যেন কিছু অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি লিখিলেন ;—

"If this shallow verbosity, this inconsistent farrago of phrases, this total irrelevance of reasoning, this feeble commonplace of reflection, this

utter ignorance of even the rudiments of Hindu mythology and philosophy, is to be taken as the highest exposition of religion of the educated Hindu, then tell it not in Europe, publish it not in America, but let more earnest men try to give it the "happy dispatch" as soon as possible. It will surprise me if the more learned representatives of Hinduism—for there are such—do not publicly repudiate Ram Chandra as an unbidden intruder into this controversy, and as no chosen champion of theirs. They will say that, if he is any thing, he is a romancer, and not a reasoner; an Anglicist and not a Sanskritist; an apostate and not an apologist; a poetaster and not a critic. Had the abler men whom he names—Dr. Rajendra Lala Mitra or Babu Bhudeb Mookherjee—come to the rescue, they would not have written better English; but they would have been more cautious, more correct, and less vulnerable in their utterances and theories."

এইরূপ অনেক কথা লিখিয়া হেষ্টি সাহেব পত্রখানা শেষ করিলেন।

পরদিন হেষ্টি সাহেব আবার এক খানি দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। সে পত্র খানায় বেদ ও তন্ত্র লইয়া অনেক আলোচনা করিলেন। দুই দিন যাইতে না যাইতে

আবার এক খানি পত্র লিখিলেন, এই তৃতীয় পত্র ইংরাজি সাহিত্যে এক অপূর্ব্ববস্তু হইয়াছে। এই পত্রে তিনি সাংখ্য, পাতঞ্জল—পুরুষ-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

"রামচন্দ্র" কপিলকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া বলিয়াছিলেন, "জগতের মধ্যে তিনিই প্রথমে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া দর্শনশাস্ত্র লিখিয়াছিলেন।" হেষ্টি সাহেব সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আরিস্‌টটল্ ভারতে দর্শনশাস্ত্র আনিবার অনেক পরে কপিল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" অবশ্য কপিল কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কেহ আজও স্থির করিতে পারেন নাই।

এক স্থানে হেষ্টি সাহেব বলিলেন,—

"Hinduism *has only a rotten husk and no kernel.* It is *full* of *Nothingness,* says Kapila, and all the rest of them except Ram Chandra. It is vain to try to put life or light or love into its "eyeless socket" again, or to attempt to cover its "rattling bones" with the semblance of new "flesh and blood."

Not a breath of real spiritual life stirs in the bare shaking skeleton, and we can now look it through and through."

—o—

এইরূপে হেষ্টি সাহেব তাঁহার শেষ পত্র সমাপ্ত করিলেন। "রামচন্দ্র" এ পত্রেরও কোন উত্তর দিলেন না। নয় দিন পরে রেভারেণ্ড কে, এম, ব্যানার্জ্জি—হেষ্টি সাহেবের অনুরোধে হউক বা যে কোন কারণেই হউক—আসরে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"You can easily understand that having spent a whole life on the consideration of the mutual bearing of Christianity and Hinduism on the question of the regeneration of India, I could not have read, without deep interest, the last controversy between Mr. Hastie and our distinguished and accomplished countryman, who appeared under the assumed name of 'Ram Chandra.'

* * * *

"Ram Chandra has called the idolatrous rites and ceremonies of Hinduism its *husks*, not its *kernel*. If Ram Chandra's view of Hinduism be right, then, on his own theory, Mr. Hastie could not be wrong in condemning and denouncing those persons who were inflicting serious injury, from a moral point of view, on their hosts and neighbours by encouraging *husk-chewing*.

As to the view of Hinduism which Rám Chandra has propounded, I am obliged to confess to a sad feeling of disappointment. Whatever the pen of the author of "Kapalakundala" offers to the public, is entitled to our patient attention. But what can be more startling; what more galling to our national pride; what more opposed to our early intuitions, and our unwritten traditions of past ages, than the unequivocal denial of the Vedas ('which are dead!') as the authoritative basis of Hinduism. This denial flatly contradicts Manu and all the authors of our sacred literature; nay, pours contempt on the whole civilised world.

It is difficult to say what your correspondent's idea of Hindu *philosophy* is. He has certainly extolled the Sankhya and the Nyaya. But Kapila could not allow the creative agency of *Purusha*,

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

Mohila Press, Calcutta

and the *Nyaya* could never be so disloyal to its Atoms as to allow any place for *Prakriti*.

"Ram Chandra tells us that "nothing has so largely influenced the fate of some of the Indian peoples as the *Tantras*, and of *Tantra* literature the European knows next to nothing." If this has any meaning, it must be that the *Tantra* with its *unwritten* traditions, is the general basis of the Hindu religion, and, consistently enough, he maintains that the Hindu worships the "illicit union" between Purusha and Prakriti, retained in the "illegitimate connection of Krishna and Radha." As a reader of Kapalkundala, I am amazed at such statements.

"I believe there are many Hindus who, inclining to the Vedanta, and looking for the *Mukti* which it promises, have nothing to say to Prakriti, of which even those who do speak of Purusha and Prakriti, the vast majority is innocent of the worship of any "illicit union". If there be worshippers and imitators of "illicit union", they must chiefly be in circles of Mohunts and recluse hermits, whether of the Vaishnava or Sakteya sects. Householders, men of repute in society, the better classes of the Hindu community, cannot and could not be included in such secret circles.

It would be a cruel defamation to Hindu families to attribute to them belief in the system elaborated by Rám Chandra from Tantric sources. The followers of Nyaya, Vedanta and Sankhya philosophies would repudiate such an abuse of the ideas of Purusha and Prakriti, and the best practical *expose* of the illicit union is contained in that great Bengali romance, the Kapalakundala. The great Tantric hero of that inimitable novel is Kapalica, a representative worshipper of Bhavani and Bhairavi, as personations of Sakti or Prakriti.

*   *   *

"What, then, it may be asked, is the general religion of the Hindus? I can only answer the question by the help of our past written literature, including the "*dead Vedas*." No Hinduism can be found anywhere that will correspond to every age and epoch in the history of the Hindus. I think it has passed through four stages from the commencement, and without further preface I will at once say a few words on its passages through those stages.

"I. The first or primitive stage of Hinduism is marked by the celebration of sacrificial rites, as figures or images of Prajapati, the Lord of the Creation, who "had offered himself a sacrifice

for emancipated souls" (*Satapatha Brahmana*). The same Prajapati is elsewhere described as the Purusha, "begotten from the beginning," whom "the Gods sacrificed on the sacred grass".

"II. The second stage was characterized by a change from the monotheistic to the dualistic in doctrine, but the practice of sacrifices continued as before. A declension in doctrine rapidly followed. The self-offering of Prajapati was forgotten, and the significance of sacrifice as a figure of Prajapati was lost.

"III. At this stage it was that philosophy began to influence the creeds of India. The Nyaya while it contended for Brahminical supremacy, generally adopted the grounds on which Buddhism had based its doctrine of Renunciation and Nirvana. The Nyaya did not follow the principles of Shakya Singha in his description of world as a *Maya* or *Mirage* but it proclaimed the doctrine of *Mukti* as the final consummation of Hinduism. The Sankhya, with greater Buddhistic tendency, denied the existence of an intelligent Creator, and pointed to a final consummation not unlike that of Buddhism. The Vedanta, though decidedly an advocate for the Veda and the dignity of the Bram-

hinhood, yet inculcated the idea of a final absorption in Brahma, which is also called Nirvana.

"IV. In this stage Krishna was invested with supreme divinity, at the head of the Pantheon, not however, without occasional conflicts with Shiva, who aspired after the same dignity.

"The Brahmin is still bound to daily repetitions of the Gayatri and Sandhya, the former being a Vedic verse, and the latter a collection of Vedic passages, but neither are in any way connected with the Trantras. He is also bound to the worship of Vishnu and Shiva, without any reference to Purusha or Prakriti.

এই পত্র পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি উত্তর দিলেন। কিন্তু সকল কথার উত্তর দিলেন না; মাত্র তন্ত্রের কথা তুলিয়া যা' কিছু বলিলেন। পত্র খানা আগাগোড়া তুলিয়া দিলাম।

No. IV. (Ram Chandra's).

"I have no wish to re-open the controversy I have closed, but allow me to remove a misconception—a most painful one, as your readers will see.

"Dr. K. M. Banerjee writes :—"Ram Chandra tells us that nothing has so largely influenced the

fate of some of the Indian peoples as the *Tantras*, and of *Tantra* literature the European knows next to nothing. If this has any meaning, it must be that the *Tantra* with its *unwritten traditions*, is the general basis of Hinduism."

"That certainly is *not* the meaning, and I have not understood how such an interpretation has been arrived at. There may be opinions which influence the destinies of nations, without being the base of national religion. The paganism of Greece has largely moulded, in some of its aspects at least, the civilisation of modern Europe; but the paganism of ancient Greece is not the general basis of Christianity. Islamism has very greatly influenced the destinies of India, without being the general basis of Hinduism. Christianity at this day largely influences the destinies of India, yet Christianity is not the general basis of Hinduism.

"What the influence of Tantrikism has been on the people of Bengal, of Assam, and of Orissa, I do not propose to discuss here. I can assure Dr. Banerjee that he cannot be more emphatic in the condemnation of Tantrikism than I am, and that I have in no respect departed from the view I put forth and illustrated in *Kapala Kundala* in regard to the morality of that form of Hinduism.

True Hinduism and Tantrikism are as mnch opposed to each other as light and darkness, and I say with as much sincerity as he does, that let it never be assumed that Tantrikism is the general religion of the Hindus ; no one, I believe, has ever thought of making such an assumption.

"Let Tantrikism perish—but let it not perish unstudied. The study of the darkest errors of humanity yields lesson as valuable as that of truth itself. And what is history, if it is not the history of human errors.

"When Mr. Hastie talked of the "Tantric Bible" and such other nonsense, I did not consider it necessary to make a reply ; he had shown himself not to be entitled to any. It is different when Dr. Banerjee misconceives my meaning. I respect him too highly to remain silent.

"As it can no longer be necessary to write under an assumed name, I subscribe my own.

Bankim Chander Chatterjee".

November 18, 1882.

এইখানেই এই প্রসিদ্ধ মসীযুদ্ধের অবসান হইল। লেখকত্রয়ের কেহই বাঙ্গালা দেশে অপরিচিত নহেন। তাঁহাদের গভীর জ্ঞান, অসাধারণ পাণ্ডিত্য

সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম তাঁহারা কেহ কি কিছু বুঝিয়াছিলেন? যদি পাঠকদের মধ্যে কেহ এমন সুপণ্ডিত থাকেন, তবে তিনি ইহার বিচার করিবেন; এবং, যদি অভিরুচি হয়, জগৎকে তাঁহার বিচারফল জানাইবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের একটা কথা আমার ভাল লাগে নাই। হেষ্টি সাহেব বলিয়াছিলেন, হিন্দুদের ঠাকুর গুলার মূর্ত্তি অতি ভয়ানক; বিলোলরসনা নৃমুণ্ডমালিনী কালীর প্রতিমা, বা হস্তিতুণ্ড গণেশমূর্ত্তি দেখিলে উপাসকের মনে কখনও ভক্তির উদয় হইতে পারে না। হেষ্টি সাহেবের মতে এ সব মূর্ত্তি অতি বীভৎসদর্শন।

বঙ্কিমচন্দ্র কথাটার ঠিক উত্তর না দিয়া বলিলেন, "সত্য বটে, আমাদের প্রতিমানিচয় বীভৎসদর্শন, কিন্তু সে দোষ হিন্দুধর্ম্মের নয়—দোষ হিন্দু কারিগরের। বাঙ্গালায় যে সকল প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, তাহা বাঙ্গালা কারিগরের কলঙ্কস্বরূপ। ধনবান্ হিন্দুদের উচিত, কৃষ্ণ ও রাধার মূর্ত্তি য়ুরোপ হইতে প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করা।"

উত্তরটা ঠিক হয় নাই বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র যদি বুঝাইয়া বলিতেন, কালীমূর্ত্তির এরূপ ভীষণতা, গণেশের হস্তিতুণ্ড প্রভৃতির অস্বাভাবিকত্ব কল্পনা করিবার হিন্দুধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি, তাহা হইলে বোধ হয় উত্তরটা ঠিক হইত। আমরা যদি ক্রুসকাষ্ঠকে বীভৎস-দর্শন বলি, তাহা হইলে কোনও পাদরী বোধ হয় উত্তর দিবেন না, ক্রুসকাষ্ঠ ভাল কারিগরের হাতে পড়িলে তার ভীষণতা আর থাকিবে না; তিনি আমাকে ক্রুসকাষ্ঠ কল্পনা করিবার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবেন। যতক্ষণ না তাহা বুঝাইয়া দেন, ততক্ষণ আমি ক্রুসকে অর্থহীন কাষ্ঠখণ্ড বই আর কিছু মনে করিব না। সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্র যদি কালীমূর্ত্তির গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব হেষ্টি সাহেবকে বুঝাইয়া দিতেন, তাহা হইলে কাহারও কোনও কথা বলিবার থাকিত না। যাহা হউক, এ সকল বড় কথা আলোচনা করিবার আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই—শক্তিও নাই।

হেষ্টি সাহেব বা বানার্জ্জি সাহেবের পত্র সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার আবশ্যকতা দেখি না।'

বিবিধ।

—০—

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন, তাঁহার উপন্যাসনিচয়ের মধ্যে "কৃষ্ণকান্তের উইল" শ্রেষ্ঠ।

"বিষবৃক্ষে" নগেন্দ্রনাথের অট্টালিকার বর্ণনা পড়িলে মজিলপুরের দত্তবাবুদের অট্টালিকা মনে পড়ে। এই মজিলপুর পূর্ব্বে বারুইপুরের এলাকাভুক্ত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারুইপুরে ছিলেন, তখন তিনি দত্ত-বাবুদের অট্টালিকা বহুবার দর্শন করিয়াছিলেন। বারুইপুর ত্যাগ করিবার কিছু পরে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ লিখিতে আরম্ভ করেন।

গৃহ-বিগ্রহ রাধাবল্লভজীউর রথযাত্রা প্রতিবৎসর মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। পূজনীয় যাদবচন্দ্র তখন জীবিত। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ সালে রথযাত্রার সময় ছুটী লইয়া গৃহে বসিয়াছিলেন। রথে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই ভিড়ে একটি ছোট মেয়ে হারাইয়া যায়। তাহার আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধানার্থ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার দুই মাস পরে "রাধারাণী" লিখিত হয়। আমার মনে হয়, এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "রাধারাণী" রচনা করিয়াছিলেন।

"দুর্গেশনন্দিনী"র আয়েষা-চরিত্র লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। কেহ বলেন, আয়েষা-চরিত্র, স্কটের "আইভ্যানহো"র অন্তর্গত রেবেকা-চরিত্রের অনুকরণমাত্র। এ কথা বঙ্কিমচন্দ্রের কাণেও উঠিয়াছিল। শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আই-ভ্যানহো" পড়িবার আগে আমি 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখি-য়াছিলাম।" তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও

কারণ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন, বুঝিতেন, "দুর্গেশ-নন্দিনী" একখানি তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসমাত্র; তাহা রচনা করিয়া তাঁহার গৌরব কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হয় নাই।

তা' ছাড়া যিনি মনে করিবেন, বঙ্কিমচন্দ্র অসত্য বলিতে সমর্থ, তিনি যেন এ অসত্যবাদীর জীবনী পাঠ না করেন। আমার মনে যদি তিলার্দ্ধ বিশ্বাস থাকিত, বঙ্কিমচন্দ্র অসত্য কথা বলিতে বা কোন রূপ অসৎ কার্য্য করিতে সমর্থ, তাহা হইলে তাঁহার জীবনী লিখিতে আমি অগ্রসর হইতাম না,—সে জীবনীও জগতের কোনও উপকারে আসে না।

আর বঙ্কিমচন্দ্র যদি 'আইভ্যানহো' হইতে দুর্গেশ-নন্দিনীর plot লইয়া থাকেন, তাহা হইলেও বিশেষ কি অপরাধ করিয়াছেন? সেক্ষপিয়র বা শ্রীহর্ষ এরূপ চুরি করেন নাই কি ? জিরাল্ডি 'সিন্থিওর উপন্যাস হইতে কি 'ওথেলো'র plot লওয়া হয় নাই ? হলিন-সেডের গল্প হইতে কি 'ম্যাক্‌বেথে'র আখ্যানাংশ গৃহীত হয় নাই? না, প্লুটার্ক হইতে 'কোরিওলেনাস্' উৎপন্ন হয় নাই?

ইংলণ্ডে একটি ক্লব ছিল—সম্ভবতঃ এখনও আছে। সেই ক্লবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে যাঁহারা সিভিল সার্‌ভিস্ পরীক্ষার্থী, তাঁহারাই শুধু যোগদান করিতেন। সেই সভায় ভিন্নজাতীয় সভ্যেরা আপন আপন দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্য বা সাহিত্য, ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া অপরাপর সভ্যদের শুনাইতেন। মিষ্টার জে, এন, গুপ্ত যখন শিক্ষার্থী হইয়া ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি এই ক্লবের অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থনিচয় মুখে মুখে অনুবাদ করিয়া অন্যান্য শ্রোতাদের শুনাইতেন। তচ্ছ্রবণে য়ুরোপীয় শ্রোতারা সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থনিচয়ের অনুবাদ প্রকাশের জন্য মিষ্টার জে, এন, গুপ্তকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য গুপ্ত সাহেবকে চেষ্টান্বিত হইতে হইয়াছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমতি-প্রাপ্তির আশায় শ্রীযুত সুরেশ সমাজপতিকে বিলাত হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুরেশ বাবুর বক্তব্য আদ্যন্ত শুনিয়া তাঁহাকে একখানি বাঁধান পুস্তক

দেখাইয়াছিলেন। পুস্তকখানি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকৃত "দেবীচৌধুরাণী"র ইংরাজি অনুবাদ। কিন্তু ছাপান হয় নাই। পুস্তকখানি দেখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "আমি এ অনুবাদ নিজে করিয়াছি, কিন্তু ছাপাই নাই; কেন, তা' জান? আমার মনে হয়, ইংরেজেরা বহুবিবাহ পছন্দ করিবে না—তাহারা হয় ত এ দৃষ্টান্ত দেখিয়া বাঙ্গালীকে ঘৃণা করিবে।" বলা বাহুল্য, বঙ্কিম-চন্দ্র দেবী চৌধুরাণীর বা অন্যান্য পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশ করিতে অনুমতি প্রদান করেন নাই; তিনি নিজেও কোন অনুবাদ ছাপান নাই।

'বঙ্গলক্ষ্মী'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি সাপ্তাহিক পত্র ছিল। পত্রখানির নাম—"প্রকৃতি"। অনুকূল বাবু ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। স্বর্গীয় গোবিন্দ-চন্দ্র দাস উক্ত পত্রে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি ভাওয়ালের রাজা ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে আক্রমণ করিয়া লিখিত হইয়াছিল। কবিতা

পড়িয়াই ত কালীপ্রসন্ন বাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্টে মকদ্দমা রুজু করিয়া দিলেন। স্থানীয় যাবতীয় উকীল মোক্তার ঘোষ মহাশয়ের পক্ষে নিযুক্ত হইল। খরচ সম্ভবতঃ রাজার। দরিদ্র, সাহিত্যসেবী অনুকূল বাবু মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি ভীত হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের শরণাগত হইলেন। সেন মহাশয় মকদ্দমা মিটাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

অবশেষে অনুকূল বাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরিলেন। উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বে কোনও পরিচয় ছিল না। পরিচয়ের প্রয়োজনও দেখি না। যে সাহিত্যিক, সাহিত্যচর্চ্চায় যাহার আনন্দ, সে বঙ্কিমচন্দ্রের পরমাত্মীয়। বিশেষতঃ যে যুবক ক্ষীণ যষ্টি-সাহায্যে সাহিত্য-সৌধের সোপানাবলী অতিক্রম করিবার প্রয়াস পাইতেছে, সে, বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয় হইতেও প্রিয়। অনুকূল বাবুর বিপদের কথা শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কালীপ্রসন্ন বাবুকে পত্র লিখিলেন। লিখি-

লেন, অনুকূল সাহিত্য-সেবা করিতে গিয়া আজ বিপদ্‌গ্রস্ত। তাহার বিরুদ্ধে যে মকদ্দমা স্থাপন করিয়াছ, তাহা উঠাইয়া লইবে। যদি লও, তাহা হইলে এ অনুগ্রহ আমার প্রতিই করা হইল, জানিবে।

কালীপ্রসন্ন বাবু, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধ ঠেলিতে পারিলেন না,—অবিলম্বে মকদ্দমা উঠাইয়া লইলেন। অনুকূল বাবু স্বীয় পত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

আকবর সম্বন্ধীয় একটা প্রবন্ধের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। প্রবন্ধটি কোথায় পঠিত হইয়াছিল, এবং সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কি বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানিয়া উঠিতে পারি নাই। অবশেষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে বোলপুরে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বহুকাল হইল জেনেরাল এসেম্ব্রির হল-ঘরে 'ভারতবাসী ও ইংরাজ' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সেই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি

ছিলেন। প্রবন্ধে আকবরের কিছু প্রশংসা ছিল, তদুত্তরে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন—আকবরের মত কোনো মোগল বাদসাই হিন্দুর অনিষ্ট করে নাই। তিনি বন্ধুত্বর ছলেই হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর শত্রুতা সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই উক্তি কোনো ছাপার কাগজে বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই।"

একদা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার তাৎকালিক অবস্থা লইয়া কিছু বাদানুবাদ হয়। গুরুদাস বাবু নাকি বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষা এতটা সরল করিলে চলিবে না—তাহার গাম্ভীর্য্য-রক্ষা আবশ্যক।" বঙ্কিমচন্দ্র সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিয়াছিলেন। তার কিছু পরে উভয়ে গাড়ী করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। কলিকাতার পথ—দুই পাশে অসংখ্য দোকান। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা দেখাইয়া গুরুদাস বাবুকে বলিলেন, "দুই পার্শ্বে 'বিপণিশ্রেণী—"

গুরুদাস বাবু একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিলেন। দেখিলেন, তাঁহার অধরে হাস্য-রেখা। তখন গুরুদাস বাবু ব্যাপারটা কি বুঝিলেন। বুঝিলেন, তিনি যে বাঙ্গালা ভাষার গুরুত্ব-রক্ষার কথা তুলিয়াছিলেন, এতক্ষণে সে কথার উত্তর প্রদত্ত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের তিন কন্যা; পুত্র হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যু হইয়াছিল। এক্ষণে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারীই শুধু জীবিত আছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের একটি জ্যেষ্ঠতাত-ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম, রাখালচন্দ্র। রাখাল কাকা জিরেট বলাগড়ে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তথায় একব্যক্তি তাঁহার কুটুম্ব ছিলেন। কুটুম্বের নাম—দ্বারিকাদাস চক্রবর্ত্তী। তিনি প্রায়ই কাঁটালপাড়ায় আসিতেন। সেই সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সহিত

তাঁহার একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীতে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় তিনি নৌকা করিয়া হুগলীতে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন। দ্বারিকাদাস একদা আসিয়া বলিলেন, "বঙ্কিমবাবু, আজ আপনার নৌকায় আমি হুগলী যাইব।" বঙ্কিমচন্দ্র সাহ্লাদে বলিলেন, "বেশ।" উভয়ে নৌকায় উঠিলেন। তাঁহারা দুই জন ছাড়া নৌকায় আর কোনও ভদ্র আরোহী নাই। নৌকা যখন মধ্যপথে, তখন দ্বারিকাদাস একটি মকদ্দমার গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। মকদ্দমাটি— ফৌজদারী; ঘটনাস্থল—জিরেট; তাঁহার কোনও বন্ধু বা নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি মকদ্দমায় লিপ্ত। গল্পটি শেষ করিয়া দ্বারিকাদাস বলিলেন, "বঙ্কিমবাবু, আপনার হাতে মকদ্দমা—আসামীকে কিছু শাস্তি দিতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া মাঝিদের আদেশ করিলেন, "নৌকা ভিড়াও!" নিকটে চর ছিল, মাঝিরা অবিলম্বে নৌকা লাগাইল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন চীৎকার করিয়া আদেশ করিলেন, "লোকটাকে

নৌকা হতে ফেলে দে।” দ্বারিকাদাস নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। কিরূপে তিনি গৃহে ফিরিয়াছিলেন, তাহা অবগত নহি। কাঁটালপাড়ায় তিনি আর দর্শন দেন নাই বলিয়া শুনিয়াছি।

“নববিধান-প্রবর্ত্তক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে বঙ্কিম বাবু এক জন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি (Genius) মনে করিতেন। প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়নের সময় দু জনে এক শ্রেণীতে পড়িতেন। কলেজ ছাড়িয়া কেশবচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতা-শক্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রেই দেশবিখ্যাত হইয়া পড়েন। * * বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী যখন আলোকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত করে নাই—যখন তাঁহার যশঃসূর্য্যের অরুণোদয়ের লেশমাত্রও পরিদৃশ্যমান হয় নাই, সেই সময় কলিকাতার কোন স্থলে একদিন কেশব বাবুর সঙ্গে বঙ্কিম বাবুর সাক্ষাৎ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, “I wish to know how far you have outgone me.” *

---

* প্রদীপ, দ্বিতীয় ভাগ।

বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায় একটি বাটী ক্রয় করিয়া তথায় জীবনের শেষ কয়েক বৎসর বাস করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বাটীতে উঠিয়া আসেন। বাটীটি পটলডাঙ্গায় মেডিকেল কালেজের সম্মুখে অবস্থিত। ইহা এক্ষণে 'বঙ্কিম-আশ্রম' নাম সাধারণ্যে পরিচিত। বড়লাট লর্ড কর্জ্জনের শাসনকালে গভর্মেণ্ট হইতে একটি প্রস্তরফলক বঙ্কিম-আশ্রমের প্রাচীরে আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে,—এই স্থানে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বাস করিতেন। জন্ম-সন ১৮৩৬, মৃত্যু-সন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

একদা মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এক ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের নানাবিধ কুৎসা করিতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈষদ্ধাস্যের সহিত তাহার কথা শেষ পর্য্যন্ত শুনিলেন। শুনিয়া অবশেষে বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। যে ব্যক্তি সমস্ত দিন গবর্মেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দিবারাত্রি এই

সকল কার্য্যে লিপ্ত থাকে, সে বই লিখিতে সময় পায় কখন? তাহার কেতাবে আমার আলমারির একটা সেল্‌ফ ভরিয়া গিয়াছে।"

আমি ১২৯২ সালের কথা বলিতেছি। সে সময় বঙ্কিমচন্দ্র সান্‌কিভাঙ্গার বাটীতে থাকেন। প্রতি রবিবারে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকেরা আসিয়া বঙ্কিম-চন্দ্রের বৈঠকখানা অলঙ্কৃত করিতেন।—চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কৃষ্ণ-বিহারী সেন, মুরলীধর সেন, নীলকণ্ঠ মজুমদার ও দামোদর মুখোপাধ্যায়। সময় সময় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রভৃতি মহাশয়েরাও আসিতেন।

ইনষ্টিটিয়ুট-মন্দিরে ১৮৯৩ সালের ১০ই অক্টোবর অপরাহ্নে society for the higher training of

young menর একটি অধিবেশন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেই সভায় জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

ইহার পর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র আর একবার উক্ত সোসাইটীর একটি সভায় যোগদান করেন। সে সভায় তদানীন্তন ছোটলাট ইলিয়ট সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র আর কোনও প্রকাশ্য সভায় যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। তবে ইনষ্টিটিয়ুট-মন্দিরে ইহার পরেও দুইবার আসিয়াছিলেন। প্রথম বার, ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবারে—দ্বিতীয়বার, মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিবার সপ্তাহ খানেক পূর্ব্বে। সে দুইবার বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী বঙ্কিমচন্দ্রের

অতিশয় প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্র যতটা স্নেহ করিতেন, এ সংসারে বুঝি তিনি কাহাকেও এতটা স্নেহ করিতেন না। আমি দুইটি দিনের কথা তুলিয়া তাঁহার অপরিসীম স্নেহ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুই জন পাচক ছিল; কিন্তু তাহারা প্রভুর আহার্য্য থালীতে সাজাইয়া আনিয়া দিত না। সে ভার কন্যা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃসেবায় তৃপ্তি, পিতার সে সেবা-গ্রহণে তৃপ্তি। এক দিন রাত্রিতে কন্যা আহার্য্য আনিয়া, যথাস্থানে রক্ষা করিয়া পিতাকে ডাকিলেন, "বাবা, খাবার দিয়েছি— এস।" পিতা উত্তর দিলেন না। তিনি ঘরের ভিতর মুদ্রিতনয়নে চেয়ারে উপবিষ্ট, কন্যা বারাণ্ডায় থালার কাছে দণ্ডায়মান। পিতার উত্তর না পাইয়া কন্যা আবার ডাকিলেন, "বাবা, এস!" পিতা নিরুত্তর। কন্যা পুনরায় ডাকিলেন। অবশেষে খুড়ীমা উঠিয়া চেয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুমুলে নাকি?" বঙ্কিমচন্দ্র মৃদুকণ্ঠে তখন উত্তর করিলেন,

"চুপ্ কর, শরৎ ডাক্‌ছে—আমায় শুন্‌তে দাও।" একখানি উপন্যাস লিখিয়া যাহা বুঝান যায় না, একটি ক্ষুদ্র কথায় বঙ্কিমচন্দ্র তাহা ব্যক্ত করিলেন।

আর একদিন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র নিশাকালে শয়ন করিতে গিয়া দেখেন, তাঁহার শয়নকক্ষে কেন্নো বিচরণ করিতেছে। কেন্নো ও কেঁচোকে বঙ্কিমচন্দ্র অতিশয় ভয় করিতেন। কেন্নো দেখিয়া তিনি কিছুতেই আর সে ঘরে শয়ন করিতে চাহিলেন না। বলিলেন, "আমি নীচে বৈঠকখানায় গিয়া শুইব।" খুড়ীমা কত বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি ঘরে আর প্রবেশ করিলেন না—বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে পূজনীয়া ভগিনী শরৎকুমারী আসিয়া বলিলেন, "বাবা, ঘরে আর কেন্নো নেই; তুমি এস।" বঙ্কিমচন্দ্র তখন আর কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া নিঃসঙ্কোচে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বরতলায় খুব জাঁকজমকের সহিত প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষে মেলা বসিয়া থাকে।

এখন বসে কি না, জানি না, কিন্তু আগে বসিত। আমি চৌত্রিশ বৎসর আগেকার কথা বলিতেছি। তখন বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। এক বৎসর মেলা উপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। চুঁচুড়ার অপর পার হইতে অনেক লোক মেলা দেখিতে আসিয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় অনেক লোক উঠিয়াছে। তিলধারণের স্থান নাই, তবু মাঝি বোঝাই লইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে নিষেধ করিলেন—আইনের ভয় দেখাইলেন, মাঝি তবু শুনিল না,—মনের মত বোঝাই লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিছু দূর যাইতে না যাইতে নৌকাখানি উল্টাইয়া গেল। নৌকারোহীরা কেহ মরিয়াছিল বলিয়া শুনি নাই। ডাঙ্গা নিকটে ছিল,মাঝিরা নৌকা টানিয়া আনিয়া ডাঙ্গায় লাগাইল। বঙ্কিমচন্দ্র তদ্দণ্ডে মাঝিকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিলেন। পুলিস মোকদ্দমা রুজু করিল।

মাঝির নাম গোবিন্দ; লোকে সচরাচর গোবে বলিয়া ডাকিত। তাহার বাড়ী কাঁটালপাড়া ও

ভাটপাড়ার মধ্যস্থল—মালাপাড়ায়। তাহার স্ত্রী ও দুইটি কন্যা ছিল। পুত্র হয় নাই।

মাজিষ্ট্রেট বিচার করিয়া মাঝিকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন, এবং তাহার প্রতি তিন মাস কারাবাসের আদেশ প্রদান করিলেন। হতভাগ্যকে কারাবাহিরে আর আসিতে হইল না। তথায় তাহার মৃত্যু হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র সে সংবাদে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু যত দিন হতভাগ্য মাঝির বিধবা পত্নী বাঁচিয়াছিল, ততদিন তিনি তাহাকে মাসে মাসে বৃত্তি প্রদান করিয়া আসিয়াছেন।

সমাপ্ত।

বঙ্কিম-কাহিনী।
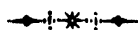
আমার মনে হয়, পিতৃলোকে সময় সময় বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই বিপ্লবের ফলে মহাপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা—যাঁহারা পৃথিবীতে একদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সমসময়ে পিতৃলোক ত্যাগ করিয়া পুনরায় ধরাধামে অবতীর্ণ হ'ন। এইরূপে পৃথিবীতে সময় সময় প্রতিভার স্রোত বহিয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই, এইরূপ একটা তরঙ্গ উঠিয়া একদিন উজ্জয়িনী-তট প্লাবিত করিয়াছিল। সেই তরঙ্গশিরে কালিদাস বররুচি, বেতাল-ভট্ট ঘটকর্পর, শঙ্কু বরাহমিহির প্রভৃতি ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া ভারতবর্ষ সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহারাই হয়ত ভাসিতে ভাসিতে যুগযুগান্তরের পর ইংলণ্ডের তটে উপনীত হইয়া রাজ্ঞী এলিজ্যাবথের রাজত্বকাল চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার পানে চাহিয়া দেখিলে

আমার মনে হয়, এইরূপ একটা তরঙ্গশিরে জয়দেব, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া পুণ্যময় বাঙ্গালার তটে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। তা'র পর ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইল। মহাপ্রেমিক, বিশ্ব-শিক্ষক, প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করিয়া কত সার্ব্বভৌম, কত রঘুনন্দন, কত রঘুনাথ মুকুলিত হইল।

তার পর কিছু কাল ধরিয়া অনন্ত জলধিগর্ভে আর তেমন তরঙ্গ উঠিল না; আমরা উৎসুক নয়নে চাহিয়া রহিলাম—শুধু একটা চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হইল। কিন্তু সে পৃথিবী-পরিপ্লাবী তরঙ্গ দেখিলাম না। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। তারপর সহসা একদিন সিন্ধুবক্ষ আলোড়িত হইয়া উঠিল—বিদীর্ণ জলধিবক্ষে প্রতিভার তরঙ্গ ছুটিল। দেখিলাম—রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায়, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায় প্রভৃতি বাঙ্গালার বক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছেন।

তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত রত্নরাজি বেলাভূমি হইতে কুড়াইয়া গৃহে আনিতে না আনিতে গুরুগম্ভীর অম্বর-বিদারী

গর্জ্জন পশ্চাতে শুনিলাম। ফিরিয়া দেখিলাম, পৃথিবী ও আকাশের সঙ্গমস্থল হইতে উত্থিত হইয়া এক মহাকায় তরঙ্গ বাঙ্গালার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আশাকুলিত হৃদয়ে বেলা-ভূমি অভিমুখে আবার ছুটিলাম। দেখিলাম, উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গশিরে সিংহাসন পাতিয়া ঈশ্বর গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, ভূদেবচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, দীনবন্ধু, গোবিন্দরায়, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কেহ কাঁচড়াপাড়ায়, কেহ বীরসিংহ গ্রামে, কেহ কাঁটালপাড়ায়, কেহ সাগরদাঁড়ি গ্রামে, কেহ গুলিটায়, কেহ কলিকাতায়, কেহ চৌবেড়িয়ায়, কেহ নয়াপাড়ায় সুবিধা ও সুযোগ মত অবতীর্ণ হইলেন। কাহার ললাটে প্রভাকর, কাহারও নয়নে অশ্রুধারা, কাহারও হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতি ও কৃষ্ণভক্তি, কাহারও বদনে বৈজয়ন্ত-প্রতিঘাতী ভেরীনিনাদ, কাহারও মানসপটে দশমহাবিদ্যার অতুলনীয় রূপ, কাহারও হস্তে "বিশ্বনাথ ট্রাষ্টফণ্ড"-অঙ্কিত পতাকা, কাহারও আলিঙ্গন-বদ্ধ বাহুপাশে "সমাজ," কাহারও উদ্যত-

হস্তে নীলকর-হত্যাকারী দণ্ড, কাহারও কণ্ঠে যমুনার কুলু কুলু ধ্বনি, কাহারও হস্তে রৈবতক-কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য শঙ্খ।

বাঙ্গালার এই পরিপ্লাবন—এই প্রতিভা-তরঙ্গের গর্জ্জন, পৃথিবীর পশ্চিম তটেও প্রতিঘাত হইয়াছিল। শক্তি-উপাসক মহা-বৈষ্ণবের বন্দেমাতরম্ ধ্বনি, কোটি কণ্ঠে বাহিত হইয়া সুদূর নীলাম্বুরাশি উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু—কিন্তু যাঁহাদের তুর্য্যনিনাদ সমগ্র বাঙ্গালা, সমগ্র ভারতবর্ষ প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, আজ তাঁহাদের কয় জন আছেন?—আজ তাঁহাদের কয় জন অনাথ কাঙ্গালের অশ্রুমোচন করিতে, অজ্ঞকে কৃষ্ণভক্তি শিখাইতে, জীমূতমন্দ্রে নির্জ্জীব হৃদয় কাঁপাইতে এ জগতে অবস্থান করিতেছেন? তাঁহাদের সকলেই আমাদের ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। আর কি তাঁহারা ফিরিয়া আসিবেন না? আমরা ব্যাকুল নয়নে আকাশ পানে চাহিয়া আছি, আর কি প্রতিভার তরঙ্গ বাঙ্গালায় প্রবাহিত হইবে না?

আমরা আজ যাঁহার মৃত্যু-তিথি উপলক্ষে এখানে

সমবেত হইয়াছি, তাঁহার নাম সম্ভবত বাঙ্গালার সকলেই অবগত আছেন। মহাপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রের নাম শুধু বাঙ্গালায় কেন, সুদূর ইংলণ্ডেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আমার মহা গৌরবের বিষয় যে, এই মহাপুরুষ আমার খুল্লতাত। শুধু খুল্লতাত নয়, তিনি আমার পরমারাধ্য গুরু। আমার শিক্ষা, আমার অনুশীলন, আমার ধর্ম্ম, আমার চরিত্র, সকল বিষয়েই আমি তাঁহার নিকট ঋণী। ঋণী হইলেও আমি জয়ডঙ্কা ঘাড়ে লইয়া জগতময় তাঁহার অযথা প্রশংসা করিয়া বেড়াইব, এমন কোন কথা নাই। তাঁহার গুণ কীর্ত্তন আমার পক্ষে শোভা পায় না—করিবারও প্রয়োজন নাই। যিনি পর্ব্বত-শৃঙ্গোপরি দণ্ডায়মান, তাঁহাকে দেখাইবার জন্য ঘণ্টা নিনাদের আবশ্যকতা দেখি না। তাই বলিয়া দোষের কথা চাপিয়া যাওয়া উচিত হয় না। তাঁহার যথার্থ প্রতিমূর্ত্তি জগতের সম্মুখে ধরিতে হইলে দোষের কথারও উল্লেখ করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন, "যাঁহার জীবনী লেখা যায় তাঁহার দোষ গুণ উভয় কীর্ত্তন না করিলে জীবনী লেখার উদ্দেশ্য সফল

হয় না।" কিন্তু আমি জীবনী লিখিতেছি না—তাঁহার জীবনের কয়েকটা ঘটনা মাত্র উল্লেখ করিতেছি। পাছে কেহ এটাকে জীবনী মনে করেন, তাই শৃঙ্খলতা দূরে ফেলিয়া এখানকার একটা, সেখানকার একটা, শেষ জীবনের একটা, প্রথম জীবনের একটা ঘটনা যদৃচ্ছাক্রমে উল্লেখ করিব। আশা করি, এ অভিনব প্রথা কাহারও বিরক্তি উৎপাদন করিবে না।

এই সকল ঘটনা উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে আমার কিছু বক্তব্য আছে। পূজনীয় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল কথা ইতিপূর্ব্বে পুস্তক ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই আমার জ্ঞান মতে অলীক। শুধু আমার জ্ঞান মতে নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় হিতার্থী আত্মীয় স্বজনের জ্ঞান মতে অলীক। কেহ লিখিয়াছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র ১৯।২০ বৎসর বয়সে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন।" অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের একুশ বৎসর চারি মাস বয়সে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। কেহ বলিয়াছেন,—বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহার পুস্তক বিশেষের পাণ্ডুলিপি বক্তাকে শুনাইয়া মতামত

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কেহ লিখিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রাদ্ধতত্ত্ব লিখিয়া লেখককে দেখাইয়াছিলেন, এবং একখানি উপন্যাস বুড়া বয়সে লিখিবেন, তাহাও তাঁহাকে চুপি চুপি বলিয়াছিলেন। ইহা স্মরণ রাখিবেন, এই লেখক তখন বালক মাত্র। কোন শূদ্র লিখিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তামাকু সাজিয়া আনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়াছিলেন। এ সকল অশ্রদ্ধেয় কথার এতদিন আমি কোন প্রতিবাদ করি নাই—প্রতিবাদের উপযুক্ত বিবেচনা করি নাই। যতদিন না বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী প্রকাশিত হইবে, ততদিন তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ অনেক মিথ্যা, অনেক অলীক কথা রচিত হইবে। কিন্তু দেখিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী প্রকাশিত হইতে এখনও কিছু বিলম্ব। ১৩১৯ সালের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাঁহার গৌরব রক্ষার্থে—সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থে অলীক ও কাল্পনিক কথার প্রতিবাদ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

(১)

সকল কথা বলিবার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম সময়ের একটা ঘটনার উল্লেখ করিব। মহাপুরুষ ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে আমার পিতামহীকে সূতিকাগারে লইয়া যাওয়া হইল। দারুণ প্রসব বেদনায় যখন তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন সূতিকাগার প্রকম্পিত করিয়া সহসা শঙ্খধ্বনি হইল। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে ভাবিয়া অনেকে সূতিকাগারে ছুটিয়া আসিলেন। আমার পিতামহও আসিলেন। সকলে দেখিলেন, পুত্র তখনও ভূমিষ্ঠ হয় নাই। তবে এ শঙ্খধ্বনি কেন? কে শাঁক বাজাইল! অনুসন্ধানে জানিলেন, সূতিকাগারে বা নিকটবর্ত্তী কোন গৃহে শাঁক নাই। পিতামহ হর্ষ-কণ্টকিত দেহে আকাশ পানে চাহিয়া উদ্দেশে ভগবানকে প্রণাম করিলেন। তাহার ক্ষণকাল পরেই

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। সেই সন্তান প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্র।

---

(২)

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যজীবনের কয়েকটি গল্প মায়ের নিকট শুনিয়াছি। তাহার দুই একটির উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বঙ্কিমচন্দ্রের একাদশ বর্ষ বয়সে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বালিকার যখন নয় বৎসর বয়স, তখন তিনি অনবধান প্রযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের দুই একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি ছিঁড়িয়া পুতুলের শয্যা রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন দেখিলেন, তাঁহার শোণিত-তুল্য পাণ্ডুলিপি এই রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তখন তিনি সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার জামা কাপড় ছিঁড়িয়া পুতুলকে শোয়ালে না কেন?" সঙ্কুচিতা বালিকা উত্তর করিল, "আমি কাগজগুলা আটা দিয়ে জুড়ে দিচ্ছি।" বঙ্কিমচন্দ্র অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, "জোড়া

কাগজ লইয়া আমি গলায় গাঁথিব? তুমি কি মনে কর, আমি আর লিখিতে পারি না! আজই লিখিব।"

বঙ্কিমচন্দ্র নির্জ্জন কক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া লিখিতে বসিলেন। সে দিন রাত্রি এক প্রহরের পূর্ব্বে কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ পায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যখন দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহার হাতে কাগজের তাড়া। সেই তাড়া, অনুতপ্ত বালিকার অঙ্কে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ, লিখেছি কিনা।" জানি না, বঙ্কিমচন্দ্র সে দিন কি লিখিয়াছিলেন; হয়ত বা 'মানস' অথবা 'ললিতা'র সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

---

(৩)

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাইস্ বৎসরে পদার্পণ করেন তখন তিনি বিপত্নীক হ'ন। এই স্ত্রীর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি সাতিশয় সুন্দরী ছিলেন। আমার পিতা এই বালিকার অসামান্য রূপের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে গৃহে আনিয়াছিলেন; কিন্তু ফুটিবার আগেই

ফুল শুকাইয়া গেল।—তিনি ষোড়শ বৎসর বয়সে জ্বররোগে দেহত্যাগ করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন যশোহরে। সেখানে নির্জ্জনে বসিয়া অনেক কাঁদিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষকে তিনি অশ্রুজল দেখান নাই। বুঝি গর্ব্ব অন্তরায় হইত। যিনি বাল্যকালে লিখিয়াছিলেন,—

"—মনে করি কাঁদিব না রব অহঙ্কারে।
আপনি নয়ন তবু ঝরে ধারে ধারে॥
গোপনে কাঁদিবে প্রাণ সকলি আঁধার।
জীবন একই স্রোতে চলিবে আমার॥"

—তিনি যৌবনে বা প্রৌঢ়ে মানুষকে কখন নয়নাশ্রু দেখান নাই বলিয়া আমার মনে হয়।

মাসের পর মাস গড়াইয়া চলিল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার বিবাহিত করাইতে কেহ সমর্থ হইল না। আমার পিতা শ্যামাচরণ ও খুল্লতাত সঞ্জীবচন্দ্র অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে সম্মত করাইতে পারিলেন না; অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের মাতাপিতা তাঁহাকে ডাকিয়া বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের আদেশ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ন্যায় পিতা মাতাকে ভক্তি করিতে আমি বড় একটা কাহাকেও দেখি নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন পিতা মাতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বিবাহে সম্মত হইলেন, তখন চারিদিকে পাত্রী অনুসন্ধানের ঘটা পড়িয়া গেল। কয়েকজন ঘটক নিযুক্ত হইয়াছিল। সঞ্জীবচন্দ্র একটী সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান পাইয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে বড়ই নিরাশ হইতে হইয়াছিল। ক'নে সুন্দরী বটে, কিন্তু তাহার গর্ব্ব অত্যধিক। সঞ্জীব চন্দ্র যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মামার বাড়ী কোথায়?" তখন সে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিয়া ছিল, "কে জানে বাপু কোথায়! আমি সেখানে কখন যাই না।" সঞ্জীবচন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তার পর পাত্রী অনুসন্ধানের জন্য বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। একখানা বাসোপযোগী বড় বোট ভাড়া করা হইল। স্থির হইল, সঞ্জীবচন্দ্র ও দীনবন্ধু

মিত্র, নৌকা আরোহণে পাত্রী অনুসন্ধানার্থে দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবেন। জানি না, কি মনে করিয়া বঙ্কিম চন্দ্র তাঁহাদের সঙ্গী হইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। মহাসমাদরে তাঁহাকে বজরায় গ্রহণ করা হইল।

তারানাথ অথবা তারাচাঁদ নামধেয় হালিসহর নিবাসী জনৈক ভদ্রসন্তান, একটি পাত্রীর কথা লইয়া কাঁটালপাড়ায় কয়েক দিন যাতায়াত করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন কেহই তাঁহার কথায় কাণ দেন নাই। অবশেষে যখন সাহিত্য-রথিত্রয় পাত্রী অনুসন্ধানে মহাড়ম্বর সহকারে যাত্রা করিলেন, তখন তারানাথ, পূর্ব্বোক্ত পাত্রী দেখিবার জন্য তাঁহাদের হালিসহরে নামিতে অনুরোধ করিলেন। হালিসহর, কাঁটালপাড়া হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। হালিসহরের সন্নিকটে বাঁশবেড়িয়া। আমার মনে হইতেছে, এই বাঁশবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধু বাবুর শ্বশুরালয়। নৌকারোহীরা তারানাথের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া হালিসহর অতিক্রম করিয়া চলিলেন, এবং দীনবন্ধু বাবুর শ্বশুরালয়ে রাত্রিযাপন করিবার মানস করিলেন।

বাঁশবেড়িয়াতেও তারানাথ গিয়া উপস্থিত। এবং মেয়ে দেখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র সম্মত হইলেন; বলিলেন, "এত নিকটে যখন আসিয়াছি তখন দেখিয়া গেলে ক্ষতি কি? অন্ততঃ তারানাথের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব।"

তিন জনে মেয়ে দেখিতে আসিলেন। মেয়ে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পছন্দ হইল। মেয়ে কিন্তু রুগ্ন, শীর্ণকায়—রোগশয্যা হইতে সম্প্রতি উঠিয়াছেন। সঞ্জীব চন্দ্র মেয়ে পছন্দ করিলেন না। কিন্তু তাহাতে আসিয়া গেল না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহৎ, তাহা এই কন্যাতে বর্ত্তমান—আমি ইঁহাকে বিবাহ করিব।"

বঙ্কিমচন্দ্র সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন। বিপত্নীক হইবার আট মাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। সেই সর্ব্বসুলক্ষণা মেয়ে—সেই স্ত্রী—বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবা পত্নী আজও বর্ত্তমান।

(৪)

কেহ লিখিয়াছেন, "সে সময়কার যুবা বয়সের পান দোষ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক দোষের হস্ত হইতে বঙ্কিমচন্দ্র অব্যাহতি পান নাই। অবশ্য বয়সে এ দোষ শোধ্‌রাইয়াছিল।" এ কথা অতি অশ্রদ্ধেয়। পূজাবাড়ীর ঢাক ঢোলের মধ্যে কোথায় মশা মাছি ভন্ ভন্ করিল, তাহা শুনিবার প্রয়োজন নাই।

বঙ্কিম চন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে এতাবৎ কাল তাঁহার পান দোষ আলোচনা করিয়া যে সকল প্রবন্ধ, পুস্তকে ও সাময়িক পত্রে লিখিত হইয়াছে, সে সকল প্রবন্ধাদি পাঠ করিলে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র একজন বড় গোছের মদ্যপ ছিলেন; এবং মত্ত হইবার জন্য মদ্যপান করিতেন।

এই সকল অনুমান-সিদ্ধ লেখকের কথার উত্তর দেওয়া আমি প্রয়োজন-যোগ্য মনে করি না; কেন না উত্তর দিতে হইলে এমন অনেক কথা বলিতে হয়, যাহা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক ও অনেকের পক্ষে বিরক্তিকর।

এই সকল কল্পনা-কুশল লেখকদের প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে সেক্ষপিয়রের লিখিত কয়েক ছত্র আমার মনে পড়িয়া গেল। তিনি লিখিয়াছেন,—

"Who steals my purse, steals trash ;
'tis something, no thing
'Twas mine, 'tis his, and has been slave to
thousands ;
But he that filches from me my good name,
Robs me of that which not enriches him,
And makes me poor indeed.—"

মৃণালিনীতে এক স্থানে বক্তিয়ার খিলিজি বলিতেছেন, "আমার হস্তে কুঠার কি জন্য ছিল ?"

হেমচন্দ্র উত্তর করিতেছেন, "হস্তীকে পিপীলিকা-দংশনের ক্লেশানুভব করাইবার জন্য।"

আমার একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের কথা। তখন তিনি হুগলি কালেজে পড়িতেন। তাঁহাকে নৌকা করিয়া প্রত্যহ যাতায়াত করিতে হইত। তাঁহার নৌকাতে কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণ বাবু ও জনৈক দরিদ্র আত্মীয় যাতায়াত

করিতেন। আত্মীয়টি একটু বিকৃত-মস্তিষ্ক। একদিন স্কুলের ছুটির পর সকলে যখন নৌকায় উঠিতেছেন, তখন আকাশে সহসা নিবিড় মেঘ দেখা দিল। মেঘ দেখিয়া কোন কোন নৌকা খুলিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের মাঝি মহেশ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, নৌকা ছাড়িব কি?"

বঙ্কিমচন্দ্র আকাশপানে নেত্রপাত করিয়া বলিলেন, "ছাড়।"

আত্মীয়টি তখন সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল; বলিল, "না মহেশ, নৌকা ছেড় না—মেঘ উঠেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র সে কথার কোন উত্তর দিলেন না—উত্তরের যোগ্য বিবেচনা করিলেন না।

মহেশও কোন উত্তর না দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

---

(৫)

সকলেই অবগত আছেন, দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসখানি রচনা করিয়া তিনি স্থির করিতে পারিলেন না, গ্রন্থখানি প্রকাশের যোগ্য হইয়াছে কি না। পাণ্ডুলিপি পাঠ

করিয়া তিনি তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীব চন্দ্রকে আদ্যন্ত শুনাইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় পুস্তকখানি প্রকা-শের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিমর্ষ ও কাতর হইয়া পড়িলেন। তখনও তাঁহার আত্মনির্ভরতা জন্মে নাই—তখনও তিনি তাঁহার শক্তি বুঝিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিলেন।

দুই বৎসর কাটিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই বৎসর লেখনী ধারণ করিলেন না। যে লেখনী কিছুকাল পরে 'কপালকুণ্ডলা' প্রসব করিবে, সে লেখনী উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিল। জানি না কেন—দুই বৎসর পরে ভ্রাতৃদ্বয়ের ভুল ভাঙ্গিল।—সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম্মস্থল অভিমুখে ধাবিত হইলেন ; এবং দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া দ্বিতীয়বার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফল এই দাঁড়াইল,—সঞ্জীবচন্দ্র, দুর্গেশ-নন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কাঁটালপাড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; এবং মুদ্রাযন্ত্রের শরণ লইয়া অচিরে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ করিলেন।

প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু যশ হইল না। না হউক, গ্রন্থকার আপনাকে তখন কতকটা চিনিলেন। উপেক্ষিত লেখনী উঠাইয়া লইয়া তিনি কপালকুণ্ডলা লিখিলেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি পড়িয়া কাহাকেও শুনাইলেন না—অথবা দেখিতে দিলেন না। তখন তাঁহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই বিশ্বাস, এই আত্মনির্ভরতা তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। একবার ঘা খাইয়া তিনি পাণ্ডুলিপি কখন কাহাকেও আর দেখান নাই। কিন্তু আমি গোপনে তাহা দেখিতাম। আমার এক্ষণে ঠিক স্মরণ হয় না, বোধ হয় আমি এ জন্য তাঁহার নিকট তিরস্কৃত হইয়া থাকিব। যে জন্যই হউক, আমার মনে স্থির বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার পাণ্ডুলিপি অপর কেহ দেখে, এটা তিনি পছন্দ করিতেন না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমি একদা রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট অসত্য কথা বলিয়াছিলাম। রমেশ বাবু তখন মেদিনীপুরের কলেক্টার। লোয়াদার ডাক্ বাংলোতে বসিয়া তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার কাকা

এক্ষণে কি বই লিখিতেছেন?” কাকার মনোভাব স্মরণ করিয়া আমি বলিয়াছিলাম, “জানি না।” অথচ কিছু দিন পূর্ব্বে আমি তাঁহার খাতা দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

(৬)

কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে বাসনা করি। বঙ্কিমচন্দ্র যখন কাঁথির নিকট নাগোয়ার ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন একদিন নিশীথে তাঁহার বাটীর দ্বারে সবলে করাঘাত হইল। রাত্রি তখন প্রায় আড়াই প্রহর। গৃহের সকলে নিদ্রিত। পুনঃ পুনঃ করাঘাতে ভৃত্যেরা জাগরিত হইয়া দ্বার খুলিল। দেখিল, সম্মুখে একজন সন্ন্যাসী। ভৃত্যেরা ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি চান?” সন্ন্যাসী বলিলেন, “বাবুকে ডাক।” ভৃত্যেরা প্রথমে ইতস্ততঃ করিল, পরে পরামর্শ করিয়া বাবুকে উঠাইল। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, একজন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী নরকপাল হস্তে দণ্ডায়মান। তাঁহার আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা

পরিবেষ্টিত, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ললাটে অঙ্গার-রেখা, সর্ব্বাঙ্গে চিতাভস্ম। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন, এ ব্যক্তি কাপালিক। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি প্রয়োজন?" কাপালিক উত্তর করিল, "আমার সঙ্গে এস।"

বঙ্কিম। কোথায়?

কাপা। সমুদ্রতীরে—বালিয়াড়িতে।

বঙ্কিম। আমি যাব না।

কাপালিক দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল। এবং পর দিবস নিশীথে ঠিক সেই সময়ে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ করিল; এবং পূর্ব্বানুরূপ উত্তর পাইয়া প্রস্থান করিল। তৃতীয় দিবসও আসিয়াছিল। এইরূপে উপর্য্যুপরি তিন দিবস প্রত্যাখ্যাত হইয়া কাপালিক আর আসে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সে বালিয়াড়ি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনা কপালকুণ্ডলায় আছে। আমার মনে হয়, এই কাপালিক-দর্শনই কপালকুণ্ডলার ভিত্তি; তাই কথাটার উল্লেখ করিলাম।

(৭)

বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক লিখিবার প্রণালী এ স্থলে উল্লেখ করিলে বোধ হয় কেহ বিরক্ত হইবেন না। তাঁহার লিখিবার একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি খাতা বাঁধিয়া পুস্তকের আখ্যানাংশ স্থির করিয়া লইয়া লিখিতে বসিতেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদ পূর্ব্বাহ্নে নির্দ্দিষ্ট হইত—প্রত্যেক পরিচ্ছেদে কোন্ কোন্ ঘটনার সমাবেশ হইবে—কোন্ কোন্ নরনারী অবতীর্ণ হইবে, তাহাও একপ্রকার নিরূপিত হইত। অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম পুনঃ পুনঃ ঘটিত। এমন কি সময় সময় দুই এক পরিচ্ছেদ পরিত্যক্ত হইত, দুই এক পরিচ্ছেদ পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করিত। যে পরিচ্ছেদ কমলমণি ও কুন্দনন্দিনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সে পরিচ্ছেদে হয়ত দেখিলাম, হীরার আয়ি আসিয়া কেষ্টরস ও ইষ্টিরসের অবতারণা করিতেছে। যে পরিচ্ছেদে দলনী-বেগমের আসিবার কথা, সে পরিচ্ছেদে লরেন্স ফষ্টার আসিয়া দেখা দিল। এত কাটাকুটি করিতে, এত পরিবর্ত্তন করিতে,

সম্পূর্ণ লিখিত পরিচ্ছেদ একেবারে উঠাইয়া দিতে আমি আর কোন গ্রন্থকারকে দেখি নাই। আমি কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রন্থকারের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি। আমার শ্বশুর স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায়কে কখন এক ছত্র পরিবর্ত্তন করিতে দেখি নাই। রমেশ বাবু লেখা কমাইতেন না, বরং বাড়াইতেন। হেমবাবু খুব দ্রুত লিখিয়া যাইতেন, পরিশেষে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ত পরিবর্ত্তন করিতেন,—লিখিবার সময় করিতেন—পর দিন করিতেন—ছয় মাস, এক বৎসর পরেও করিতেন। যতক্ষণ না কথাটি তাঁহার পছন্দসই হইত—যতক্ষণ না ভাবটি তাঁহার মনঃপূত হইত, ততক্ষণ তিনি পরিবর্ত্তন করিতেন। একটা কথা বা একটা ভাব লইয়া এতটা সময় ব্যয় করিতে আমি অপর কাহাকেও দেখি নাই।

যতদিন তিনি গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে বিনিযুক্ত ছিলেন, ততদিন তাঁহার লিখিবার একটা সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। কলিকাতায় সানকিভাঙ্গার বাসায় অবস্থান

কালে দেখিয়াছি, তিনি রাত্রি আটটার পর লিখিতে আরম্ভ করিতেন; এবং রাত্রি দুইটা আড়াইটা পর্য্যন্ত লিখিতেন। তখন তাঁহার বাম পার্শ্বে একটা কাচের ফর্সিতে বিপুলোদর কলিকায় তামাকু সাজা থাকিত; এবং দক্ষিণ দিকে কিছু আহার্য্য থাকিত, প্রতাপ চাটুর্য্যের গলিতে আসিয়া এ কাচের ফর্সি সরিয়া দাঁড়াইল; এবং কৃষ্ণচরিত্র-লেখকের জন্য রূপার ফর্সি আসিল।

সরকারি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সকল সময়ে একটু একটু লিখিতেন—রাত্রি জাগিয়া লিখিবার অভ্যাস ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যায় যখনি সময় পাইতেন তখনি কিছু কিছু লিখিতেন। সময় কখন বৃথা নষ্ট করিতেন না।

লিখিবার সময় তাঁহাকে কখন বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় গম্ভীর, কখন বা তরলমতি বালকের ন্যায় চঞ্চল দেখিতাম। কখন হয়ত তিনি এক ছত্র লিখিয়া তখনি তাহা কাটিয়া দিতেন। আবার একটু ভাবিতেন—

লিখিবার পুনর্ব্বার উদ্যোগ করিতেন, পরমুহূর্ত্তেই হয়ত লেখনী পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন, এবং গৃহমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে থাকিতেন। কখন বাতায়ন সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া সুদূর সৌধচূড়া পানে চাহিয়া থাকিতেন—কখন বা কোন পুস্তক বা দ্রব্যাদির গাত্রে হস্ত বিমর্ষণ করিতেন। তখন যে তিনি বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া অন্তর্জগতেই নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন, এমন আমার মনে হয় না। লিখিবার সময় আমরা কেহ আসিয়া পড়িলে তিনি কখন বিরক্ত হইতেন না, এমন কি আলাপ করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। এমন দিন অনেক গিয়াছে, যে দিন বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও এক ছত্র লিখিতে পারিতেন না। যদি বা লিখিতেন, তাহাও আবার কাটিয়া দিতেন। আবার এমন অনেক দিন গিয়াছে, যে দিন তাঁহার লেখনী উচ্ছ্বসিত তরঙ্গিণীর ন্যায় দুই কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সে সময় তিনি বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেন।

(৮)

আমার বেশ স্মরণ আছে, সান্‌কিভাঙ্গার বাটীতে একদিন আমার ভগিনীপতি স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার রচনার মধ্যে আপনি কোন্ পুস্তক খানিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন ?"

তিনি বলিলেন, "তুমি বল দেখি ?"

কৃষ্ণধন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি বলিব না— লিখিয়া রাখিতেছি ; আমি জানিতে চাই, আপনার সহিত আমার মতের মিল হয় কি না ?"

কৃষ্ণধন বাবু লিখিয়া রাখিলেন ; বঙ্কিমচন্দ্র পরমুহূর্ত্তে একটুও চিন্তা না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কমলাকান্তের দপ্তর।"

কৃষ্ণধন বাবু কাগজ উল্টাইয়া দেখাইলেন ; তাহাতে লেখা রহিয়াছে—কমলাকান্তের দপ্তর।

(৯)

শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মভাব সাতিশয় উন্নত হইয়াছিল। কথাটা বুঝাইবার জন্য একটা ঘটনার অবতারণা করিতে হইল। মৃত্যুর তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একবার কঠিন পীড়া হয়। এই রোগের বৈচিত্র্য এই যে, জ্বর বা অন্য কোন উপসর্গ বর্ত্তমান ছিল না—দাঁত দিয়া শুধু রক্ত ছুটিত। একটু আধটু রক্ত নয়, তিন ছটাক রক্তও কোন কোন দিন পড়িয়াছে। আমার খুড়িমা মহা চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র কুণ্ডার আসিয়া ব্যবস্থা করিলেন। বিশেষ কোন ফল হইল না। খুড়িমা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন,—ডাক্তার চন্দ্রাকে ডাকিয়া আনিতে আমাকে বলিলেন। কাকাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যাইতে সাহস হইল না। তাঁহার আদেশ অপেক্ষায় দাঁড়াইলাম। তিনি খুড়িমার বিরস বদন প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন; পরে আমায় বলিলেন, "ডাকিয়া আন।" আমি ছুটিয়া মেডিকেল কলেজে গেলাম। তখন বেলা ৮।৯ টা হইবে। সাহেব

পড়াইতেছিলেন। একটু অপেক্ষা করিলাম। সত্বর সাক্ষাৎ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের নাম শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আসিলেন। উভয়ের মধ্যে একটু সখ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও শয্যা গ্রহণ করেন নাই; তিনি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন, চন্দ্রা সাহেবকে অভ্যর্থনা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। খুড়ি মা পাশের ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লইয়া রোগের পরিচয় দিতেছিলাম। চন্দ্রা সাহেব শুনিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যহ দীর্ঘকাল ধরিয়া গীতা পাঠ করেন। সকল কথা শুনিয়া ডাক্তার সাহেব আদেশ করিলেন, "গীতা পাঠ বন্ধ রাখিতে হইবে—কথাবার্ত্তাও কমাইতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একটু হাসিলেন। তেমন হাসি তাঁহার ওষ্ঠে আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। এ প্রতিভার হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি নয়, অহঙ্কারের হাসি নয়,—এ নির্ম্মল আনন্দের হাসি—স্থির বিশ্বাসের বিদ্যুৎস্ফুরণ।

এ দিকে চন্দ্রা সাহেব ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। দ্বারবান যথা সময়ে

ঔষধ লইয়া আসিল। ঔষধের শিশি বঙ্কিম চন্দ্রের সম্মুখে সংরক্ষিত হইল। তিনি শিশির ছিপি খুলিয়া সমস্ত ঔষধটুকু পিক্‌দানিতে ঢালিয়া ফেলিলেন, এবং সহাস্য মুখে উচ্চৈঃস্বরে গীতা পাঠ আরম্ভ করিলেন। খুড়িমার ধীর স্থির গম্ভীর হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি তখন কোন প্রতিবাদ না করিয়া নীরব রহিলেন। পরে অনেক প্রতিবাদ হইয়াছিল—অনেকে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তিনি এক দিনের জন্যও গীতা পাঠ বন্ধ করেন নাই। অবশেষে তিনি শয্যাগত হইলেন—দেখিতে দেখিতে সাতিশয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। দন্তমূল হইতে রক্ত অবিরাম নির্গত হইতে লাগিল। একদিন স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অনেক বুঝাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তর্ক না করিয়া শুধু হাসিয়াছিলেন। অধরে আবার সেই হাসি। সুহৃদ্‌বর ছাড়িলেন না; বলিলেন, "তুমি আত্মহত্যা করিতেছ?"

বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে?"

ডাক্তার সরকার। যে ঔষধ না খায়, সে আত্মঘাতক।

বঙ্কিম। কে বলিল আমি ঔষধ খাই না?

ডাক্তার। খাও? কই তোমার ঔষধ?

বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্গুলি হেলাইয়া গীতা দেখাইয়া দিলেন।

ডাক্তার সরকার উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা।"

বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

রোগ ক্রমে বাড়িয়া উঠিল—জীবনের আশাও কম হইয়া আসিল। অবশেষে শয্যায় শুইয়া গীতা পাঠ করিবার শক্তিও লোপ পাইল। একদিন নিশীথে—আমার বেশ স্মরণ আছে—মহাপুরুষের জীবন লইয়া যখন টানাটানি, শয্যার এক পার্শ্বে খুড়ি মা, অপর পার্শ্বে আমি উপবিষ্ট থাকিয়া রোগীর মুখ প্রতি ব্যাকুল নয়নে চাহিয়া আছি, তখন সহসা শুনিলাম, ভক্তিময় পুরুষ ঘুমঘোরে গীতা আবৃত্তি করিতেছেন। গীতার একটু আধটু অংশ নয়—প্রায় একটা সর্গ অতি ক্ষীণ কণ্ঠে থামিয়া থামিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন। তারপর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া

পড়িলেন। পরদিন হইতে তিনি সারিয়া উঠিতে লাগিলেন, এবং অচিরে আরোগ্য লাভ করিলেন।

(১০)

আমার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্রের নিকট নিম্নলিখিত ছুইটী গল্প শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে এক দিন তাঁহার কোন প্রিয় বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে পটলডাঙ্গার বাটীতে আসিয়াছিলেন। সাক্ষাৎটা বোধ হয় দীর্ঘকাল পরে ঘটিয়াছিল। বন্ধুবর আসিয়া "Good morning" করিলেন এবং Shake hand করিবার অভিপ্রায়ে হাত বাড়াইয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে উদ্যত হস্ত গ্রহণ করিলেন না; বলিলেন, "ভাই, সে দিন আর নাই।" সুহৃদ্ মহাশয় বলিলেন, "No! it seems times have changed"—বঙ্কিমচন্দ্র ঈষদ্ধাস্যের সহিত কহিলেন, "তুমি কায়স্থ, আমি ব্রাহ্মণ; তুমি প্রণাম করিবে, আমি আশীর্ব্বাদ করিব—আর Shake hand কেন?"

(১১)

দ্বিতীয় গল্পটী যৌবনের। সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা। জ্যোতিশ বাবু তখন পঠদ্দশায়। একদিন শিক্ষক তাঁহাকে জ্যামিতি পড়াইতে ছিলেন। সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শিক্ষকের গোল বাধিয়া গেল। সে পড়াইবে কি, নিজেই আত্মবিস্মৃত হইল। তখন বঙ্কিমচন্দ্র চটিজুতা খুলিয়া শয্যার উপর বসিলেন, এবং পড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্য শেষ করিয়া অচিরে উঠিলেন। জুতা পরিতে গিয়া দেখেন, নিকটে একটা বোল্‌তা মাটির উপর বসিয়া রহিয়াছে। তিনি দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া ক্ষুদ্র বোল্‌তাটিকে পদতলে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। একবার আঘাত করেন, পরমুহূর্ত্তে পা উঠাইয়া দেখেন। যখন দেখিলেন, তাহার প্রাণত দূরের কথা—মেদমজ্জার চিহ্ন মাত্রও বিলুপ্ত হইয়াছে, তখন তিনি তাহার মুখের বর্ণের উল্লেখ করিয়া কত কি বলিতে থাকেন। সে সকল কথার পুনরাবৃত্তি করিতে আমার ইচ্ছা নাই।

(১২)

আমার বাল্যকালে আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রমারা খেলায় নিরত থাকিতে দেখিয়াছি। চারি ভাই একত্র বসিয়া খেলিতেন। বাহিরের লোক বড় একটা সে খেলায় যোগ দিত না। বিশেষ যে দিন টাকা পয়সা লইয়া খেলিতেন, সে দিন মাথা কুটিলেও বাহিরের লোক খেলিবার কাত্ পাইত না। হারিলে টাকা ভাইয়ের থাকিবে। সুতরাং হারিলে বিশেষ কোন দুঃখ নাই। তাঁহারা বাহিরের লোককে টাকা লুঠিয়া লইয়া যাইতে দিতেন না—বাহিরের লোকের টাকা লুঠিতেও ইচ্ছা করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের খেলার একটু তাৎপর্য্য দেখিয়াছিলাম। তিনি প্রমারায় গিয়া তাস না সরিলে লম্বা ডাক ছাড়িতেন, আবার তেরেশ কাতুর বড় বড় দান্ হাতে করিয়া নীরব থাকিতেন। বুড়া বয়সে তাঁহাকে পাশা খেলিতে দেখিয়াছি; কিন্তু 'চৌষট' নয়—'রং'। একদিনের কথা উল্লেখ করিব। জামাতা শ্রীযুক্ত কপালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত একদিন তিনি 'রং' খেলিতে-

ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের একটা ঘুঁটি মরিয়া গিয়াছে, পোয়া না পড়িলে সে ঘুঁটি আর বসিবে না, অন্যান্য ঘুঁটির চালও বন্ধ থাকিবে। এ পোয়া কিছুতেই পড়িতেছে না। বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমে অধীর হইয়া উঠিলেন। এ সংসারে যে জিনিষটার জন্য আমরা ব্যগ্র হই, অধীর হই, সে জিনিষটা তত দূরে সরিয়া যায়। ক্রমে অধীরতার মাত্রা অতিক্রান্ত হইল। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র পাশা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া খেলা ভঙ্গ করিলেন। এ অধীরতা তাঁহার যৌবনে প্রমারা খেলিবার সময় দেখি নাই।

---

(১৩)

এক্ষণে বহরমপুরের কথা বলিব। বঙ্কিমচন্দ্র তথায় ১৮৬৯ সালের ২৯এ নভেম্বর বদ্‌লি হইয়া যান। প্রথমে তিনি কাহারও সহিত মিশিতেন না—লোকেও তাঁহার সহিত মিশিত না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবতই একটু দাম্ভিক। তাঁহার গর্ব্ব, তাঁহার তেজ দেখিয়া লোকে

সরিয়া দাঁড়াইত; তিনিও লোকের প্রীতি কুড়াইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেন না।

কিন্তু দুই এক বৎসর তথায় থাকিতে থাকিতে বঙ্কিমচন্দ্র সাতিশয় জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। সাধারণ মানুষের ভাগ্যে এতটা জনপ্রীতি সচরাচর জুটে না। বঙ্কিমচন্দ্র যখন ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি ছুটি লইয়া বহরমপুর হইতে বিদায় হইলেন, তখন জনসাধারণ সাতিশয় ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে থাকিতে অনেক অনুরোধ করিয়াছিল। শুনিয়াছি, প্রায় দেড় শত অনুরোধ পত্র তাঁহার নিকট আসিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি কিছুতেই থাকিতে পারিলেন না।

তখন তাঁহার বিনোদনার্থ অশ্রুতপূর্ব্ব বিদায়ভোজের আয়োজন হইতে লাগিল। স্থানীয় অধিবাসীরা প্রায় পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া সাতদিন ব্যাপী আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র জঠরে সাত দিনে পাঁচ হাজার টাকা প্রবিষ্ট হইতে পারে না, কিন্তু বাঙ্গালী যেমন কাঙ্গালী ভোজন

করাইয়া, বাজী পোড়াইয়া অর্থব্যয় করিতে পারে, এমনটা বুঝি আর কোন জাতি পারে না। সেই সমবেত দীন দুঃখী উদর পূরিয়া খাইয়া যখন "বঙ্কিম-চন্দ্রের জয়" রবে দিগ্‌দিগন্ত পরিপূরিত করিল, তখন কি বিধাতার আশীর্ব্বাদ আকাশ হইতে বর্ষিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের শিরোদেশে পড়ে নাই ?

শুধু যে দেশবাসীরা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহা নহে ; ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনর সকলেই তাঁহাকে বহরমপুরে রাখিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন ছুটির দরখাস্ত করিলেন, তখন মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "তোমায় আমি কোন মতে ছাড়িয়া দিতে পারি না।" বঙ্কিমচন্দ্র তখন কমিশনর সাহেবকে ধরিলেন ; বলিলেন, "সাহেব, আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, আমায় তিন মাসের ছুটি দাও।"

কমিশনর সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমায় আমি বা ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়িয়া দিতে পারি না। তবে তুমি যদি স্বীকৃত হও যে, ছুটির পর আবার

এখানে আসিবে, তাহা হইলে তোমায় ছাড়িয়া দিতে পারি।”

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, “এখানে আসিতে আর ইচ্ছা নাই। আপনি জানেন ত এখানকার জলবায়ু বড় খারাপ।” *

কমিশনর সাহেব উত্তর করিলেন, “তবে এক কাজ কর,—তুমি Casual leave (ছুটি) লও।”

বঙ্কিমচন্দ্র। Casual leave লইয়া কি হইবে? দুই চারি দিনের ছুটি পথেই ফুরাইয়া যাইবে।

কমিশনর। তুমি যতবার ইচ্ছা Casual leave প্রার্থনা কর, আমি কোন আপত্তি না করিয়া মঞ্জুর করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র, সাহেবের অনুগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; এবং যতদিন পারিয়াছিলেন ততদিন একদিনেরও ছুটি না লইয়া কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন আর পারিলেন না, তখন ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট

* তখন বহরমপুরের জলবায়ু বড় অস্বাস্থ্যকর ছিল।

লইয়া Medical leave র দরখাস্ত করিলেন। এ ছুটি না দিয়া কমিশনর থাকিতে পারেন না, তথাপি তিনি দরখাস্ত চাপিয়া রাখিলেন। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র, ড্যাম্পিয়ার সাহেবকে পত্র লিখিলেন। ড্যাম্পিয়ার তখন ছোটলাটের আফিসে সেক্রেটারি। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের গুণানুগত বন্ধু। ড্যাম্পিয়ার অবিলম্বে বঙ্কিমচন্দ্রকে ছুটি দিয়া মুক্তি প্রদান করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে অবস্থান কালে বেশ সুখে ছিলেন। ধন জন মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সকলই তাঁহার ছিল। এখানে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার তিন খানি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং যশও যথেষ্ট হইয়াছিল। বহরমপুরে বদলি হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র ছয় মাসের ছুটি লইয়া একবার দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। বারাণসী-ধামে গিয়া প্রায় দেড়মাস বাস করেন। সেখানে কোন কাজ ছিল না, শুধু মৃণালিনীর প্রুফ দেখিতেন।

মৃণালিনী প্রকাশিত হইবার পর বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে আসেন। সেখানে দীর্ঘকাল ছিলেন। এই দীর্ঘ

কালের মধ্যে দুইটি ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছু মনঃপীড়া দিয়াছিল। আমি দুইটি ঘটনারই এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি।

(১৪)

বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুরে অবস্থানকালে নফরবাবু তথায় মুন্সেফ ছিলেন। নফর বাবু আজও জীবিত আছেন কিনা জানি না। তাঁহার পূরা নাম—নফরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। এই নফর বাবুর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বেশ একটু প্রণয় হইয়াছিল। একদা স্থানীয় কোন বিশিষ্ট ভদ্র লোকের বাড়ীতে নফর বাবু ও বঙ্কিমচন্দ্রের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। উভয়ে যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, সহরের অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন।

সভাতে বসিয়া নফর বাবু একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন; সেটা ডারউইনের থিয়রি। অন্য লোকে কেহ কিছু বলিল না দেখিয়া নফর বাবু এই থিয়রি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। যাঁহারা

ডারউইন পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিলেন, নফর বাবু, ডারউইন কোন কালে পড়েন নাই। কিন্তু নফর বাবুর বক্তৃতার বিরাম নাই। তিনি ক্রমেই পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি নফর বাবুকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। নফর বাবু তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "যাহা জান না, পড় নাই, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিও না।"

নফর বাবু নীরব হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ডারউইনের থিয়রি, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শক্তিশালী ভাষায় সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে বুঝাইতে লাগিলেন। নফর বাবু সে দিন আর একটীও কথা কহেন নাই,—নীরবে আহারাদি সমাপন করিয়া একাকী প্রস্থান করিয়াছিলেন।

কিছু দিন পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করিয়া 'সোমপ্রকাশে' এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র সন্দেহ করিলেন, বহরমপুর হইতে কোন ব্যক্তি

এই প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলেন, নফর বাবুরই কাজ। একদিন তিনি নির্জ্জনে নফর বাবুকে ধরিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "নফর বাবু, তুমি কি সোমপ্রকাশে প্রবন্ধ লিখিয়াছ?"

নফর বাবু একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া তদ্দণ্ডে অপরাধ স্বীকার করিলেন; এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিগলিত চিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তদবধি তাঁহাদের প্রণয় অক্ষুণ্ণ ছিল।

---

(১৫)

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এবার একজন সাহেবের বিবাদ বাধিল। সাহেব যে সে লোক নয়,—তাঁহার নাম Colonel Duffin (কর্ণেল ডফিন)। বহরমপুরে তখন সেনানিবাস ছিল;—অনেকগুলি গোরা তথায় থাকিত, কর্ণেল সাহেব তাহাদের সেনানায়ক অর্থাৎ commanding officer ছিলেন। এই প্রবল

প্রতাপান্বিত সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুতর ঝগড়া বাধিল।

ঝগড়া গুরুতর হইলেও কারণটী তত গুরু নয়। একটা সরু পথ গোরানিবাস ব্যারাকের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের উপর দিয়া গিয়াছিল। এই পথের উপর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কাছারী যাতায়াত করিতেন,—কখন পদব্রজে, কখন বা শিবিকারোহণে। অন্যান্য লোকও এই পথ দিয়া চলিত। আরও একটা পথ ছিল, কিন্তু সেটা অনেকটা ঘুরিয়া গিয়াছে। তাই ব্যারাকের পথ ধরিয়া সকলে চলিত। কিন্তু গোরাদের তাহাতে আপত্তি।

এক দিন অপরাহ্ণে বঙ্কিমচন্দ্র শিবিকারোহণে কাছারী হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। বাহকেরা এই পথ ধরিয়াছিল। পাল্কীর এক দিকের দ্বার বন্ধ ছিল। পাল্কী যখন মধ্যপথে, তখন পাল্কীর বদ্ধ দ্বারের উপর সজোরে করাঘাত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র শিবিকার দ্বার ক্ষিপ্রহস্তে খুলিয়া ফেলিয়া লম্ফত্যাগে পাল্কী হইতে ভূতলে পড়িলেন। দেখিলেন, সম্মুখে একজন সাহেব। একটু দূরে কয়েকজন সাহেব

ক্রিকেট খেলিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন, নিকটের সাহেবই পাল্কীর দ্বারে আঘাত করিয়াছে। এই সাহেব, কর্ণেল ডফিন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে চিনিতেন কিনা জানি না। কিন্তু তিনি পাল্কী হইতে নামিয়া মহারোষে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "Who the Devil you are?"

সাহেব উত্তর না দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরিয়া সবলে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ক্রীড়াভূমির দিকে অগ্রসর হইলেন; এবং ক্রীড়ারত সাহেবদের সমীপস্থ হইলেন। দুই তিন জন সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচিত ছিলেন। তন্মধ্যে জজ বেন্‌ব্রিজ একজন। বেন্‌ব্রিজ সাহেবকে বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "Have you seen how I have been dealt with by that person?"

বেনব্রিজ সাহেব উত্তর করিলেন, "O Babu, I am short sighted—I have not seen any thing."

তিনি সত্য সত্যই চক্ষে কম দেখিতেন। ভগবান্

জানেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াছিলেন কিনা। কিন্তু তিনি ও কর্ণেল ডফিন পরে বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহারা চিনিতে পারেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র, জজ বেন্‌ব্রিজ সাহেবের নিকট হইতে ফিরিয়া অন্যান্য সাহেবদের সমীপস্থ হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কিছু দেখিয়াছেন?"

তাঁহারা বলিলেন, "না।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "উত্তম, আদালতে এই কথা বলিবেন।"

বলিয়া তিনি রোষে ক্ষোভে জ্বলিতে জ্বলিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরদিন বঙ্কিমচন্দ্র কর্ণেলের নামে ফৌজদারীতে নালিশ করিলেন। বিচারক, মাজিষ্ট্রেট সাহেব। তিনি ন্যায়বান্, বঙ্কিমচন্দ্রের গুন-পক্ষপাতী। কর্ণেলের উপর সমন জারী হইল।

নগরের লোক, কর্ণেলের বিরুদ্ধে এত উত্তেজিত হইয়াছিল যে, সাহেবকে গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া

লুকাইয়া আসিতে হইয়াছিল। তবু সাহেব ঢিল খাইয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।

সাহেব আসিয়া কাটগড়ায় দাঁড়াইলেন। বিচার দেখিতে নগর ভাঙ্গিয়া লোক আসিতে লাগিল। বাঙ্গালী, সাহেবের নামে নালিশ করিয়াছে; তা' আবার যে সে সাহেব নয়,—একটা সেনাদলের কর্ত্তা, গোটা কর্ণেল। তখনকার দিনে এ দৃশ্য নূতন। সুতরাং বিস্মিত, স্তম্ভিত অধিবাসীরা অশ্রুতপূর্ব্ব মকদ্দমার বিচার দেখিতে আদালত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন। কেহ ডিপুটী বঙ্কিমকে, কেহ কর্ণেল সাহেবকে, কেহ বা বিচারককে দেখিতে আসিল; কেহ বা সকলে আসিতেছে দেখিয়া আসিল। উকীল, মোক্তার, কর্ম্মচারী নিজ নিজ কাজ ফেলিয়া মকদ্দমা দেখিতে আসিল। এইরূপে আদালত প্রাঙ্গণ জনতায় পরিপূর্ণ হইল।

এই মকদ্দমার একটু বিশেষত্ব ছিল। বহরমপুরে সে সময় প্রায় দেড় শত উকীল মোক্তার ছিলেন। এই দেড়শত উকীল মোক্তার উপযাচক হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের

ওকালত নামায় দস্তখত করিলেন। তদ্ধেতু কর্ণেল সাহেব বড় বিপাকে পড়িলেন, তিনি যে উকীলের কাছে যান সেই উকীলই বলেন, "আমি বঙ্কিম বাবুর ওকালতনামা গ্রহণ করিয়াছি।" অবশেষে তিনি উকীল ছাড়িয়া মোক্তারের দ্বারস্থ হইলেন। সেখানেও তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল। কোন মোক্তার বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সম্মত হইলেন না।

তখন কর্ণেল সাহেব মহাভীত হইয়া পড়িলেন। গভর্ণমেণ্টেরও চমক ভাঙ্গিল। কমিশনার সাহেব ছুটিয়া আসিলেন। সাহেব মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সে সময় বহরমপুরে অনেক সাহেব বাস করিতেন। কমিশনার মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বয়ং কোন অনুরোধ করিলেন না। তিনি ও অন্যান্য সাহেবেরা বেন্‌ব্রিজ সাহেবকে ধরিলেন।

বেন্‌ব্রিজ সাহেবের নাম কেহ কেহ শুনিয়া থাকিবেন। তিনি একজন ভাল জজ ছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় বেন্‌ব্রিজ সাহেব বহরমপুরে অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। তিনি বঙ্কিম

চন্দ্রের গুণ-মুগ্ধ পুরাতন বন্ধু। সাহেবেরা তাঁহাকে ধরিলে তিনি বলিলেন, "কর্ণেল ডফিন, বঙ্কিম বাবুকে অপমান করিয়াছেন। যদি তিনি বঙ্কিম বাবুর নিকট ক্ষমা চাহিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমি মধ্যস্থতা গ্রহণ করিতে পারি।"

ডফিন তদ্দণ্ডে স্বীকার পাইলেন। বেন্‌ব্রিজ সাহেব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া মকদ্দমা মিটাইয়া দিলেন। কর্ণেল সাহেব প্রকাশ্য আদালতে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "বঙ্কিম বাবু, তোমার যে হাত ধরিয়া তোমায় বলপূর্ব্বক ফিরাইয়া দিয়াছিলাম, তোমার সেই হাত ধরিয়া আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

বঙ্কিমচন্দ্র মকদ্দমা তুলিয়া লইলেন।

---

(১৬)

বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ ভাবে উপদেশ দিতেন, তাহার একটু পরিচয় দিব।

আমাদের বংশের কেহ বাহিরের লোকের কাছে

মন্ত্রগ্রহণ করেন না; বংশের মধ্যে কোন বয়োজ্যেষ্ঠ উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ প্রথা বহুকাল হইতে আমাদের বংশে চলিয়া আসিতেছে। তদনুসারে আমার কোন খুল্লতাত-ভ্রাতা, বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রপ্রদান করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নব দীক্ষিত শিষ্যকে একটী মাত্র উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি নিয়ত স্মরণ রাখিবেঁ, তুমি ব্রাহ্মণ।"

কথাটি বড় ছোট নয়। এত অল্প কথায় এত বড় উপদেশ হইতে পারে, আমি পূর্ব্বে তা' জানিতাম না।

(১৭)

বঙ্কিমচন্দ্র সাতিশয় ক্রোধী ছিলেন। একবার তিনি বায়ু পরিবর্ত্তন-উদ্দেশে কিছু দিনের জন্য চন্দন-নগরে বাস করেন। বাড়ীটী অতি সুন্দর—দ্বিতল—গঙ্গার উপর। তিনি কিছুদিন তথায় একাকী থাকিয়া আমায় পত্র লিখেন, "তোমার খুড়িকে লইয়া এখানে

চলিয়া আসিবে।" আমি খুড়িমাকে লইয়া এক দিন প্রাতঃকালে চন্দননগরে আসিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র প্রীত হইলেন; তাঁহার মন তখন প্রফুল্ল—নয়ন স্নেহোৎফুল্ল, ওষ্ঠ হাস্যবিকম্পিত। আমায় বলিলেন, "তোমার খুড়িকে বাগান দেখাইয়া লইয়া এস—আমি স্নান করিয়া লই।"

স্নানাগার দ্বিতলে।

আমি খুড়িমাকে লইয়া বাগানে বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম। আমরা যখন ফিরিয়া বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, তখন সহসা এক চীৎকারশব্দ আমরা শুনিতে পাইলাম। চীৎকারের উপর চীৎকার; আমি ভীত, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। খুড়িমাও দাঁড়াইলেন। আমরা উভয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠস্বর চিনিলাম; উভয়েই বুঝিলাম, তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়াছে। আমি বেতসপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলাম। কাঁপিবার কোন হেতু ছিল না। তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থাতেও মানুষ বা কোন জীবকে প্রহার করিতেন না—নিরপরাধকে ভর্ৎসনা করিতেন না। তবু আমি

তাঁহাকে অত্যধিক ভয় করিতাম। শুধু আমি নই, বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয়স্বজনেরা সকলেই তাঁহাকে ভয় করিতেন। সেই পুরুষসিংহের সম্মুখে দাঁড়াইতে সকলেরই পা কাঁপিত। আমায় কখনও তিনি রূঢ়বাক্য বলেন নাই, অথচ আমি তাঁহাকে যতটা ভয় করিতাম পৃথিবীর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ততটা করিতাম না। তাঁহার ললাটে যখন মেঘ দেখা দিত, তখন তাঁহার বন্ধুরাও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। কিন্তু বৈশাখী মেঘ দুই চারিবার গর্জ্জন করিয়াই অন্তর্হিত হইত।

বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়াছে জানিয়া আমরা আর উপরে গেলাম না। খুড়িমা সিঁড়িতে গিয়া দাঁড়াইলেন ও ক্রমে উপরে উঠিলেন। ভৃত্যমহলে চুপি চুপি কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাগের কারণ কেহ আমাকে বলিতে পারিল না। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় ভৃত্য উপর হইতে নামিয়া আসিল। তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, ঝড়ের বেগটা তা'র উপর দিয়া গিয়াছে। তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।

ক্ষণপরে একজন দাসী আসিয়া উপরে অন্নাদি লইয়া যাইবার আদেশ জ্ঞাপন করিল। অন্নাদি উপরে গেল—পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমিও গেলাম। দেখিলাম, ঝড় বৃষ্টি কাটিয়া গিয়াছে—দিগ্‌দিগন্ত প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে। খুড়িমার মুখে হাসি—কাকার মুখে হাসি ; আমি তখন পায়ে বল করিয়া দাঁড়াইলাম।

আহারান্তে বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রোধের কারণ অবগত হইলাম। ভৃত্য স্নান করাইতেছিল ; জলের কলসী কেমন গোলমাল হইয়া গিয়াছিল। যে কলসীতে অত্যধিক উষ্ণ জল ছিল, সেই কলসীর জলটা ভৃত্য অনবধান প্রযুক্ত প্রভুর মাথায় ঢালিয়াছিল। উষ্ণ জল শিরোদেশে পড়িবা মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া মহা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এবং পরিধানের বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঘটী কলসী আছড়াইয়া ফেলি-লেন। ভৃত্য প্রহৃত হয় নাই বটে, কিন্তু প্রহৃত হইলে সে বোধ হয় অধিকতর দুঃখিত হইত না।

বঙ্কিমচন্দ্রের এ ক্রোধ ক্ষণেকের জন্য। ক্ষণেকের জন্যগ্ মহাগর্জ্জন সহকারে দিঁদিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া,

বিজলীবৎ স্থাবর জঙ্গম ঝলসিয়া দিয়া তখনই আবার নিবিয়া যাইত। কিন্তু প্রথম মুহূর্ত্ত ভয়ানক; তখন তাঁহার শিক্ষা, আত্মসংযম সব ভাসিয়া যাইত,—তিনি জ্ঞানশূন্য হইতেন।

---

(১৮)

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে, একদা আমার ভগিনী (বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা) তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন,"বাবা, তোমার "বন্দে মাতরম্" গানটা লোকে তেমন পছন্দ করে না।"

বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিও কি পছন্দ কর না?"

"ততটা করি না।"

মহাপুরুষ গম্ভীরবদনে বলিলেন, "একদিন দেখিবে—বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে, এই গান লইয়া বাঙ্গালা উন্মত্ত হইয়াছে—বাঙ্গালী মাতিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কিছু দিন পরে আমি এই গল্পটি আমার উক্ত ভগিনীর নিকট শুনিয়াছিলাম।

(১৯)

এবার বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ের পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে একটা ক্ষুদ্র গল্পের অবতারণা করিব। কাঁটালপাড়ার সন্নিকটবর্ত্তী গরিফা নিবাসী কোন ভদ্র সন্তান বিদ্যাভ্যাস করিতে সমুদ্রপারে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। তৎকালে আমার পিতা ও খুল্লতাত সঞ্জীবচন্দ্র সমাজের নেতা। ভদ্রসন্তান আমার পিতার আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। পিতা আশ্রয় দিতে পরাঙ্মুখ হইয়া বলিলেন, "আমি যদৃচ্ছা সমাজের উপর অত্যাচার করিতে পারি না; তুমি তোমার জাতির কাছে যাও। যদি তোমার স্বজাতি তোমায় গ্রহণ করে, তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।"

অবশেষে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কিন্তু জাতি

বা সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের শরণাগত হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দয়া হইল। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা উপায় স্থির করিলেন। ভদ্রসন্তানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি একটা রবিবারে আমায় নিমন্ত্রণ কর, আমি তোমার বাড়ীতে গিয়া খাইয়া আসিব।"

তিনি তাহাই করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রবিবার দিবস বেলা নয়টার সময় শিয়ালদহে ট্রেনে উঠিলেন; এবং দশটা সাড়ে দশটার সময় নৈহাটীতে নামিয়া ঘোড়ার গাড়ী করিয়া নিমন্ত্রণকারীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কাঁটালপাড়ার কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না, অথবা তাঁহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিল না।

কথিত ভদ্রলোকের গৃহে অন্নাহার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অপরাহ্ণে আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র দুই একটা কথার পর সহাস্যে বলিলেন, "দাদা, একটা কাজ করেছি।"

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করেছ?"

বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যের সুর আরও চড়াইয়া বলিলেন, "রায়েদের বাড়ী খেয়ে এসেছি।"

পিতা স্তম্ভিত হইলেন। রায় মহাশয় অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন। সময় বুঝিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। তখন পিতা আর কি বলিবেন? ভদ্রসন্তান অচিরে সমাজে স্থান পাইলেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল কিছু না লইয়া ছাড়েন নাই। কবেই বা ছাড়েন? অন্নপ্রাশন বা শ্রাদ্ধে—আগমন বা নির্গমনে তাঁহাদের সমান আনন্দ। শ্রাদ্ধে কিছু বেশী, কেন না তখন বিদায় দিয়া 'বিদায়' গ্রহণ করেন।

ভদ্রসন্তান সমাজে স্থান পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন। এবং বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে সংসারে যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজি সাপ্তাহিক, তাঁহার তারকেশ্বর রেল পথ আজও তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

---

(২০)

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ছিলেন, তখন কোন পত্রিকা-সম্পাদক ভিক্ষার্থে কলিকাতা হইতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। চাঁদা কি জন্য, তাহা আমি জানি না। সম্পাদক মহাশয় চাঁদা সংগ্রহে বড় একটা কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রাণী স্বর্ণময়ীকে অনুরোধ করিলেন। রাণী তদ্দণ্ডে চারিশত টাকা প্রদান করিলেন। সম্পাদক মহাশয় চারিশত টাকা লইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ধারণা জন্মিল যে, এই টাকা উচিত কার্য্যে ব্যয়িত হয় নাই। তিনি বড় ক্ষুব্ধ হইলেন; কেন না, তাঁহারই চেষ্টায় এ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি এই চারিশত টাকা দাতাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। সম্পাদক উদ্গীরণ করিতে অসম্মত হইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে কড়া কড়া

কথা চলিতে লাগিল। অবশেষে উভয়ের মধ্যে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল।

সম্পাদক মহাশয় তখন বেশ এক হাত লইলেন। তাঁহার হাতে কাগজ ছিল। তিনি সেই পত্রিকা-স্তম্ভে খুব জোর কলমে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে লিখিতে লাগিলেন। কাগজ খানি সে সময় বাঙ্গালায় লিখিত হইত। বাঙ্গালা ভাষায়, বাঙ্গালীর গৌরব বঙ্কিমচন্দ্র অনেক গালি খাইলেন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। শুধু 'রজনী'তে হীরালালকে আনিয়া সম্পাদক-চরিত্র অঙ্কিত করিলেন।

---

(২১)

বঙ্কিমচন্দ্র সুবক্তা ছিলেন না। সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা তাঁহার আদৌ ছিল না। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার এ অভাব—এ শক্তিহীনতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই বড় একটা সভা সমিতিতে যোগ-দান করিতেন না। তিনি সময়ে সময়ে আমাদের সহিত অসংলগ্ন ভাবে বাক্যালাপ করিতেন। আমার মনে

হইত, তিনি যেন একটা কথা কহিতেছেন, আর একটা কথা ভাবিতেছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আমার ভাবার্থ সকলে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অনেকেরই সম্ভবত স্মরণ আছে যে, বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট একবার মকদ্দমা স্থাপন করেন। শুনিয়াছিলাম, বঙ্গবাসী যাহা লিখিয়াছিল, তাহা ইংরাজিতে অনুবাদ করিবার ভার বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অর্পিত হয়। জানি না কি কারণে, গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাক্ষী মান্য করা হয়। সাক্ষ্য দিতে হইবে শুনিয়া তিনি সাতিশয় চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন, এবং টিটাগড়ে গিয়া জজ নরিস্‌কে ধরিলেন। নরিস্ সাহেব দুর্দ্দান্ত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যধিক স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। বুঝি এতটা তিনি অন্য কোন বাঙ্গালীকে করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য শুনিয়া নরিস্ সাহেব সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাক্ষ্য দিতে তুমি ভয় পাইতেছ কেন ?"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আমি হাইকোর্টে কখন সাক্ষ্য দিই নাই—জেরা আমার সহ্য হয় না—

আমার ক্রোধ সহজে উদ্দীপ্ত হয়—আমায় নিষ্কৃতি দান করুন।"

নরিস সাহেব বলিলেন, "বঙ্কিম বাবু, তুমি স্থির জানিবে, আমি তোমায় নিষ্কৃতি দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

সাহেব নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সে সংবাদ তখনও অবগত ছিলেন না। সংবাদটা আনিবার জন্য আমায় সবিশেষ উপদেশ দেন। উপদেশ দিবার সময় তিনি কিরূপ অসংলগ্ন ভাবে আমার সহিত কথা কহিয়া ছিলেন, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। একবার বলিলেন, "যোগিন বোসকে বল, নরিস সাহেবকে ডেকে দিতে।" পরক্ষণে হয়ত বুঝিলেন, কথাটা আমায় গুছাইয়া বলিতে পারেন নাই। সংশোধন করিয়া বলিলেন, "নরিস সাহেবকে বলগে যোগীন বোসকে ছেড়ে দিতে।" তিনবার এইরূপ অসংলগ্ন ভাবে বলিবার পর তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন তিনি আমায় কথাটা গুছাইয়া বলিলেন। এইরূপ অনেকবার তাঁহাকে অসম্বদ্ধ ভাবে

কথা কহিতে দেখিয়াছি। তাঁহার বাক্যালাপ করিবার শক্তি এত অল্প ছিল বলিয়া মনে হয় যে, সময় সময় সন্দেহ হইত, তিনিই কি লিখিয়াছিলেন, "তবে যাও প্রতাপ, অনন্তধামে। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কথাবার্ত্তা শুনিয়া কখন তাঁহার প্রতিভার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু তিনি যখন তর্কের আসরে অবতীর্ণ হইতেন, তখন তাঁহার বিভিন্ন রূপ। তাঁহার উজ্জ্বল নয়নদ্বয় আরও উজ্জ্বল হইত—হস্ত পদ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সময় সময় ঈষৎ কম্পিত হইত—একটা প্রতিভার ছটা সমস্ত মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইত। তখন আর নয়নের চাঞ্চল্য নাই—বাক্যাবলীর অসম্বদ্ধতা নাই—মনের অস্থিরতা নাই। তখন মনে হইত, একটি পঞ্চমবর্ষীয় শিশু সহসা প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। স্বর্গীয় দামোদর বাবুর সহিত এরূপ তর্ক-যুদ্ধে রত হইতে তিন চারি দিন দেখিয়াছি। একদিনকার কথা

আমার বেশ স্মরণ হয়। তখন বঙ্কিমচন্দ্র সান্‌কি-ভাঙ্গার বাটীতে। রাত্রি নয়টার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং সমাপ্ত হইতে রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর হইয়া যায়। সমাপ্ত হইয়াছিল কি না জানি না; আমি তখন তাঁহাদের পদতলে বিনিদ্র। য়ুরোপের সাহিত্য-রাশি মন্থন করিয়া সে দিন যে তর্কযুদ্ধ উঠিয়াছিল, তাহাতে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিদ্রাকর্ষণ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? হুগো, ব্যালজ্যাক্‌, গেতে, দান্ত, চসার, প্রভৃতির নাম হইলে আজও আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ে।

---

(২২)

বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যাভ্যাসের কথা কিছু বলিব।

কলিকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষী স্বর্গীয় ক্ষেত্র-মোহনের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র কিছু দিন জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন; এবং আরব্য দেশীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র শিখিবার অভিপ্রায়ে মৌলবির নিকট আরব্য ভাষা

শিক্ষা করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ফাদার লাফোঁর নিকট কিছুদিন ল্যাটিন পড়িয়াছিলেন।

সঙ্গীত চর্চ্চাতেও তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। কাঁটালপাড়ায় একজন বঙ্গবিশ্রুত গায়ক বাস করিতেন, তাঁহার নাম যদুভট্ট তানরাজ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে মাসিক ৭০৲ সত্তর টাকা বেতন দিতেন। এই যদু ভট্টর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুকণ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার তান-লয় বোধ অনন্যসাধারণ ছিল। হারমনিয়ম যন্ত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

একদিন তিনি রঙ্গমঞ্চে মৃণালিনী অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। গিরিজায়া গাহিতেছিল,—

বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে,
বহুত পিয়াসা—রে।
চন্দ্রমা-শালিনী, যা মধু যামিনী,
না মিটিল আশা—রে॥

সুর বঙ্কিমচন্দ্রের মনোমত হইল না। তিনি সাতিশয় বিরক্তি সহকারে রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিলেন।

এবং পরদিন তিনি তাঁহার দৌহিত্র শ্রীমান্ দিব্যেন্দু সুন্দরকে এই গানটির সুরলয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীমতী সরলা দেবীও এই গানটির একটি সুর দিয়াছিলেন, এবং দিব্যেন্দুসুন্দরকে হারমনিয়ম সাহায্যে শিখাইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চিকিৎসা শাস্ত্রেও সাতিশয় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আলিপুরে চাকৃরি করিতে করিতে তিনি মেডিকেল কলেজে কিছুকাল শরীরতত্ত্ব বা Anatomy পড়িয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বল্পকাল মধ্যে শরীরতত্ত্ব শিখিয়া লওয়া বড় কঠিন ব্যাপার নয়। তিনি অস্থি বা শরীরতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন হইয়া গৃহে বসিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র অনন্যসাহায্যে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। আমি দেখিয়াছি, তাঁহার যখন কোন একটা বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য বাসনা জন্মিত, তখন তিনি সে বিষয়টা আয়ত্ত করিবার জন্য অধীর ও অস্থির হইয়া পড়িতেন। যতদিন সেটা আয়ত্ত না হয় তত দিন তাঁহার

মনে সুখ নাই, শান্তি নাই। চিকিৎসাশাস্ত্র শিখিয়া রাশীকৃত চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ কিনিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার এ বিদ্যার পরিচয় আমরা পূর্ব্বে বড় একটা পাই নাই—জীবনের শেষদিনে কিঞ্চিৎ পাইয়াছিলাম; ঘটনাটির এস্থলে উল্লেখ করিলাম।

কেহ কেহ অবগত থাকিতে পারেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর দুই তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার মূত্রনালীতে একটা স্ফোটক জন্মিয়াছিল। স্ফোটকটী বড় সামান্য নয়,—কলিকাতার বড় বড় চিকিৎসকেরা প্রায় সকলেই চিকিৎসার্থে আহূত হইয়াছিলেন। অস্ত্র-চিকিৎসা-বিশারদ ওব্রায়েন সাহেব আসিয়া বলিলেন, স্ফোটকটি কালবিলম্ব না করিয়া অস্ত্র করিতে হইবে। অন্যান্য চিকিৎসকেরা সাহেবের সহিত একমতাবলম্বী হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন, "অস্ত্রাঘাত হইলে বিষাক্ত পূঁজ রক্তের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যাইতে পারে—মিশিয়া গেলে রক্ত দূষিত হইয়া পড়িবে, তখন মৃত্যু অনিবার্য্য।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, "এ যাত্রা কিছুতেই আমার

নিস্তার নাই; অস্ত্রাঘাত কর বা না কর, কিছুতেই আমার পরিত্রাণ নাই। তবে কেন মিছা অস্ত্রাঘাত করিয়া আমার যাতনা বাড়াও।"

ওব্রায়েন সাহেব নিরস্ত হইলেন। পরদিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মতের পোষকতা করিলেন। কিন্তু তিনি কোন ঔষধ দিলেন না,—এলোপ্যাথী চিকিৎসা চলিতে লাগিল। দুই এক দিনের মধ্যে স্ফোটক আপনা হইতে ফাটিয়া গেল। ওব্রায়েন সাহেব পরদিন আসিয়া বলিলেন, "এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন—আর কোন ভয় নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র ঈষদ্ধাস্যের সহিত বলিলেন, "ভয় সম্পূর্ণ আছে—এ যাত্রা কিছুতেই আমার রক্ষা নাই।"

জানি না, কেন বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা বলিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, সন্ন্যাসীর নিকট কিছু শুনিয়া থাকিবেন। সে কথা পরে বলিব; এক্ষণে যাহা বলিতেছিলাম তাহা বলি।

দুই তিন দিন পরে পুরাতন ক্ষতের পার্শ্বে আর একটি নূতন স্ফোটক দেখা দিল। সেবারেও অস্ত্রাঘাত

করা হইল না। কিন্তু ফল তেমন সন্তোষজনক হইল না। তিনি বুঝিলেন—মৃত্যু সন্নিকট। পূর্ব্ব হইতে,—কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, শেষ দিনের বেশী বিলম্ব নাই। তিনি সে কথা কাহাকেও বলেন নাই; কিন্তু তাঁহার কার্য্যকলাপ আমাদের সে কথা বলিয়া দিয়াছিল।

যখন ২৬এ চৈত্র নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন দূরস্থিত আত্মীয় স্বজনের নিকট তারে সংবাদ প্রেরিত হইল। কেহ সময়ে আসিতে পারিল, কেহ পারিল না। ২৫শে চৈত্র তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। কিন্তু জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অবশেষে ২৬এ চৈত্র অপরাহ্নে বাঙ্গালাব্যাপী হাহাকারের মধ্যে তাঁহার শেষ নিশ্বাস অনন্ত আকাশে মিলাইয়া গেল।

---

(২২)

বঙ্কিমচন্দ্রের চারিটী অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। এক টির নাম—ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য। তাঁহার সহিত বঙ্কিম চন্দ্রের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু ক্ষেত্রবাবু যখন

মৃত্যু-শয্যায় শয়িত, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সে সাক্ষাৎ হৃদয়স্পর্শী। উভয়ে কাঁদিয়া শয্যা ভাসাইয়া ছিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা।

তাঁহার দ্বিতীয় বন্ধুরও নাম বোধ হয় কেহ অবগত নহেন। তিনি ভবানীপুর-নিবাসী জনৈক এটর্ণি—নাম রাধামাধব বসু। ইহাঁর সদ্‌গুণে বঙ্কিমচন্দ্র এত মুগ্ধ ছিলেন যে, তিনি জীবনে বোধ হয় দ্বিতীয় ব্যক্তির এতটা পক্ষপাতী ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের একাংশ এই রাধামাধব বাবুর সহিত এমনি ভাবে বিজড়িত যে,তাহার উল্লেখ করিলে কেহ কেহ মনঃপীড়া পাইতে পারেন। রাধামাধব বাবুর সঙ্গে যখন কোন্ রায়বাহাদুরের বিবাদ বাধে, তখন বঙ্কিমচন্দ্র রাধামাধব বাবুর পক্ষাবলম্বন করিয়া একটী প্রবল শত্রুর সৃষ্টি করেন। এই শত্রু আজীবন বঙ্কিমচন্দ্রকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাধামাধব বাবু নিষ্কৃতি পাইলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে কাঁদাইয়া অকালে স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার শোক বঙ্কিমচন্দ্র কোন কালে ভুলিতে পারেন নাই।

তার পর আরও দুইটী বন্ধুর পরিচয় দিব। একটি দীনবন্ধু মিত্র, অপরটি জগদীশ নাথ রায়। উভয়েই বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। বড় হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের সহোদর-তুল্য স্নেহ করিতেন। আজ কাল যে রকম বন্ধু দেখা যায়, সে রকম বন্ধু তাঁহারা ছিলেন না। আমরা স্বার্থ, আত্মাভিমান লইয়া ব্যস্ত। এই দুটীকে পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা বন্ধুকে ভালবাসিতে পারি না। মুখে শতবার বলিব, তোমায় আমি প্রাণতুল্য ভালবাসি; কিন্তু কাল যদি তোমার চাকরি যায়, তাহা হইলে আমি গম্ভীর বদনে তোমায় কত উপদেশ দিব, তিরস্কার করিব। পরশ্ব যদি খাইতে না পাও, তোমার নিকট হইতে আমি সরিয়া দাঁড়াইব। অথবা, তুমি যদি আমার আত্মাভিমানে আঘাত করিয়া আমায় ভালরূপ অভ্যর্থনা না কর, কিম্বা আমায় মিথ্যাবাদী বা অন্য কোন দুর্ব্বাক্য বল, আমি তখনই তোমার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিব, ও তোমার নামে Defamation Case চলিতে পারে কিনা জানিবার জন্য উকীল-বাড়ী ছুটিব। আমি

মনে মনে জানি, আমি একজন ঘোরতর মিথ্যাবাদী। কিন্তু আমার বন্ধু কেন সে কথা আমায় বলিবে? তা'র right কি আছে? আমরা এইরূপেই আজ কাল বন্ধুত্ব করি। আমি সম্প্রতি এইরূপ দুইটি বন্ধুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। আমরা জানি না—আমরা বুঝি না—ভালবাসিয়া সংসারে কত সুখ।

বঙ্কিমচন্দ্র তাহা জানিতেন। যাহাকে ভাল বাসিতেন, তাহাকে সর্ব্বস্ব দিতেন—আপনার বলিয়া কিছু রাখিতেন না। আমি একটী গল্প বাল্যকালে জনৈক পুরাতন ভৃত্যের নিকট শুনিয়াছিলাম। সত্য কি মিথ্যা তা' জানি না। কিন্তু ভৃত্যেরা রচনায় দক্ষ নয় বলিয়া আমার বিশ্বাস।

একদা দীনবন্ধু বাবু আমাদের কাঁটালপাড়ার বাটিতে বেড়াইতে অথবা নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই আসিতেন। তবে একদিনের ঘটনা আমি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি। সে দিন তিনি সন্ধ্যার পর একটু রাত্রি হইলে আসিয়াছিলেন। আসিয়া দেখিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় তাঁহার অনেক

গুলি অন্তরঙ্গ বন্ধু বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। সে সময় জগদীশ বাবু, ঈশ্বর বাবু, প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সকলেই দীনবন্ধু বাবুর বন্ধু। সধবার-একাদশী লেখককে দেখিয়া সকলে আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠিলেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু, দীনবন্ধু বাবুর প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না—বাক্যে বা ইঙ্গিতে তাঁহাকে অভ্যর্থনাও করিলেন না। দীনবন্ধু বাবু সেটা লক্ষ্য করিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার একটু অপরাধ হইয়াছে। তিনি কেন বিলম্বে আসি-লেন? বঙ্কিম যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র! এরূপ অভ্যর্থনায় অপরাধ লওয়া দূরে থাকুক, মহাপ্রাণ দীন-বন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্রে আরও অনুরক্ত হইলেন। কিন্তু সেটা —সে ভাবটা বাহিরে প্রকাশ করিলেন না।

অনন্তর দীনবন্ধু বাবু তথা হইতে উঠিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন এবং কিছু আহার্য্য চাহিয়া লইয়া জলযোগ করিলেন। তৎপরে আবার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। সেখানে বসিয়া দীনবন্ধু বাবু এমনি হাস্যরসের অবতারণা করিলেন যে, গৃহপ্রাচীর ফাটিয়া

যাইবার উপক্রম হইল। দীনবন্ধু বাবুর স্বরূপ সকলে অবগত নহেন; বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত মহাত্মার জীবনী লিখিবার সময় কিছু পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই প্রতিভাবান্ ব্যক্তি যখন সভাস্থলে বসিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিলেন, তখন কে না হাসিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হাসিলেন না—অনেক কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া রহিলেন। দীনবন্ধু বাবু যখন দেখিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উদর ও পঞ্জর হাস্য-তরঙ্গে নাচিয়া উঠিতেছে, কিন্তু ওষ্ঠে হাস্যরেখা নাই, তখন তিনি উঠিয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং কতকগুলা পাতা লতা ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া বৈঠকখানা-সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এইটি বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিবার ঘর। এই ঘরে বসিয়া তিনি কৃষ্ণকান্তের উইল্ প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন।

দীনবন্ধু বাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন; এবং পাতা লতার রাশি কাটিয়া একটা বড় কাগজে আটা দিয়া বসাইতে লাগিলেন। ক্রমে একটী মনুষ্যাবয়ব সৃষ্ট হইল। মূর্ত্তির উদরটা কিছু

বড় রকমের এবং ঠোঁট দু'খানা কিছু কুঞ্চিত। দীনবন্ধু বাবু, কাগজ খানি ও আটার শিশি লইয়া বৈঠকখানা ঘরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন, ও প্রাচীর গাত্রে সেই বিচিত্র চিত্রখানা আঁটিয়া দিলেন। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি ;—দীনবন্ধু বাবু ছবির নীচে দুই ছত্র কি লিখিয়াছিলেন। সম্ভবত কবিতা। ছবি দেখিয়া সভাস্থ সকলে হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু বঙ্কিম-চন্দ্র হাসিলেন না ; তিনি বুঝিলেন, এখানি তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি। তিনি অপাঙ্গ দৃষ্টিতে একবার কবিতা দুই ছত্র পড়িয়া লইলেন। পরে চুপি চুপি উঠিয়া পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে একখণ্ড কাগজে দুই ছত্র কি লিখিলেন। তখন সকলে দীনবন্ধু বাবুর দুই ছত্র কবিতা পাঠে নিবিষ্টচিত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র সেই অবসরে তাঁহার লিখিত কাগজ খানি আটা সাহায্যে দীনবন্ধু বাবুর পৃষ্ঠদেশে আঁটিয়া দিলেন। তখন সকলে ছবির নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া দীনবন্ধু বাবুর পৃষ্ঠদেশে সমবেত হইলেন, এবং হাস্য রোলের মধ্যে কাগজখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু বাবু কিছুমাত্র

অপ্রতিভ না হইয়া পিছন ফিরিয়া সকলকে কাগজখানি পড়াইতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "আমায় বলে দাও না গা, আমার পিঠে কি আছে। হাতীর কপাল মন্দ, তাই তা'র পিঠের কোথায় মশাটা মাছিটা বস্‌ছে সে দেখ্‌তে পায় না।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্‌তে পায় না বলিয়াই ত আমরা তাকে হস্তীমূর্খ বলি।"

দীনবন্ধু বাবু তখন আসরে বসিলেন; এবং বাক্য-বাণ বর্ষণ করিয়া বিপক্ষকে বিদগ্ধ করিতে লাগি-লেন। বিপক্ষও বড় সামান্য ব্যক্তি নহেন। উভয়ের মধ্যে সে রজনীতে যে শেল শূল ভল্ল বর্ষিত হইয়াছিল, তাহা কেহ লিখিয়া রাখিতে পারিলে আজ এক অমূল্য গ্রন্থ পাইতাম। কিন্তু ভৃত্য আর কিছু বলিতে পারিল্ না। হায়, সে কেন পণ্ডিত হইল না!—সে কেন সেই অমূল্য দুই দুই চারি ছত্র কবিতা লিখিয়া রাখিল না!

আমি দীনবন্ধু বাবুকে কখন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না। আমার শৈশবে তিনি লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু জগদীশ

বাবুকে দেখিয়াছি, তবে তাঁহার মুখাবয়ব আমি এক্ষণে কিছু মাত্র স্মরণ করিয়া উঠিতে পারি না। আমি একদা খুল্লতাত বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত জগদীশ বাবুর বাটীতে গিয়াছিলাম। তখন আমি ক্ষুদ্র বালক মাত্র। বালক হইলেও তখনকার কথা আজও আমার বেশ স্মরণ আছে। আমার চারি পাঁচ বৎসর বয়সে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আজও আমি স্মরণ করিয়া কিছু কিছু বলিতে পারি। জগদীশ বাবুর বাটীতে যখন আমি গিয়াছিলাম, তখন আমি শৈশব অতিক্রম করিয়াছি। ইহার পূর্ব্বে জগদীশ বাবু আমায় যে দেখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হইল না। আমায় দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটি কে ?"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "দাদার ছেলে।"

জগদীশ বাবু একটু রঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "আমার ছেলে! তা বেশ—"

বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তোমার দাদার ছেলে।"

এই ক্ষুদ্র তিরস্কারে জগদীশ বাবুর রঙ্গরস শুকাইয়া

গেল। এখানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশ বাবুকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিতেন।

---

(২৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের চারিটি প্রিয় বন্ধুর পরিচয় দিলাম। ইচ্ছা ছিল, তাঁহার চারিটি চিরশত্রুর পরিচয় দিব। বঙ্কিমচন্দ্র এই চারিজনের নাম লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; এবং বিশেষরূপে আদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, যদবধি তাঁহারা জীবিত থাকিবেন, তদবধি তাঁহাদের নাম কোন মতে যেন প্রকাশ না হয়। এই চারিজনের একজনও এক্ষণে এ পৃথিবীতে নাই। তথাপি তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতে আমি কুণ্ঠিত হইলাম। ইঙ্গিতে একটু বলিব।

রাধামাধব বাবুর প্রসঙ্গ উল্লেখ কালে জনৈক রায় বাহাদুরের নাম করিয়াছি। এই রায় বাহাদুর ছোট লাটের দপ্তরে একজন বড় চাক্‌রে ছিলেন। তাঁহার মুঠার মধ্যে সেক্রেটারি টম্‌সন্ সাহেব ঘুরিতেন, ফিরিতেন। এই টম্‌সন্ সাহেব পরে ছোটলাট

হইয়াছিলেন। উক্ত রায় বাহাদুর, টম্‌সন্ সাহেবের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে নানারূপে উত্ত্যক্ত করিয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য সমভাবে বর্ত্তমান ছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি জনৈক নামজাদা ডিপুটি। তিনি জাতিতে কায়স্থ। নিবাস কলিকাতায়। তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না।

তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তির নাম করিব না। তাঁহারা মল্লিক উপাধিধারী এবং গভর্ণমেণ্টের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন।

এই চারি জনের নাম কয়েকটি ঘটনার সহিত এমনি ভাবে সংমিশ্রিত যে, সে ঘটনানিচয় উল্লেখ করিতে আমি অসমর্থ হইলাম।

---

(২৪)

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আলিপুরে বদ্‌লি হইয়া দ্বিতীয়বার আসেন। এবং তথা হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। মহামতি

বেকার সাহেব সে সময় আলিপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট। এই বেকার সাহেব এক্ষণে আমাদের প্রজাবৎসল, ন্যায়-পরায়ণ লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর।

একদা বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে এক মকদ্দমার বিচার চলিতেছিল। মকদ্দমাটি সামান্য—Excise case—আবগারি বিভাগ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। বঙ্কিম চন্দ্র আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। দণ্ডও অতি সামান্য—কুড়ি পঁচিশ টাকা হইবে। কিছু পরে ম্যাজিষ্ট্রেট বেকার সাহেব আসিয়া মকদ্দমার কাগজপত্র দেখিলেন। দেখিলেন, দণ্ড অতি লঘু হইয়াছে। তিনি জরিমানার টাকাটা কম হইয়াছে বলিয়া জজমেণ্টের উপর মন্তব্য লিখিলেন। বঙ্কিম চন্দ্র বলিলেন, "দণ্ড যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আসামী দরিদ্র, এই টাকাটা দিতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে।"

সাহেব। অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড হওয়া উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র। Sir, you were in cradle when I entered service—

সাহেব বাধা দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং হাততালি দিতে দিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। অন্য সাহেব হইলে কত রাগিতেন। কিন্তু উদারহৃদয় বেকার সাহেব কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

---

(২৫)

আর একবার একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ২৪ পরগণার রেভিনিউ বিভাগের ১০ নং বাৎসরিক statement দিবার সময় সমাগত হইল। রেভিনিউ বিভাগ তখন বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। statement সময়ে প্রস্তুত হইয়া উঠিল না। অবশেষে তাগিদ আসিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি শুধু দেখিতে লাগিলেন, আমলারা statement প্রস্তুত করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম করিতেছে কিনা। তাঁহারা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছেন দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চিন্ত হইলেন। ক্রমে বোর্ড হইতে, গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে, চারিদিক হইতে

তাগিদ আসিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না—তাগিদের উত্তরও দিলেন না। অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসন নড়িল। বোধ হয় গভর্ণমেণ্ট হইতে তাগিদ দিয়া তাঁহার নামে পত্র আসিয়াছিল। মহামতি বেকার সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে আসিয়া উপস্থিত। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "statement প্রস্তুত হইয়াছে?"

বঙ্কিমচন্দ্র। না।

সাহেব। কেন হয় নাই?

বঙ্কিমচন্দ্র। আমলারা যথাসাধ্য করিতেছে; আমি তাহাদের মারিয়া ফেলিতে পারি না।

সাহেব উঠিয়া আমলাদের কাজ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দেখিয়া বোধ হয় সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি কাহাকেও কোনরূপ তিরস্কার না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে কি লিখিয়া দিলেন।

বর্ত্তমান ছোটলাটের দয়া ও ন্যায়পরতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে এ ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

(২৬)

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে যখন দুর্গেশনন্দিনীর একাদশ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া গৃহে আসিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "এই পুস্তক খানির লোকে যত নিন্দা করিয়াছে তত আর কোন পুস্তকের করে নাই ; তাই এ পুস্তকের বিক্রি বেশী।"

কপালকুণ্ডলার ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সপ্তমসংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। দুর্গেশনন্দিনীর তুলনায় কপালকুণ্ডলার বিক্রয় অনেক কম। শুধু কপালকুণ্ডলা কেন, দুই এক খানি পুস্তক ছাড়া সকল পুস্তকের বিক্রয় দুর্গেশনন্দিনীর তুলনায় কম।